সাহিত্যপ্রকাশিকা

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী



বিদ্যাভবন
বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
কলিকাতা—৭

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬২

মূল্য দশ টাকা

মুদ্রক ও প্রকাশক : কালিদাস চট্টোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

নিবেদন

বিশ্বভারতী গবেষণা বিভাগ অনেকদিন থেকেই 'বিশ্বভারতী এনাল্‌স'-এ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণা প্রকাশ করে আসছে। সম্প্রতি গবেষণা বিভাগ থেকে 'সাহিত্যপ্রকাশিকা' নামক আরেকটি গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। কেবল বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণাই এতে প্রকাশিত হবে। বিশ্বভারতী পুঁথিশালার সংগ্রহে যে সব পুঁথি আছে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে তার মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ মূল্যবান। 'সাহিত্যপ্রকাশিকা' গ্রন্থমালায় এইসব পুঁথির সম্পাদিত পাঠ ও সে সম্বন্ধে আলোচনা একে একে বের করা হবে। পুঁথিসম্পাদনা ছাড়াও এই গ্রন্থমালায় সাহিত্যবিষয়ক নানাবিধ আলোচনা প্রকাশিত হবে। আশা করি এই গ্রন্থমালা বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নতুন আলোকপাত করে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

সূচীপত্র

কবি দৌলৎ কাজির

সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

ভূমিকা

দৌলৎ কাজি ও তাঁহার কাব্য

[১৬২২-১৬৩৫]

সাহিত্য সৃষ্টির আদি যুগে ধর্মের বিশিষ্ট প্রভাব সকল দেশের সাহিত্যেই লক্ষিত হয় এবং ভারতবর্ষ বা বাংলা দেশের সাহিত্যেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাপদ নামে বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীনতম নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাও ধর্মাচরণ সম্পৃক্ত জটিল রহস্যময় সংকেতে পূর্ণ। চর্যাপদের রচনাকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। ইহার পর বাংলা কাব্য সাহিত্যে একে একে যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন কবি কৃত্তিবাস (আ. ১৪৭৫ খৃঃ), বড়ু চণ্ডীদাস (আ. ১৫২৫-১৬০০ খৃঃ), কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম (আ. ১৫৭৪-১৬০৪ খৃঃ), কাশীরাম দাস (আ. ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দশক) প্রভৃতি মহা রথি-গণ। তবে ইহারা সকলেও দেবতা বা ধর্মবিজড়িত ভাব লইয়াই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্মভাব বাদ দিয়া নিছক্ কাব্যকাহিনী রচনা এই সমস্ত কবিগোষ্ঠীমধ্যে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত হিন্দু কবিই হিন্দুর দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন অথবা অনুরূপ ভক্তিমূলক ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই ধারাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে। এমন কি প্রেমের কাহিনী রচনা করিতে গিয়াও কবিরা কাহিনীটিকে গৌণ করিয়া দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনকেই মুখ্য করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদ্যাসুন্দরের প্রেম কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। এমন একটি সুন্দর আখ্যানকেও ভক্তিপ্রধান ঘটনা সমাবেশের মধ্যে অপ্রধানরূপেই আনা হইয়াছে। এমন কি ভারতচন্দ্র (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেন নাই। তাই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান আসলে কালিকামঙ্গল।

এই যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনপ্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া অথবা ধর্মভাবকে কেন্দ্র করিয়া কিংবা ভক্তি-রসাত্মক পৌরাণিক কাহিনী লইয়া কাব্যরচনা, বাংলা সাহিত্যে ইহার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল মুসলমান কবিদের রচনায়। বঙ্গসাহিত্যে এই যে একটানা নিছক্ ধর্মের সুর এত দিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদ্‌লাইয়া নূতন ধরণে অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সম্মান মুসলমান কবিদেরই প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মুসলমান কবিরা শুধু যে নিছক্ ধর্মাত্মক কাব্য রচনার ধারা পরিবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, ফার্সি ও প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্য হইতে অজ্ঞাতপূর্ব অভিনব কাহিনী সমূহ আনিয়া বাংলা সাহিত্যে এক নব যুগের সৃষ্টি করিলেন। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদিগকে এক নূতন সাহিত্যিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না; কেন না, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্তী কালে আরও মুসলমান কবি, এমন কি হিন্দু কবিও মুসলমানী রোমান্টিক কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন তাহার প্রমাণ আছে।[১]

১ ই. বা. সা. পৃঃ ১৩০, ১৩৪

আদি যুগের মুসলমান কবিদিগের রচনায় একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে যে তাঁহাদের রচনার ভাষা ছিল তৎসমশব্দবহুল অকৃত্রিম সাধু বাংলা, এবং ইহার মধ্যে আরবী-ফার্সি শব্দের অনাবশ্যক প্রয়োগ দেখা যায় না। এই উক্তির যাথার্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় দৌলৎ কাজি ও আলাওলের রচনার আলোচনা করিলে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অগ্রগণ্য কবিকুলের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান কবিগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি দৌলৎকাজি ও আলাওল বর্তমান নিম্নবর্মার অন্তর্গত সুদূর আরাকান প্রদেশে তাঁহাদের কাব্যাবলী রচনা করেন। ইহাদের কাব্যরচনার ইতিবৃত্ত বিশেষভাবে কৌতুহলোদ্দীপক ও উল্লেখযোগ্য ; কেন না, যে-রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া ইহারা বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন সেখানকার নৃপকুলের নিকট বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি একেবারে অজ্ঞাত ও অপরিচিত না হইলেও তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল ভিন্ন। তিন শতাধিক বৎসরের পরপারে আজও যেন কল্পনা নেত্রে ভাসিয়া উঠে সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যের আড়ম্বরের মধ্যে উপবিষ্ট, বঙ্গভাষাভাষী অগণিত হিন্দুমুসলমান পরিবৃত, ভাষান্তরভাষী ও দেশান্তরবাসী বৌদ্ধ নৃপকুলমণি ; বঙ্গীয় কবির সুকণ্ঠে ছন্দে, লয়ে সার্থক সুমধুর সঙ্গীত সুবিশাল সভাগৃহে ঝঙ্কৃত হইতেছে ; সংখ্যাতীত শ্রোতা চিত্রার্পিতের মত বসিয়া মুগ্ধ চিত্তে সে সঙ্গীত সুধা পান করিতেছে।

এখন প্রসঙ্গক্রমে একটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতেছে যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কাহাকে বলা যাইতে পারে। মনে হয় এই সুদুর্লভ সম্মান আরাকান রাজ সভার কবি দৌলৎ কাজিরই প্রাপ্য, যদিও এই সিদ্ধান্ত একেবারে বিতর্কের অতীত নহে। এই প্রসঙ্গে অন্ততঃ আর একজনের নাম স্বভাবতঃই উঠিবে। সে নাম শা বিরিদখাঁর। শা বিরিদের রচনাকাল অবশ্য ঠিক মতো নির্ধারিত করিবার উপায় নাই, তবে ভাষার সাক্ষ্য যদি সম্পূর্ণ গ্রহণ করা চলে তাহা হইলে তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর কবি বলিতে বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না, এবং সে ক্ষেত্রে বলিতে হয় যে তিনি সম্ভবতঃ দৌলৎ কাজি হইতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লিখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিদ্যা এবং সুন্দরের প্রচলিত কাহিনী লইয়া তিনি যে কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে, এবং এই সামান্য অংশ হইতে তাঁহার রচনার সাহিত্যিক মূল্য নির্দেশ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে বাংলায় যে-সমস্ত কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রাচীনতার দিক দিয়া শা বিরিদের রচনাটিকে এ পথের দ্বিতীয় রচনা বলা চলে।[১] বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর প্রথম কবি সম্ভবতঃ শ্রীধর (দ্বিজ), এবং দ্বিতীয় কবি শা বিরিদ। শ্রীধর তাঁহার কাব্যে ফিরোজ শা আলাউদ্দীনের নাম করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার কাব্য রচনা কাল মোটামুটি পাওয়া যায়, কেন না ফিরোজ শা হিঃ ৯৩৯ বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সম্ভবতঃ মাস তিনেকের অধিক কাল রাজত্ব করেন নাই।[২] কিন্তু শা বিরিদের রচনাকাল জানিবার কোনোই উপায় নাই। অনুমানে সহায়তা করে প্রাপ্ত কয়েক পৃষ্ঠা পুথির ভাষার সাক্ষ্যমাত্র, এবং এই প্রমাণ গ্রাহ্য হইলে বলা চলে

১ বা. সা. ই., ১ম, পৃঃ ৮১

২ H. B. (J), II, পৃঃ ১৫৯, ১৫৯-পা. টী।

যে বিরিদের রচনা প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমসাময়িক; কেন না, স্থানে স্থানে বিরিদের ভাষার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়।[১]

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি হিসাবে আরও একজনের নাম উত্থাপিত করা হইয়া থাকে। তিনি কবি সৈয়দ সুলতান।[২] কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রথমতঃ সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি লস্করপুরকে যে চট্টগ্রামের অন্তর্গত বলা হইয়াছে[৩] তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বস্তুতঃ কবি সুলতান শ্রীহট্টের অন্তর্গত লস্করপুরের অধিবাসী ছিলেন[৪] বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ কবি যদি সত্যই হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সেনাপতি পরাগল খাঁর সমসাময়িক হইয়া থাকেন[৫] [নিম্নের আলোচনা হইতে এই মত সম্পর্কে ঘোর সংশয়ের কারণ বুঝা যাইবে] তাহা হইলে তাঁহার জন্মভূমির সহিত চট্টগ্রামের পরাগলপুরের ঐক্য স্থির করা খুবই কঠিন। কেন না, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই[৬] কবির বাসভূমির নাম যদি পরাগলপুর পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে আরও বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই ঐ দেশের নাম ছিল পরাগলপুর; সেক্ষেত্রে প্রায় ইহাই সাব্যস্ত হয় যে পরাগল খাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই (পরাগল কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় সমাপ্ত হয় ১৫১৭ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে[৭]) দেশের নাম পরাগলপুর স্থির হয়। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ সৈয়দ সুলতানের "শবে মেয়েরাজ" রচনার কাল সম্পর্কে "গ্রহ শত রস যোগে অব্দ" বলিয়া যে ছত্রটি উদ্ধার করা হইয়াছে[৮] সেটির অর্থোদ্ধার সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে[৯]; পাঠান্তর "দশ [গ্রহ শব্দ স্থানে আসল পুথিতে ফার্সি দহ (=দশ) শব্দ থাকা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না] শত রস যুগে অব্দ"[১০] ছত্রটিও অগ্রাহ্য করিবার মতো নহে। উক্ত ছত্রটির প্রথম পাঠ হইতে ৯০৬ হিজরি[১১] বা ১৫০০ খৃস্টাব্দ, অথবা মতান্তরে হিঃ ৯৬৪[১২] বা ১৫৫৩ খৃঃ পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বিতীয় পাঠটি হইতে ১০৬৪ (বা ১০৬২)[১৩] হিজরি অথবা ১৬৫৩ খৃঃ (বা ১৬৫১ খৃঃ) পাওয়া যায়। এতৎ-সম্পৃক্ত সকল বিষয় আলোচনা করিলে মনে হয় সৈয়দ সুলতানকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর কবি না বলিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি বলাই সমীচীন।[১৪] কালের দিক দিয়া তাঁহাকে দৌলৎ কাজির ঠিক পরবর্তী এবং আলাওলের প্রায় সমসাময়িক বলিলে দোষ হয় না।

ফার্সি কাব্য "ইউসুফ জুলেখা"র বাংলা অনুবাদক শাহ মোহাম্মদ সগীরকে কেহ কেহ চতুর্দশ শতাব্দীর কবি বলিয়াছেন[১৫]। কিন্তু সগীরের কাল প্রসঙ্গে এই যে অনুমান ইহার কোনই ভিত্তি নাই[১৬]।

১ বা. সা. ই. ১ম, পৃঃ ৫৯৯
২ সা. প. প. ৪১, পৃঃ ৩৮-৫৪
৩ ঐ., পৃঃ ৪০, পা. টী.।
৪ সওগাত, ফাল্গুন, ১৩৫৩, পৃঃ ১৯২
৫ সা. প. প., ৪১, পৃঃ ৪০
৬ ইহাকেই তাঁহার আবির্ভাব কাল ধরা হইয়াছে, ঐ।
৭ H. B. (J), II, পৃঃ ১৫০
৮ সা. প. প., ৪১, পৃঃ ৩৯
৯ মা. মো. শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩২১, পৃঃ ৪৫৮
১০ বা. সা. ই. ১ম, পৃঃ ৫৯৩; আরও দ্রঃ বা. সা. ই. (১ম সং) পৃঃ ৬২৩
১১ সা. প. প. ৪১, পৃঃ ৩৯
১২ মা. মো., বৈশাখ, ১৩৫২, পৃঃ ২৭৩
১৩ বা. সা. ই. ১ম, পৃঃ ৫৯৩, পা. টী.
১৪ তুঃ নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৯, পৃঃ ২২৭
১৫ নওবাহার, ফাল্গুন ১৩৫৯
১৬ নওবাহার, চৈত্র, ১৩৫৯, পৃঃ ২২৫-২২৭

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে সগীরের কাব্য হইতে ইহার রচনাকাল সম্পর্কে অনুমানেরও কোনোই পথ নাই; কেন না, মুদ্রিত পুস্তকের ভাষায় কোথাও প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই এবং ইহার পুথি কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। চট্টগ্রামের অন্যতম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্'র কাল সম্বন্ধেও বিশেষ বিতর্ক আছে। বস্তুতঃ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই,[১] যদিও কেহ কেহ মনে করেন তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কবি[২] আবার তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিও বলা হইয়াছে[৩]।

এক্ষণে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রথম মুসলমান কবি হিসাবে আরাকান রাজসভার কবি দৌলৎ কাজির দাবীই যে সর্বাগ্রগণ্য ইহা মানিয়া লইতে আর কোনো বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা আবশ্যক যে তিনি কেবলমাত্র প্রথম মুসলমান কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি; শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তিনিই রোমান্টিক কাব্যের ভগীরথ, এবং কবি হিসাবে আরাকান রাজসভার দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক আলাওল তাঁহার নিম্নে।

দৌলৎ কাজির একটিমাত্র রচনা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাও অর্ধসমাপ্ত। গ্রন্থের মধ্যে এমন প্রমাণ আছে যাহাতে বুঝা যায় যে এই একমাত্র প্রাপ্ত রচনার মধ্যস্থলেই কবির লেখনী চিরতরে স্তব্ধ হইয়া যায়। দৌলৎ কাজি আরাকান রাজসভার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন এবং যদিও এই অর্ধসমাপ্ত একটি মাত্র কাব্য ছাড়া তাঁহার অন্য কিছু রচনা পাওয়া যায় নাই, তথাপি তাঁহার প্রতিভা যে অসামান্য ছিল তাহাতে মতান্তর থাকিতে পারে না, এবং তাঁহার একমাত্র প্রাপ্ত রচনা হইতেই তাঁহার বিস্ময়কর কবিত্ব শক্তির পরিচয় মিলে। কবি ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে, তিনি যেখানকার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সেই আরাকান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

আরাকান নিম্নবর্মার একটি বিভাগ (division)। বিভাগটির উত্তরাঞ্চলে আরাকান জিলা। প্রাচীন কালে এই জিলার প্রধান শহর বা রাজধানী ছিল আরাকান নগরী।[৪] সেই প্রাচীন শহরটি বর্তমানে Myohaung বলিয়া পরিচিত এবং আকিয়াবের পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।[৫] যে কোনো কারণেই হোক এই আরাকানের অধিবাসীরাই মঘ বা মগ নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে এই বিদেশ আরাকানে মঘ রাজাদের সভাতেই বাংলা ভাষায় কাব্য রচিত হয় আজ হইতে তিন শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে। মঘ শব্দটি বাংলা ভাষায় খুব ভালো অর্থে ব্যবহৃত হয় না; এবং পোর্তুগীস জলদস্যুদের আতঙ্ক-পূর্ণ নামের সহিতও ঐ নামটি মিশিয়া আছে। কেহ কেহ মনে করেন আদিতে মঘ বা মগ শব্দটি মগধ রাজবংশীয়দের বুঝাইতে প্রয়োগ করা হইত এবং

১ মাহে-নও, চৈত্র, ১৩৫৭, পৃঃ ২
২ নও বাহার, চৈত্র, ১৩৫৯, পৃঃ ২২৭
৩ বা. সা. ই. ১ম, পৃঃ ৯২৬
৪ H. J., পৃঃ ৩৪; Enc. Britt., II, পৃঃ ৩১৫
৫ Enc. Britt., II, পৃঃ ৩১৫

আরাকানের নরপতিগণ এই বংশসম্ভূত ছিলেন।[১] আবার কাহারও মতে ফার্সি মুঘ (অর্থঃ অগ্নি-উপাসক) শব্দ হইতেই এই মঘ বা, মগ শব্দের উৎপত্তি। তাঁহাদের মতে মুসলমান লেখকেরা বৌদ্ধ ও অগ্নি-উপাসকের মধ্যে কখনও কখনও গোলমাল করিয়া ফেলায় মগ অর্থে বৌদ্ধদেরও বুঝাইত।[২] এই কারণে আরাকানের বৌদ্ধ অধিবাসীদিগকে মগ বলা হইত। এদিকে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বিচারে সংস্কৃত মদ্‌গু (=জলপক্ষী, ও পরে জলদস্যু) শব্দ হইতে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি হইতে কিছুমাত্র বাধা নাই (মগ<মগ্‌গু<মদ্‌গু) এবং অর্থের সামঞ্জস্যও ঠিক থাকে।[৩] কাজেই মঘ শব্দের উৎপত্তি নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় করা খুব সহজ নহে।

সে যাহাই হোক, আমাদের মনে হয় শব্দ হিসাবে মঘ বা মগের সহিত মগধের সম্বন্ধ না থাকিলেও এই মগের মুলুক আরাকানের সহিত মগধ বা বাংলার যোগাযোগ নিশ্চয়ই কিছু ছিল, নতুবা বঙ্গভাষা ও বঙ্গীয় কবিদের প্রতি আরাকান রাজাদের এইরূপ প্রীতি বোধ করি সম্ভব হইত না যাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানে দুই জন বঙ্গীয় মহাকবির আবির্ভাব হয়। আরাকান রাজাদের বঙ্গভাষা-প্রীতি হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি তাঁহাদের নিকট হয়ত একেবারে অপরিচিত ছিল না। বস্তুতঃ আরাকানীরা মূলে বর্মী হইলেও আচার-অনুষ্ঠান ও ভাষার দিক দিয়া ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই জাতীয়-স্বাতন্ত্র্য আবার বঙ্গদেশের সন্নিহিত অর্থাৎ আরাকানের উত্তরাঞ্চলেই অধিক লক্ষণীয়। উত্তর-আরাকান-বাসীদের এই বৈশিষ্ট্য হইতে স্বতঃই মনে হয় যে সম্ভবতঃ আদিতে মগধের সহিত ইঁহাদের যোগাযোগ ছিল এবং বাংলা দেশের প্রভাব উত্তর আরাকানে কোনো দিনই লুপ্ত হয় নাই।[৪]

আরাকান দেশের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের ধারণা যে, শব্দটি সম্ভবতঃ 'রাখাইঙ্গ' (আরাকানীরা এই নামেই নিজদিগকে অভিহিত করেন) শব্দ হইতে আসিয়াছে, ইওরোপীয় উচ্চারণে বিকৃত হইয়া। সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় কবিদ্বয়ের রচনায় আরাকান নগরের নাম রোসাঙ্গ বলিয়া বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই রোসাঙ্গ শব্দ রাখাইঙ্গ হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে (রাখাইঙ্গ>রখঙ্গ>রোহাঙ্গ বা রোসাঙ্গ)।[৫]

আরাকানের ইতিহাস অতি দীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রসারিত এবং সুপ্রাচীনত্বের দাবী করে।[৬] এই ইতিহাস শুধু দীর্ঘ নহে ইহা রীতিমত ঘটনাবহুল ও চাঞ্চল্যকর। অবশ্য বেশির ভাগ ঘটনাই যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত। সে সমস্ত কথা—দেশের সে উত্থান পতনের কাহিনী—এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি আরাকানে সেই সময়কার মুসলমান-প্রভাবের কথা শুধু আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। বস্তুতঃ যদিও সমগ্র আরাকান প্রদেশকে খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর পরেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেখা যায়, তথাপি অনেক কাল হইতেই ওখানে মুসলমান প্রভাব চোখে পড়ে।

১ H. J., পৃঃ ৫২৪ ২ ঐ। ৩ Indian Linguistics, XIV, pp. 146-147

৪ Imp. G. I., V, পৃঃ ৩৯০ ৫ তুঃ পৃঃ ৭

৬ Enc. Britt., II, পৃঃ ৩১৫; J. A. S. B., XIII, 1844. পৃঃ ৪৭-৫২

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম পাদ পর্যন্ত আরাকানের বৌদ্ধ নৃপতিগণ নিজেদের পালি-ভাষার নামের সহিত প্রায়শঃ একটি করিয়া মুসলমানী নাম বা খেতাব জুড়িয়া দিয়াছেন। আরাকানের ইতিহাস[১] হইতে জানা যায় যে তদ্দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে মেন্‌খারি (১৪৩৪-১৪৫৯), বসওপ্যু (১৪৫৯-১৪৮২), মিন্‌বিন (১৫৩১-১৫৫৩), মেঙ্‌-খা-লৌঙ্‌, বা, মিন্‌-পলৌঙ্‌ (১৫৭১-১৫৯৩), মেঙ্‌-রা-দ্জা-গ্যি বা মিন্‌জগ্যি (১৫৯৩-১৬১২) এবং মেঙ্‌-খা-মৌঙ্‌ বা মিন্‌খামৌঙ্‌ (১৬১২-১৬২২) যথাক্রমে আলি খাঁ, কলিমা শা, জবৌক শা, সিকন্দর শা, জলিম বা সলিম শা, এবং হুসেন শা এই দ্বিতীয় নামগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। মিন্‌ খা মৌঙের পর আরাকানের সিংহাসনে বসেন রাজা থিরি-থু-ধম্মা (১৬২২-১৬৩৮)। এই রাজারই সভাতে থাকিয়া কবি দৌলৎ কাজি তাঁহার কাব্য রচনা করেন। থিরি-থু-ধম্মা কোনো মুসলমানী খেতাব ব্যবহার করিয়াছিলেন কি না সঠিক জানা যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে ইনি অথবা ইঁহার পরবর্তী রাজা নরবদিগ্যি বা নরপদিগ্যি (১৬৩৮-১৬৪৫) হইতেই আরাকান রাজাদের মধ্যে মুসলমানী খেতাব ব্যবহার একেবারে উঠিয়া যায়।

আরাকান ও বঙ্গদেশের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে যে একটা প্রীতির ভাব ঐতিহাসিকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা নিবিড়তর হইবার সম্ভাবনা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া হইতেই সূচিত হয় যখন ১৪০৪ খৃস্টাব্দে আরাকান-রাজ নরমেইখ্‌লা (১৪০৪-১৪৩৪) বর্মারাজ কর্তৃক তাড়িত হইয়া বাংলায় পলায়ন করেন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তদানীন্তন বঙ্গদেশের রাজা বা সুলতানের নিকট আবেদন করেন। খুব সম্ভব বাংলার সিংহাসনে তখন গিয়াসুদ্দীন আজম শা (আ. ১৩৯৩-১৪১০) উপবিষ্ট ছিলেন। তা সে যিনিই থাকুন, নরমেইখ্‌লা যাইবামাত্র বিশেষ কোনো সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; কেন না, দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পরে ১৪৩০ খৃস্টাব্দে তিনি তখনকার বঙ্গাধিপতির সাহায্যে নিজ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন বলিয়া কথিত আছে। আরাকান রাজের এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষাকালের মধ্যে বাংলার সিংহাসন বহুবার শূন্য ও পূর্ণ হইয়াছে এবং অবশেষে যখন ১৪৩০ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ নির্বাসন দণ্ডের পুরস্কার স্বরূপ গৌড়াধিপতির সাহায্য সত্য সত্যই পাইলেন তখন বাংলার সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অনুমান হয়, রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন মহম্মদ (১৪১৮-১৪৩১) তখন গৌড়েশ্বর। সে যাহাই হোক, গৌড়েশ্বরের সহায়তায় আপনার রাজাসন ফিরিয়া পাইয়া নরমেইখ্‌লা যখন স্বদেশে ফিরিলেন তখন মনে হয় কেবলমাত্র গৌড়াধিপতির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা লইয়াই তিনি আসেন নাই, সঙ্গে বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীর প্রতি কিছু শ্রদ্ধা ও প্রীতিও আনিয়াছিলেন। একাধিক্রমে ছাব্বিশ বৎসর বাংলায় বাস করিবার পরও প্রত্যাবর্তন কালে যে গৌড়ীয় সংস্কৃতির কণামাত্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে নাই একথা বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য একথা সহজেই বোধগম্য যে আরাকানের সহিত বাংলার হৃদয়ের যোগ নিবিড়তর হয় এই পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই।

রাজা নরমেইখলা স্বীয় সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হইবার দুই তিন বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৪৩৩ খৃস্টাব্দে

১ J. A. S. B., XIII, 1844, পৃঃ ২৩-৫২ ; J. A. S. B., XV, 1846, পৃঃ ২৩২-২৪০ ; H. Bur. (H), pp. 137-142 ; H. Bur. (Ph.), p. 178 ; C. H. I., IV. p. 477.

তাঁহার রাজধানী ম্রহৌঙ্ নামক স্থানে স্থাপিত করেন। কথিত আছে, ইহার পর চারি শতাব্দী ধরিয়া ঐ ম্রহৌঙ্ই আরাকানের রাজধানী ছিল।[১] অতএব দেখা যাইতেছে যে কবি দৌলৎ ও আলাওল যখন সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানে কাব্য রচনায় নিযুক্ত তখন ম্রহৌঙ্ই সেখানকার রাজধানী। সে ক্ষেত্রে মনে হয় তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় এই ম্রহৌঙ্কেই রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাংলা উচ্চারণে ম্রহৌঙ্ হইতে রোহাঙ্ হওয়া খুব অসম্ভব নহে এবং রোহাঙ্ই বাঙালী কবিগণ কর্তৃক রোসাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারে।[২]

নরমেইখ্লার সময় হইতে বাংলার সহিত আরকানের যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, মনে হয় বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহিত তাহা অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে যখন বসওপ্যু (১৪৫৯-১৪৮২) ১৪৫৯ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন তখন হইতে। অতঃপর যদিও চট্টগ্রাম লইয়া বাংলা, আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে বিবাদের অন্ত ছিল না, তথাপি মনে হয় কিঞ্চিদধিক আরও দুই শতাব্দী কাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রধানতঃ আরাকান রাজাদের হাতেই থাকে।[৩] সুতরাং দৌলতের সময়ত বটেই, আলাওলের সময়েরও বেশির ভাগটাই চট্টগ্রাম আরাকানের অধীন ছিল। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে তাই দেখিতে পাই রোসাঙ্গে আগন্তুক ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে বাঙালীও রহিয়াছে :

নানা দেশে নানা লোগ শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী, মিশরী, স্যামী, তুরুকী, হাবেসী, রুমী,
খোরাসানী, উজ্বেগ সকল ॥
লাহুরী, মুলতানী, সিন্ধী, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, হিন্দী,
কামরূপী আর বঙ্গদেশী। [প. (হ), পৃ: ১৭]

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দৌলৎ কাজি তাঁহার একমাত্র কাব্য আরাকানাধিপতি থিরি-থু-ধম্মার (১৬২২-১৬৩৮) রাজসভায় থাকিয়া রচনা করেন। থিরি-থু-ধম্মার নামাঙ্কিত মুদ্রায় তাঁহার সম্পর্কে শ্বেত হস্তিরাজ (Lord of the White Elephant) এই সম্মানীয় বিশেষণের প্রয়োগ দেখা যায়।[৪] দৌলতের কাব্যেও ইহার উল্লেখ আছে :

মহামত্ত ঐরাবতে দেখি কৃতি যশ।
শ্বেতরূপে সুধর্মের হৈল পদ বশ ॥ [স. ম., পৃ: ৫]

থিরি-থু-ধম্মা নামটি দৌলৎ ও আলাওলের রচনায় শ্রীসুধর্ম এই সংস্কৃত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আমরা এখন হইতে তাঁহাকে এই নামেই অভিহিত করিব।

শ্রীসুধর্ম তাঁহার ষোলবৎসর রাজত্বকালের মধ্যে প্রায় বারো বৎসর কাল রাজা থাকিয়াও রাজা হন নাই, অর্থাৎ অনভিষিক্ত নরপতি ছিলেন। ইহার কারণ, এক গণৎকার নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে,

১ H. Bur. (H). পৃ: ১৩৯; C. H. I. IV, পৃ: ৪৭৭ ২ তু: পৃ: ৫
৩ H. Bur. (H), পৃ: ১৪০; C. H. I. IV, পৃ: ৪৭৭ ৪ J. A. S. B., XV, 1846, পৃ: ২৩৪

রাজ্যাভিষেকের এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইবে।[১] সেজন্য ১৬৩৫ খৃস্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়, নরবলি প্রভৃতি নানা ভয়াবহ অনুষ্ঠান সহযোগে।[২] দৌলৎ কাজির কাব্যেও রাজার সম্বন্ধে গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কবি লিখিয়াছেন যে, মহারাজ শ্রীসুধর্ম মৃত্যু ভয়ে (স্পষ্টতঃ এই মৃত্যু ভয় গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই সূচিত করিতেছে) রাজ্যভার তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আশ্‌রফ খানের হস্তে রাখিয়াছিলেন, কারণ রাজপুত্র তখনও যোগ্য হইয়া উঠেন নাই। দৌলৎ লিখিয়াছেন :

মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ-মন।
তান[৩] হস্তে রাজনীতি কল্য সমর্পণ ॥
মহাদেবী অনেক ভাবিল সুনিশ্চিত।
রাজপুত্র হস্তে অধিক সুপাত্র পণ্ডিত ॥ [স. ম., পৃ : ৫-৬]

দেখা যাইতেছে রাজার প্রধানা মহিষীরও ইহাতে মত ছিল।

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে দৌলৎ যখন কাব্য রচনা করেন তখনও শ্রীসুধর্ম রাজ্যাভিষিক্ত হন নাই। এমন্ কি মনে হয় যেন তিনি সবেমাত্র রাজ্যাধিকারী হইয়াছেন। যদি সবেমাত্র রাজ্যাধিকার পাওয়ার অনুমানটাই ঠিক হয় তাহা হইলে দৌলতের কাব্যরচনা কাল ১৬২২ বা ১৬২৩ খৃস্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। আর যদি এমন্ অর্থ করা হয় যে, দৌলৎ রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থার কথা বলিতেছেন মাত্র এবং তাঁহার কাব্যরচনা কালে আশ্‌রফের প্রাধান্যের কারণ বুঝাইতেছেন, তাহা হইলে কাব্যরচনা কাল ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে যে কোনো সময় ধরিতে হইবে। যাহা হোক, উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে দৌলতের কাব্যরচনা কাল শ্রীসুধর্মের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে ; অর্থাৎ ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে।[৪]

দৌলৎ কাজির যে-একমাত্র অর্ধসমাপ্ত কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বা তৎকালীন নৃপতি শ্রীসুধর্ম ও তদীয় পরিবার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাও বিশেষ মূল্যবান্। সে যাহাই হোক, দৌলৎ তাঁর রচনাটি সমাপ্ত করিবার পূর্বেই তাঁহার ইহলীলা সাঙ্গ হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য আরাকান রাজসভার দ্বিতীয় ভাস্বর জ্যোতিষ্ক আলাওল কর্তৃক সমাপিত হয়।

দৌলতের কাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। বটতলার গ্রন্থের[৫] ১৯৮ পৃষ্ঠার মধ্যে ১০৩ পৃষ্ঠা মাত্র দৌলতের রচনা, বাকি ৯৫ পৃষ্ঠা আলাওল লেখেন। এই দুই অংশ হইতে দুই কবির রচনার তুলনার কথা স্বভাবতঃই মনে হয়। তবে যদিও কবি হিসাবে দৌলৎ নিঃসন্দেহে আলাওল হইতে শ্রেষ্ঠ, তথাপি দৌলতের কাব্যের শেষাংশের রচনা হইতে আলাওলের কবিত্বের বিচার করা খুব ন্যায্য হইবে না। কেন না, আলাওলের এই রচনায় তাঁহার কবি-প্রতিভা ঠিক

১ H. Bur. (H), পৃঃ ১৪৪
২ ঐ, পৃঃ ১৪৪ (পা. টী.)
৩ অর্থাৎ মন্ত্রী আশরফ খানের
৪ J. A. S., XX, No. 2, 1954, পৃঃ ১৯৩
৫ হামিদী প্রেসে মুদ্রিত।

স্বতঃ-উৎসারিত হইয়া প্রকাশের সুযোগ পায় নাই। আরাকান-রাজ সান্দ থুধম্মা বা আলাওল-দত্ত সংস্কৃতরূপে চন্দ্র সুধর্মের (১৬৫২-১৬৮৪) মহাপাত্র সুলেমান বা সোলেমানের আদেশে তাঁহাকে দৌলতের এই কাব্য সমাপ্ত করিতে হয়। অপরের রচনা বহুদূর অগ্রসর হইয়া পরিত্যক্ত হইবার পর, সহসা ইহারই ছিন্ন সূত্র যুক্ত করিবার ভার নিতান্ত সহজ বলিয়া মনে হয় না। তাই এই কাব্যে আলাওলের রচিত অংশের অমুজ্জ্বলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। মনে হয় আলাওল যেন কোনো মতে দায় সারিয়াছেন। যে পঁচানব্বই পৃষ্ঠা তিনি লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার এক অবান্তর গল্পের তিনি অবতারণা করিয়াছেন, প্রধান কাহিনী মধ্যে একটি দৃষ্টান্তের অজুহাতে।[১] এইরূপে কোনো প্রকারে কাহিনীটিকে তিনি গতানুগতিক ভাবে শেষ করিয়াছেন। যদিও নিছক কাহিনীটি দৌলৎ বা আলাওল কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে, কোনো অজ্ঞাত হিন্দী আখ্যায়িকা ইহার মূল, তথাপি দৌলতের কাহিনী বলিবার স্বাভাবিক ভঙ্গিমা ও কবিত্বের সরসতা আলাওলের অংশে ক্বচিৎ মিলে। আলাওলের পাণ্ডিত্য ও শব্দসম্ভার হয়ত দৌলতে নাই কিন্তু কবিত্বে তিনি আলাওলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন তাহাতে সংশয়ের কিছু নাই।

দৌলৎ তাঁহার অংশ রচনা করেন ১৬২২ হইতে ১৬৩৫ খৃস্টাব্দের কোনো এক সময়ে, হয়ত বা আদি সীমার কাছাকাছি সময়েই।[২] অতঃপর বহুবৎসর পরে আলাওলের ডাক পড়িল ঐ অসমাপ্ত কাহিনী শেষ করিবার জন্য। সৌভাগ্যক্রমে আলাওল তাঁহার অংশে গোড়াতেই সবিস্তারে বলিয়া দিয়াছেন দৌলতের মৃত্যু ও তাঁহার রচনারম্ভের মধ্যে কত কাল ব্যয়িত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আলাওলের নিজের ভাষায় তাঁহার বক্তব্য নিম্নে উদ্ধার করা গেল :

আশরফ আজ্ঞায় দৌলৎ কাজি ধীর।
রচিল চন্দ্রানী কথা অতি সুরুচির॥

...

আশরফে আজ্ঞ বারো মাস আরম্ভিলা।
বৈশাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিলা॥
তবে কাজি দৌলৎ স্বর্গেত হৈল লীন।
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন॥

...

এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্মার শেষে তিন নরপতি চলি গেল॥
তবে পুনঃ রাজ্যের হৈল ভাগ্যোদয়।
শ্রী চন্দ্র সুধর্ম সে নৃপ মহাশয়॥

১ অবশ্য মূল হিন্দীতে এই দীর্ঘ অবান্তর কাহিনী ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। [পরে দ্রষ্টব্য]
২ পৃঃ ৯

শুভক্ষণে হৈল রোসাঙ্গে অধিপতি।
দুঃখী সুখী হৈল, দুর্জন অধোগতি ॥[১]

উপরে উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায় যে দৌলৎ 'বারমাস্যা' রচনাক্রমে (আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া) একাদশ মাস বৈশাখ পর্যন্ত আসিয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ অংশে ইহাও বলা হইয়াছে যে সুধর্মের (১৬২২-১৬৩৮) পর আরও তিন জন নৃপতি গত হইলে শ্রীচন্দ্র সুধর্ম (১৬৫২-১৬৮৪) আরাকানের সিংহাসনে বসিলেন। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে এই তিন জন নৃপতি ছিলেন, যথাক্রমে মিন্‌সানি (১৬৩৮) যিনি মাত্র ২৮ দিন রাজতখতে ছিলেন[২], নরপতিগিয্য (১৬৩৮-১৬৪৫) এবং থদো বা থদে' মিন্‌তার (১৬৪৫-১৬৫২)।[৩]

দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে আলাওল তাঁহার রচনা সুরু করিলেন চন্দ্র সুধর্মের রাজত্বকালে তদীয় মহাপাত্র সোলেমানের আদেশে :

এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু আনিয়া মিলাও এক ঠামে ॥[৪]

...

আদেশ কুসুম তান শিরেতে ধরিয়া।
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালী রচিয়া ॥[৫]

সতী ময়নার আলাওল কৃত অংশের রচনাকালের একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায় চন্দ্র সুধর্মের রাজ্যকাল হইতে। কিন্তু আরাকান-ইতিহাসের এই অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি দীর্ঘ বাত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব কেবলমাত্র চন্দ্র সুধর্মের রাজত্বকাল হইতে আলাওলের এই রচনার নিদিষ্ট তারিখ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সুখের বিষয় আলাওল তাঁহার রচনার শেষে প্রচলিত প্রথানুযায়ী প্রহেলিকা পয়ারে তাঁহার রচনা-সমাপ্তির তারিখ দিয়াছেন এইরূপ :

(১) মুসলমানী শক সংখ্যা শুন দিয়া মন।
অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন ॥
সিন্ধু শূন্য রাখিয়া আপনি দুই দিগে।
সুত কলানিধিরে রাখিবা বাম ভাগে ॥[৬]

(২) মগদের সনের শুনহ বিবরণ।
যুগে শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাঙ্কন ॥[৭]

প্রথম শ্লোকটি হইতে সহজেই মিলে ১০৭০ হিজরি অর্থাৎ ১৬৫৯ খৃস্টাব্দ। দ্বিতীয় শ্লোক হইতে পাওয়া যায় ১০২০ মঘী বর্ষ অর্থাৎ ঐ ১৬৫৯ খৃস্টাব্দ[৮]। সুতরাং আলাওল প্রদত্ত তারিখ দুই পথেই

১ স. ম. পৃঃ ১০৫
২ J. A. S. B. XIII, 1844, পৃঃ ৫১
৩ H. Bur. (H), পৃঃ ১৪১, ৩৭২
৪ সোলেমানের উক্তি [স. ম. পৃঃ ১০৮]
৫ স. ম., পৃঃ ১১০
৬ ঐ, পৃঃ ১১৮
৭ ঐ
৮ Enc. Britt., XIII., পৃঃ ৫০০

দাঁড়ায় ১৬৫৯ খৃস্টাব্দ এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আলাওল সতী ময়না কাব্যের শেষার্ধের রচনা সমাপ্ত করেন ১৬৫৯. খৃস্টাব্দে, দৌলতের রচনার ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর পরে। মনে হয় আলাওলের লেখনী এই সময় খুবই ব্যস্ত ছিল; কেন না, এই সময়ের কাছাকাছিই তিনি সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল কাব্যের প্রথমাংশ রচনা করেন। যখন সয়ফুলমুলুকের প্রথমাংশ তিনি লেখেন তখনও তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর[১] জীবিত, কিন্তু সতী ময়নার শেষাংশ রচনাকালে মাগন জীবিত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সয়ফুলমুলুকের রচনা সুরু হয় সতী ময়নার অব্যবহিত পূর্বে তাহাতে সন্দেহ নাই।[২] ইহা ছাড়া তাঁহার সপ্ত পয়কর গ্রন্থখানিও সম্ভবতঃ ইহারই কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়। মনে হয়, সতী ময়নার রচনা চুকাইয়াই তিনি সপ্ত পয়করে হাত দেন। এই ব্যস্ততার জন্যই হয়ত বা সতী ময়নার রচনায় উৎকর্ষের অভাব লক্ষিত হয়। অন্ততঃ এই গ্রন্থ যে কিছু তাড়াতাড়িই রচিত হয় তাহাতে সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ আলাওলের সতী ময়নার অংশে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতীর কাহিনীর প্রভাব দেখিয়া অনুমান হয় যে তিনি সতী ময়নায় নূতন কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ মন না দিয়া স্থানে স্থানে পদ্মাবতীর অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলাওলের সতী ময়নায় রাণী ময়নাবতীর হাতে রাজা ছাতনের দূতী রত্তনা বা রত্নার যে-অবস্থা হইয়াছে তাহা কবির পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতী-হস্তে রাজা দেবপালের দূতী কুমুদিনীর লাঞ্ছনার অবিকল অনুরূপ। অতঃপর স্বামি-বিরহ-বিধুরা প্রোষিত-ভর্তৃকা ময়নাবতী যেমন আত্মহত্যার চিন্তা করিতেছেন এবং তাঁহার সখী তাঁহাকে যেমন নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, একই প্রকার অবস্থায় আত্মহত্যার চিন্তায় রত ভর্তৃবিরহকাতরা পদ্মাবতীকেও তাঁহার সখী ঠিক তেমনি ভাবেই নিবৃত্ত করিতেছেন। দুই কাব্যের দুই বিভিন্ন রাণী এবং সখীরা এই প্রসঙ্গে যথাক্রমে যে-সমস্ত কথা বলিতেছেন সেগুলির মধ্যেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। দূতীকে দূর করিবার পর ময়নাবতীর অবস্থা এইরূপ:

দূতীর দুর্গতি, করি ময়নাবতী,
অনুশোচ ভাবে মন।
স্বামী বিনে নারী, কি হেতু না ধরি,
কি মোর বৃথা যৌবন॥
নগরের দূত, অতি হীন সুত,
ছাতন সে যে অজ্ঞান।
যে লাগি পারেন্দ্র, নাহিক লোরেন্দ্র,
সহম এত অপমান॥

১ আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য পদ্মাবতী ইঁহারই আশ্রয়ে ও উৎসাহে রচিত হয় (১৬৪৫-১৬৫২ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে)।

২ আ. রা. স. বা. সা. পুস্তকে এই দুই রচনার তারিখে গোলমাল আছে বলিয়া মনে হয় [ঐ, পৃঃ ৫১]

শুন চন্দ্রমুখী, প্রাণাধিক সখী,
জীবনে নাহিক সাধ।
কর বিষ দান, তেজিমু পরাণ,
খণ্ডউক মন-বিষাদ ॥

... [স. ম., পৃঃ ১১৮]

সখী বলিল :

কুবচন বলি মনে দুঃখ দিল দূতী।
সেই পাপে হৈল তার এতেক দুর্গতি ॥
যার মনে যেন ভাব তেন ফল হয়।
স্বর্গেত ফেলিলে থুক অঙ্গেত পড়য় ॥ [স. ম., পৃঃ ১১৯]

পদ্মাবতীর অবস্থার বর্ণনাও নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

দূতীরে করিয়া শাস্তি পদ্মাবতী রাণী।
অপমানে চাহে বালা তেজিতে পরাণী ॥
স্বামী মোর শিরোপরে নাহিক কারণ।
হেন ক্ষুদ্র অধমে বোলয় দুর্বচন ॥
শরীরে না সহে মোর হেন অপমান।
বিষ আনি দেও সখী তেজিব পরাণ ॥
সখী বলে অনুচিত যে জনে কহিল।
কৃত অপরাধ শাস্তি যোগ্যমতে পাইল ॥
উত্তমেরে অসদৃশ অধমে বলয়।
স্বর্গেত ফেলিলে থুক বদনে পড়য় ॥ [প. (হ), পৃঃ ২৫৪]

ইহা ছাড়া পদ্মাবতী কাব্যের একাধিক উপমা, এপিগ্রাম, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি আলাওলের সতী ময়নার অংশে হুবহু পাওয়া যাইতেছে। এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল :

স্বর্গেত ফেলিলে থুক অঙ্গেত পড়য়। [স. ম., পৃঃ ১১৯]

স্বর্গেত ফেলিলে থুক বদনে পড়য়। [প (হ), পৃঃ ২৫৪]

শ্যামল পুতলি বিনা নয়ন আন্ধার। [স. ম., পৃঃ ১১৭]

শ্যামল পুতলি শোভে নয়ন ধবলে। [প (হ), পৃঃ ২৫১]

বালী সুগ্রীবের সঙ্গে ভুঞ্জি সুখ রতি।
তুই পতি তারার সকলে বলে সতী ॥ [স. ম., পৃঃ ১৮২]

বালী বিনা সুগ্রীবে বরিল তারাবতী।
তথাপি সংসার মাঝে তারা মহাসতী ॥ [প (হ), পৃঃ ২৫৩]

এইরূপ আরও অনেক আছে।

যাহাই হোক, আলাওল যে দৌলৎ কাজির অসমাপ্ত রচনা ১৬৫৯ খৃস্টাব্দে বেশ একটু দ্রুততার সহিত এবং যথোপযুক্ত মনোযোগ না দিয়াই সমাপ্ত করিয়াছেন তাহা উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। এক্ষণে দৌলতের রচনার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

দৌলতের কাব্য-কাহিনীর মূল আজও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু কোনো প্রাচীন হিন্দী কাব্য বা হিন্দী লৌকিক কাহিনী ইহার মূল ছিল বলিয়া মনে হয়। কেন না, দৌলৎ তাঁহার কাব্য-রচনার ইতিহাস এই বলিয়াছেন যে, রাজা সুধর্মের অমাত্য আশরফ খান একদা কবিকে লোরক ময়নার কাহিনী বাংলা ভাষায় শুনাইতে আদেশ করেন যেহেতু সভায় এমন অনেকে ছিলেন যাঁহারা হিন্দী ভাষা বুঝেন না। প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলি এইরূপ :

শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি[১]।
শুনাতে লোরক-রাজ ময়নার ভারতী ॥
... ...
ঠেঠা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে[২]।
না বুঝে গোহারি ভাষা কোনো কোনো জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥
তবে কাজি দৌলৎ বুঝিয়া সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥ [স. ম. পৃঃ ৯]

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রে বলা হইয়াছে যে গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় বলিলে এই কাহিনী কাহারও কাহারও নিকট অবোধ্য রহিবে। তৃতীয় ছত্রের পাঠ হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে এই একই কাহিনী দৌলৎ সাধন নামক কোনো হিন্দী কবির রচনায় দেখিয়া থাকিবেন। এই সাধনের "মৈনা সত" বা "সতী ময়না" নামক কেবলমাত্র একখানি অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র হিন্দী কাব্যের পুথির অস্তিত্বের

১ অর্থাৎ আশরফ খান।

২ আ. রা. স. বা. সা., পৃঃ ৬২-৬৩। পাঠান্তর: 'কহিলে সদনে' [স. ম, পৃঃ ৯; প্রা. পু. বি. পৃঃ ২৪৫]। এই পাঠ ঠিক হইলে এস্থলে সাধন কবির উল্লেখ অস্বীকার করিতে হয়। (পরে দ্রঃ)

কথা জানা গিয়াছে। কবির রচনা বা অস্তিত্বের সঠিক কাল জানা যায় নাই।[১] যাহাই হোক, গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় লিখিত সাধন নামক কবির এই কাহিনী মূল ভাষায় বলিলে বঙ্গভাষাভাষীর দল ইহা বুঝিবেন না। তাই দৌলৎ ইহা বাংলা ভাষায় বলিতেছেন। আলাওলের উক্তিতেও ইহার সমর্থন আছে :

হিন্দুস্থানী ভাষে সেই চৌপাইয়া ঠেট।
কেহ কেহ বুঝে কেহ ভাবয় সঙ্কট ॥
এ লাগিয়া আশরফে কৈল অঙ্গীকার।
লোর চন্দ্রানীর কথা রচিতে পয়ার ॥
আশরফ আজ্ঞায় দৌলৎ কাজি ধীর :
রচিল চন্দ্রানী কথা অতি সুরুচির ॥ [স. ম. পৃঃ ১০৫]

তবে মনে হয় দৌলৎ যে-কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা সুরু করেন তাহা হিন্দী লৌকিক কাহিনীরই অন্তর্গত এবং কবি সাধনও তাঁহার কাব্যের কাহিনী ঐ লৌকিক কাহিনী হইতেই লইয়াছিলেন। বোধ করি সেই জন্যই আলাওল সাধন কবির নাম করেন নাই। আলাওল তাঁহার পদ্মাবতী, সপ্ত পয়কর, দারাসেকান্দরনামা প্রভৃতি পুস্তকে সর্বাগ্রে আদি কবিদের নাম অতি শ্রদ্ধাভরে সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়াছেন। সতী ময়না বা লোর-চন্দ্রানীর কাহিনীও বিশেষ কোনো কবির নিকট হইতে গৃহীত হইলে মনে হয় আলাওল কখনই সে কবির নামোল্লেখে ত্রুটী করিতেন না।

যাহা হোক, দৌলতের রচনার ঠিক মূল জানা না গেলেও, তাঁহার বর্ণিত কাহিনীর প্রাচীন অস্তিত্বের প্রমাণ কিছু কিছু মিলে। এই কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে উত্তর বিহারের মৈথিলী ভাষায় চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্যের বর্ণনরত্নাকরে লোরিক নৃত্য প্রসঙ্গে[২]। এই উল্লেখ হইতে বেশ বুঝা যায় যে সে সময় লোর-চন্দ্রানীর লোকপ্রিয় কাহিনী কোনো না কোনো রূপে নৃত্য সহযোগে গীত হইত। উত্তর বিহারে এই কাহিনী অধুনাবধি গীত হয় বলিয়া শুনা যায় এবং গ্রীয়ার্সন সাহেবের বিহারী পল্লীগীতি সংগ্রহের মধ্যেও ইহা আছে। প্রাচীন কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :

গৌড়-রাজ মাহারার কন্যা চানায়নের, সেওধারীর সহিত পরিণয় নিষ্ফল হইবার পর, লোরিক-মল্লের সহিত চানায়নের সাক্ষাৎ ও তৎপরে উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়। লোরিক পত্নী-মাজরকে ফেলিয়া চানায়নকে লইয়া পলাইয়া গিয়া হরদি-রাজকে ধ্বংস করিয়া সেখানকার রাজা হইলেন। অতঃপর ঠক-রাজ্যের অধীশ্বরের সহিত পাশা খেলায় হারিয়া সর্বস্বান্ত লোরিক, পত্নীকে পর্যন্ত অক্ষ-বিজেতার হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, চানায়ন স্বয়ং খেলায় নামিয়া ঠক রাজকে পরাজিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে লোরিক ঠকপুর জয় করিয়া ফেলিলেন ও তৎপরে গেলেন কৈলরপুর। সেখানকার নরপতি করিঙ্গা চানায়নের প্রেমে পড়িলেন ও যুদ্ধে লোরিককে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে শূলে দিতে গেলেন। সেই সময়

১ B. I. (T.), Section II, pt. I, p. 88 (d).
২ ব. র (জ্যো. ক.), পৃঃ ১

চানায়নের স্তবে তুষ্ট হইয়া দুর্গাদেবী লোরিককে রক্ষা করিলে লোরিক পুনরায় যুদ্ধ করিয়া করিঙ্গাকে বধ করিলেন ও তথাকার রাজা হইলেন। অতঃপর তীরহুতে গিয়া লোরিক হিউনির নবাবের নিকট পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। লোরিকের ভ্রাতা আসিয়া জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার করিলেন। ইহার পর দুর্গাদেবীর নিষেধ অমান্য করিয়া অতিরছা মুলুক অধিকার করিতে গিয়া লোরিক পতঙ্গে পরিণত হইলেন। অতঃপর দুর্গাদেবীর নিকট স্বপ্নে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া লোরিকের প্রথমা পত্নী মাজর আসিয়া লোরিককে মৃতসঞ্জীবন জল ছিটাইয়া পুনরায় মানুষ করিলেন ও উভয়ের মিলন হইল।[১]

দৌলতের কাহিনীটি নিম্নলিখিতরূপ :

গোহারির রাজা মোহরার কন্যা চন্দ্রানীর এক নপুংসক বামনের সহিত বিবাহ নিষ্ফল হইবার পর রাজা লোরক বা লোরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয়ের সঞ্চার হয়। রাজা লোরক পূর্ব মহিষী ময়নাবতীকে ভুলিয়া গোহারি রাজ্যে গিয়া সেখান হইতে চন্দ্রানীকে লইয়া পলায়নকালে পথিমধ্যে বামনকে বধ করিয়া শ্বশুরের অনুরোধে গোহারি রাজ্যে ফিরিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এদিকে স্বামিবিরহকাতরা ময়নাবতী কাঁদিয়া আকুল। তাঁহাকে পতি-বর্জিতা দেখিয়া দুষ্ট রাজকুমার ছাতন তাঁহার নিকট প্রণয় প্রস্তাব করিয়া রত্তনা (রত্না) নামে দূতীকে প্রেরণ করিলেন। ময়নাবতী রত্নার প্রস্তাব বারংবার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। কাহিনী এই পর্যন্ত দৌলতের রচনা। ইহার পর দৌলতের মৃত্যু ঘটিলে আলাওল এই কাহিনী সমাপ্ত করেন এই ভাবে :

ময়নাবতী শেষ পর্যন্ত রত্নার ঘৃণিত প্রস্তাবে উত্ত্যক্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়া দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর স্বামীর বিরহে নিতান্ত কষ্ট পাইয়া সখীর উপদেশে এক ব্রাহ্মণকে লোরের সন্ধানে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ লোর সমীপে গিয়া এক সারিকার মুখ দিয়া রাজাকে ময়নাবতীর বিরহ বেদনার কথা সমস্ত শুনাইতেই রাজার চৈতন্য হইল। অতঃপর চন্দ্রানীর পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া লোর চন্দ্রানী সহ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া দুই রাণী লইয়া সুখে দীর্ঘ কাল যাপন করিলেন। অবশেষে লোরের মৃত্যু ঘটিলে দুই রাণীও সহমরণে গেলেন।

দৌলতের কাহিনীর প্রারম্ভে আদি গল্পের প্রভাব লক্ষণীয় ; তবে, পরে দৌলৎ ও আলাওলের হস্তে গল্প মার্জিত, সরস ও স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পের কাঠামোয় বিখ্যাত হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর (১৫৪০ খৃঃ) পদ্মাবতী কাব্যের প্রভাবও লক্ষণীয়। এই পদ্মাবতী কাব্যই আলাওল থদো মিন্তারের রাজ্যকালে (১৬৪৫-৫২) অনুবাদ করেন। কেবল গল্প নহে ঘটনা কৌশল বা টেকনীকের মধ্যেও জায়সীর পদ্মাবতীর প্রভাব চোখে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দৌলতের রচনাংশে রাজা লোর দর্পণে চন্দ্রানীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন তাহা জায়সীর কাব্যে দর্পণে পদ্মাবতীর প্রতিবিম্ব দর্শনে আলাউদ্দীনের চৈতন্যলোপের হুবহু অনুরূপ। এস্থলে বলা আবশ্যক যে জায়সী, দৌলৎ কাজি ও আলাওল তিন জনেই সূফী মতাবলম্বী ছিলেন ; অতএব তিন জনের রচনার মধ্য দিয়াই কল্পনার একটি সাধারণ সুর, চিন্তার একটি ঐক্য লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না।

১ তুঃ ই. বা. সা., পৃঃ ২৮-২৯

কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরম ক্লেশের অবশেষে এই যে মিলনের কথা সূফী কবিদের কাব্যে মিলিতেছে, ইহা অসংখ্য দুঃখের পরে কণ্টকাকীর্ণ অতিদীর্ঘ পথের শেষে পারমার্থিক সুখ মিলে এই সূফী মতবাদের পরিপোষক একটি allegoryর মতো।[১]

দৌলতের কাব্য তৎসমশব্দবহুল তৎকালীন সাধু বাংলায় রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল যেখানে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় উক্তি আছে সেখানে কিছু কিছু আরবী ফার্সি শব্দ অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়াছে। কবি দৌলৎ নিজে সূফী মতাবলম্বী ধার্মিক পুরুষ ছিলেন তাহা তাঁহার রচনায় ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো চোখে পড়ে, যদিও এই ধর্মপ্রীতি তাঁহার কাহিনীর মধ্যে আসিয়া কোথাও জুড়িয়া বসিতে পারে নাই। রাজা সুধর্মের উজির আশরফ খান যিনি কবিকে কাব্য রচনায় প্রেরণা দেন তিনিও হানাফী[২] পথাবলম্বী চিস্তিয়া[৩] সূফী ছিলেন: "হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি খান্দান"। [স, ম, পৃঃ ৫]

দৌলতের ধর্মপ্রীতি যদিও তাঁহার গল্পের মধ্যে আসিয়া জুড়িয়া বসিতে পারে নাই তথাপি কবির ধর্মানুরাগের পরিচয় কাব্যের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্ট হয়। যখন গোহারি-রাজ জামাতা লোরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর বৃদ্ধ বয়সে লোকান্তর যাত্রা করিলেন, কবি তখন বলিতেছেন:

দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যায় আন আইসে কেহ নহে সার॥
এ সব জানিয়া মতিমন্ত বুধ জন।
দান-ধর্মে[৪] যায় করি দিবস যাপন॥ [স. ম., পৃঃ ৭৫]

কবি অন্যত্র সমাধির যে চিত্র দিয়াছেন তাহাও সূফীধর্মানুগ হইলেও ইহা সবিকল্প যৌগিক-সমাধিরই অবিকল চিত্র। চিত্রটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:

... ...
পরস্পর ভয়, সব দূরে রয়,
গহিনে মজয় মন।
উর্ধ্বশ্বাস বয় পারিয়া মারয়,
কাম আদি বীরগণ॥
জ্ঞান সমুদ্রেত, ডুবি মন চিত,
বিস্মৃত কায়া ভাসে।
নাহি মিলে স্থল, হইয়া চঞ্চল,
মন বান্ধি সেই আশে॥

১ হিন্দী সাহিত্য (হা. দ্বি), পৃঃ ২৬৭

২ আবু হনীফ (মৃ. ৭৬৭ খৃঃ) এই পথের প্রবর্তক ছিলেন [Enc. Britt., XVII, পৃঃ ৪১৫]

৩ মুইন (অ) উদ্দীন মুহম্মদ চিস্তী এই সূফী মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে আসেন [ব. সু. প্র. (এ. হ), পৃঃ ৪০] ভারতে যে সমস্ত সুফী সম্প্রদায় প্রাচীন কাল হইতেই প্রাধান্য লাভ করে তন্মধ্যে সুহরওয়ার্দি ও চিস্তী সম্প্রদায়ই উল্লেখযোগ্য। [M. I. Q., Oct., 1950, পৃঃ ২]

৪ দানশীলতা সুফী ধর্মের একটি প্রধান কর্তব্য [ব. সু. প্র. (এ. হ) পৃঃ ৭২]

নয়ন মুদিয়া, পাতাল ভেদিয়া,
দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।
স্থলে ডিম্ব রাখি, জলে কূর্ম থাকি,
কূর্মে ডিম্বে দৃষ্টি ধরে॥
মারি মায়াজাল, জগৎ জঞ্জাল
দশ দিশ করে দূর।
লক্ষ্য অন্তস্পট, লজ্যি দেখ তট,
নির্মল চিত্তের মুকুর॥
পরিণাম ভাল, জানিয়া সকল,
রাখিলাম এই চিত।
একহি ভাবনা, ভাবিতে আপনা,
লোক হস্তে হৈলুঁ ভীত।
বাহির ভিতর, দোহ সমসর,
তাতে নাহি দয়ামায়া।
সমুখে বিমুখে, সূর্য জ্যোতি দেখে
পরিচয় মন কায়া॥
… … [স. ম., পৃঃ ২৮-২৯]

দৌলতের কাব্য সরস কবিত্বে পূর্ণ। স্থানে স্থানে বর্ণনা যেমন কবিত্বময় তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার বর্ণিত 'বারমাস্যা' অনুরূপ প্রচলিত সাধারণ বর্ণনা গুলির মত প্রাণহীন বা গদ্যময় নয়। চিরাচরিত রীতিতে শুধু নায়িকার ব্যক্তিগত দুঃখের কথাই তাঁহার বারমাস্যায় প্রকাশিত হয় নাই, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত নায়িকার বেদনাতুর চিত্তের যোগাযোগ সম্পন্ন হইয়া সুললিত সঙ্গীতে নিখিল মানবের অন্তর্নিহিত বেদনার আভাসও ইহার মধ্যে স্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

'বারমাস্যা' রচনায় দৌলৎ আরও অভিনবত্ব আনিয়াছেন ইহার মধ্যে ব্রজবুলির ব্যবহারে। বিরহিনী ময়নার নিবিড় চিত্তবেদনা প্রকাশ করিতে গিয়া কবি নব-বর্ষার রূপটি প্রকট করিয়াছেন অতি সুন্দর:

প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিনী বিরহ বাড়য় অতি গাঢ়॥
মদন-ঐষিক জিনি নিরখিলা ঘন।
শিখরে নাচয় শিখি ধরিয়া পেখন॥
…
…

যার ঘরে কান্ত, সব সোহাগিনী
পূরে মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা, তামসী রজনী,
নির্জন সঙ্কেত ঠাম ॥
দারুণী ডাউক, দাদুরী, ময়ুর,
চাতকিনী নাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে, শ্রবণ বিদরে,
না সহয় মনে মদন ॥
...
শুনহ উকতি, করহ ভকতি,
মানও স্থরতি রাই।
নাগর স্থজন, মিলাই দেম যেন,
রাধার কোলে কানাই ॥ [স. ম., পৃঃ ৮১-৮২]

যে সমস্ত বৈষ্ণব কবি ব্রজবুলিতে গীতিকবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বিশিষ্ট প্রভাব দৌলতের উপর স্পষ্ট দেখা যায়। তিনিও ব্রজবুলিতে বেশ কতকগুলি গীতিকবিতা বা গান তাঁহার সতী ময়না কাব্যের বারমাস্যা অংশে লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা ও ব্রজবুলি মিশাইয়া যে পদ-রচনার পরিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বা তৎপূর্বে দেখা যায়[১], তাহার স্থরু ঠিক কতপূর্বে হইয়াছিল নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; তবে দৌলতের রচনায় এইরূপ সংগীত পাওয়া যাইতেছে, এবং ইহা হইতে মনে হয় যে এই রীতি সপ্তদশ শতাব্দী বা তৎপূর্বেই স্থরু হয়।[২]

নিম্নে দৌলতের একটি ব্রজবুলি পদ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :

আয় ধাই কুজনী কি মোক শুনাওসি
বেদ উকতি নহে পাঠং।
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়
যো বিধি লিখল ললাটং ॥
না বোল না বোল, ধাই, অনুচিত বাণী।
ধরম না চাহসি তেজি সতীত্ব মতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি ॥
মোহর স্থনায়ক গুণের পালক
মধুর মুরতি মুখ ভেশং[৩]।

১ H. B. Litt., পৃঃ ৩০৮, ৩১০

২ তুঃ H. B. Litt., পৃঃ ৩১০

৩ ভেক+বেশ

সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ-পান
ভাল, ধাই, কহ উপদেশং ॥
তুহু বড় পাপিনী পাপ শুনাওসি
ধরম করাওসি বামং।
পাতকী ঘাতকী ধাই কি মোক চিন্তসি
জাতি কুল করহ নির্ণামং ॥
দুরন্ত দুর্মতি দুতি, দুতীপনা দুর করি
চিন্তহ মোর কল্যাণং।
কাজি দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ খানং ॥ [স. ম. পৃঃ ৮২-৮৩]

উপরের পদে কেবলমাত্র অনুস্বার যোগে সংস্কৃত-মিশ্রনের আভাস রহিয়াছে বটে তথাপি সংস্কৃত ও ব্রজভাষা মিশাইয়া যে পদ রচনার কথা শোনা যায় তাহার জড় এখানে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উপরে উদ্ধৃত পদটি পাঠ করিয়া স্বভাবতঃই বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদের[১] কথা আমাদের মনে হয়। শুধু ছন্দ নয়, ভাব ও ভাষাতেও দৌলতের ব্রজবুলিতে বিদ্যাপতির প্রভাব লক্ষিত হয়। উপরের পদটি রচনাকালে নিম্নলিখিত জনপ্রিয় পদটি ছন্দে লয়ে কবির মনে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হয় :

জনম অবধি হাম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল ॥[২]

দৌলতের পদগুলি হইতে ছত্রোদ্ধার করিয়া বিদ্যাপতির প্রভাব নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করা গেলেও এই প্রভাব সমস্ত মিলাইয়া সাধারণ ভাবে পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। উভয়ের সুরের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্বাধর্ম্য সহজেই চোখে পড়ে। এস্থলে দুই চারিটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। দৌলতের পদে বর্ষা ঋতুতে ভর্তৃ-বিচ্ছেদ-বিধুরা ময়না বিলাপ করিয়া বলিতেছেন :

মালিনী, কি কহব বেদন-ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥ (স. ম., পৃঃ ৮৪)

১ বহু বৈষ্ণব পদ বিদ্যাপতির (পঞ্চদশ শতাব্দী) নামে চলিত থাকিলেও ইহাদের রচয়িতা একজন বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতির পরে একাধিক কবি তাঁহার নামে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন [Mod. Vern. Litt. of Hindusthan (G.), পৃঃ ১০ ; L. S. I., V, Pt. II. পৃঃ ১৭]

২ বিদ্যাপতি [অ. বি ও খ. মি] পৃঃ ২৭৭-২৭৮ ; H. B. Litt. পৃঃ ১৬৩, ৫৩৭

বিদ্যাপতির একটি পদেও বর্ষায় কৃষ্ণবিরহাকুলা রাধিকা বলিতেছেন :

সখি হে হমার দুখক নাহি ওর
ই ভর বাদর মাহ ভাদর সূন মন্দির মোর।
[বি (অ. বি ও খ. মি,), পৃঃ ২৩৫, পদ, ৭১০]

উপরে উভয় কবির পদেই ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

শ্রাবণের আরম্ভ দৌলতের পদে এই ভাবে পাইতেছি :

সাওন গগনে সঘন ঝরে নীর। [স. ম., পৃঃ ৮৪]

বিদ্যাপতির বারমাস্যায় রাধাও শ্রাবণ-বর্ষণ ঐ একইভাবে অনুভব করিতেছেন :

সাওন মাস বরিস ঘন বারি। [বি (অ. বি ও খ. মি), পৃঃ ২৪০]

ভাষার মিল সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার কাতিকে যুবরাজ ছাতনের দূতী মালিনী বিরহিনী ময়নাকে স্বামি-বিরহের বেদনা এইভাবে স্মরণ করাইতেছে :

কাতিকেত কান্ত তোর গেল দিগন্তর। [স. ম., পৃঃ ৮৯]

সমস্ত শরৎকাল বহিয়া গেল, কিন্তু ময়নার বিরহ-ব্যথার অবসান ঘটিল না :

গমিল শারদ ঋতু না আইল কান্ত। [স. ম., পৃঃ ৮৭]

বিদ্যাপতির রাধাও শরতের অবসানে ঐ একই কথা ভাবিতেছেন :

কার্তিকেত কান্ত দিগন্তরে বাস। [বি (অ. বি ও খ. মি.), পৃঃ ২৭০]

অগ্রহায়ণ আসিল তথাপি ময়নার মদন-বেদনার কিছুমাত্র উপশম হইল না :

অন্তরে আগুন দিয়া দিগন্তরে কান্ত। [স. ম. পৃঃ ৯২]

বিদ্যাপতির নায়িকাও অগ্রহায়ণে অনুরূপ নৈরাশ্যে বিহ্বল :

অবহু ন আওল নিরদয় কান্ত। [বি. (অ. বি. ও খ. মি), পৃঃ ২৫০]

বিদ্যাপতির প্রকাশন-ভঙ্গিমাও দৌলতের রচনায় দেখা যায়। যেমন, বিদ্যাপতির "কৈসে গমাওব হরি বিনে দিন রাতিয়া"[১], প্রায় একই ভঙ্গীতে দৌলতে প্রতিফলিত হইয়াছে :

হরি বিনে কৈসনে পাইব আমি পার [স. ম., পৃঃ ৮৪]

অথবা,

অবিরত হরি নিতি জপ ইতি কলাবতী
আন মনে সমতুল নহেরে। [ঐ, পৃঃ ৮৬]

বিদ্যাপতির "কি কহব রে সখি" বলিয়া যে অন্তরের ভাব প্রকাশের একটি বিশিষ্ট রীতি দেখা যায় ইহাও দৌলতে দেখিতে পাই। যেমন :

কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ। [স. ম., পৃঃ ৯]

অথবা, কি কহিমু দোহানের মদন তরঙ্গ। [ঐ, পৃঃ ৪৯]

১ বি (অ. বি ও খ. মি). পৃঃ ২৩৩

অথবা, কি কহিমু সে রূপের মহিমা অপার [ঐ, পৃঃ ৯৫] ইত্যাদি।

দৌলতের কাব্যে আর একটি নাটকোচিত ঘটনার মধ্যে বিদ্যাপতির সুস্পষ্ট প্রভাব মিলিতেছে। ঘটনাটি হইতেছে এইরূপ। রাজা লোর মন্দিরে গিয়া চন্দ্রানীকে দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রানীও দুই একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে প্রেমাস্পদকে দেখিলেন। কিন্তু ভালো করিয়া দেখা হইল না। তাই লোর-রাজাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য চন্দ্রানী একটু কৌশল করিলেন। তিনি সহসা কণ্ঠের মণিহার ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রত্নাবলী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজকুমারীর সখীরা ব্যস্ত হইয়া ভূমিতে বসিয়া রত্নগুলি কুড়াইতে লাগিলেন। এই অবসরে দণ্ডায়মানা চন্দ্রানী লোরকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলেন।[১] দৌলতের কাব্যে এই দৃশ্যটি পড়িয়া আমাদের বিদ্যাপতি বর্ণিত একটি হুবহু অনুরূপ চিত্রের কথা মনে পড়ে। রাধা যমুনায় স্নান সারিয়া কৌশলে কণ্ঠের মতি-হার ছিঁড়িয়া ফেলিতেই, সঙ্গীরা ছড়ানো মুক্তা গুলিকে কুড়াইতে ব্যস্ত হইলেন। সেই দুর্লভ অবসরে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন :

তঁহি পুন মোতি-হার তোরি ফেঁকল
কহইত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম-দরশ ধনি লেল॥ [বি (অ. বি ও খ. মি,) পৃ : ১৩, পদ, ৩৮]

বিশেষ করিয়া বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদাবলী, তথা, বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব দৌলতের উপর কিরূপ গভীরভাবে পড়িয়াছে এক্ষণে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ দৌলতের রচনা হইতে অসংখ্য শ্লোক বা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রভাব দেখানো যাইতে পারে। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই প্রভাব কেবলমাত্র শ্লোক বা শ্লোকাংশে গণ্ডীবদ্ধ নহে, দৌলতের প্রোষিত-ভর্তৃকা নায়িকা ময়নার সমগ্র বিরহচিত্রে এবং দৌলতের প্রকাশ ভঙ্গিমায় বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

কবি জয়দেবের (দ্বাদশ শতাব্দী) স্বনামধন্য কাব্য গীতগোবিন্দের প্রভাবও দৌলতের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবের বহুজনবিদিত নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত পদের অপূর্ব ঝঙ্কার ও মাধুর্য সপ্তদশ শতাব্দীর এই মুসলমান কবির চিত্তকে সংগীত সুধায় মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সংশয় মাত্র নাই :

রতিসুখ সারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্।[২]

ইত্যাদি।

দৌলতের নিম্নলিখিত পদটি হইতে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে :

ভাদ্রমাসে চন্দ্রমুখী সুচরিতা একাকিনী
বসতি তিমির অতি ঘোরং।

১ স. ম., পৃ : ৪৪
২ শ্রী. গী. পৃঃ ৬৯

অধর মধুরৌ, তাম্বুল বিনা ধূসরৌ
নিচল চকোর আঁখি ঝোরং ॥
রাণী লো ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং।
দুরন্ত বিরহানল দহতি তব অন্তর
তথাপি না চেতন ময়না চেতং ॥
বকফুল-মঞ্জরী কিমিতি অতি সীদতি
মলিন অঞ্জন মুখ ভেশং।
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং ॥
সিন্দুর বিনে শীষ মলিন কেশ ভেশ
কিমিতি মলিন তনু চিরং।
শূন্য সুমন তনৌ শূন্য পাট সিংহাসনৌ
শূন্য সুবর্ণ মন্দিরং ॥
শেষ ঋতু বরিষণ নিষ্ফল ধনি বঞ্চসি
না গণসি হিত সুখসারং।
এ ভব ভোগ সম্পদ কিমিতি ধনি বঞ্চিত
তব তাত জগ-অধিকারং ॥
ভণতি কাজি দৌলত দূতী চাটু পটু কৃত
সতীকর্ণে অশনি সমানং।
লস্কর গুণমণি দানে কল্পতরু
শ্রীযুত আশরফ খানং ॥ [স. ম., পৃ : ৮৫-৮৬]

এই পদটিতেও সংস্কৃত বাংলা সংমিশ্রণের প্রয়াস দেখা যায়।

জয়দেবের ছন্দোমাধুর্য ও প্রসাদগুণের অনুসরণে রচিত আরও একটি পদ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :

আইল সুরুচি মধু মাস মধু ঋতু
চৌদিকে কুসুম বিকাশ।
মালতী কমল মল্লি-পরিমল
প্রসবিত কুঞ্জ সহাস ॥
নবচুত অঙ্কুর কিশলয় মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কলকল কূজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে ॥

কেতকী চম্পক কদম্ব কুরুবক
, বকুল-মুকুল-কুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধুপানে মধুকর
মানিনী মান বিভঙ্গে॥
কৈতব পরিহাসে মালিনী মধুভাষে
সতী-মতি দোলাইতে চাহে।
কাজি দৌলতে ভণে জানে তান যশ মানে
আশরফ খান সুনাহে॥ [স. ম., পৃঃ ১০০]

মনে হয় উপরের পদটি রচনার সময় কবির মনে জয়দেবের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি ভাসিতেছিল :

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে॥[১] ইত্যাদি।

দৌলতের কাব্য পাঠে মনে হয় শুধু বৈষ্ণব পদাবলী নহে, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী, সংস্কৃত কবি জয়দেব, এমন কি, মহাকবি কালিদাসের কাব্যের সহিতও তাঁহার রীতিমত পরিচয় ছিল। তাঁহার উপমা, রূপক প্রভৃতির মধ্যে পৌরাণিক উল্লেখ, কবিপ্রসিদ্ধি, ও প্রাচীন কবিদের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায় ; তবে এ সমস্তের ভিতরেও তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিমাটুকু কোথাও লোপ পায় নাই এবং বহুস্থল আছে যেখানে তাঁহার নিজস্বতা ও মৌলিকতা সর্বাগ্রে চোখে পড়ে।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ আছে এমন কয়েকটিমাত্র শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল :

১ বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্ন-ভার।
ভীম সম বলীও না করে বলাৎকার॥
সীতা সম সুন্দরী যদি সে রহে বনে।
রাজ ভয়ে না নিরক্ষে সহস্রলোচনে॥ [স. ম. পৃঃ ৪]

২ শুনিয়া দেখিয়া ইচ্ছা হৈল পুরন্দরে।
ধর্ম কীর্তি যশ সর্ব স্থানে শোভা করে॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ধরিয়া যোগান।
যশ-কীর্তি নিরন্তর সহস্র-নয়ান॥ [ঐ, পৃঃ ৫]

৩ বন-পাশে নগর এক দারাবতী নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিরাম॥ [ঐ, পৃঃ ৭]

১ শ্রী. গী. পৃঃ ২০

৪ সাফল্য জীবন যার রহিল সুনাম।
নামে চিরজীবী হৈল জানকী শ্রীরাম॥ [ঐ, পৃ: ৮]

৫ সত্য বলে রাজা হৈল পাণ্ডব-নন্দন।
সত্য সে পরম সিদ্ধি, বিজয়-কারণ॥ [ঐ, পৃ: ৯]

৬ জটাধারী ব্যাঘ্র চর্ম্ম বিভূতি ভূষণ
কণ্ঠে রুদ্র মালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন॥ [ঐ, পৃ: ১৩]

৭ সাক্ষাতে অম্বিকা যেন অনুভব করে। [ঐ, পৃ: ১৩]

৮ সখীগণ সঙ্গে তাকে পুজিনু বিস্তর।
বিদ্যাধরীগণে যেন পুজে পুরন্দর॥
স্বামিভাবে আপ্ত ভাব করি বহুতর।
সেবিলুঁ তাহারে যেন প্রত্যক্ষ শঙ্কর॥ [ঐ পৃঃ ২১

৯ ভার্যা হেতু পঞ্চ ভাই প্রবেশিল বনে।
জগৎ মাধুরী ভার্যা পুরুষ কারণে॥ [ঐ, পৃঃ ২২]

১০ তোমার কারণে লোর ধরে পীতাম্বর।
গৌরী প্রেম ভাবে যেন উন্মত্ত শঙ্কর॥ [ঐ, পৃঃ ৪৩]

১১ রসপুরে সখি সব বেড়িয়া কুমার।
গোপীগণ মধ্যে যেন গোপাল-বিহার॥ [ঐ, পৃঃ ৪৯]

১২ জীবনে কি ফল যদি কলঙ্ক রহিল।
কলঙ্কের ভয়ে সীতা পাতালে নামিল॥ [ঐ, পৃঃ ৫২]

১৩ অবশ্য আমার হাতে তাহার নিপাত।
মরিল কীচক যেন বৃকোদর হাত॥ [ঐ, পৃঃ ৫৪]

১৪ অবশ্য শুনিছ পাপী পুরাণে কথন।
প্রজাপতি বংশে জন্ম রাজা দশানন॥

সুরাসুর আদি যত ত্রিভুবনে বৈসে।
দাস প্রায় খাটিলেক রাবণ আদেশে॥
এক ছত্রে বসুমতী শাসিল রাবণে।
ঠাট পাট অস্তে গেল নারীর কারণে॥ [ঐ, পৃঃ ৫৪]
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মহাকবি কালিদাসের সহিত প্রত্যক্ষভাবেই হোক্ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবেই হোক্ যে-সমস্ত উপমা, রূপক বা উৎপ্রেক্ষার যোগাযোগ আছে তাহাদের মধ্যে দুই একটির দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল :

১ তুলা রাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ। [স. ম. পৃঃ ১]

ইহার সহিত তুলনীয় কালিদাসের—

তূলরাশাবিবাগ্নিঃ [অ. শ. ১ম অঙ্ক]

২ ষোল কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান। [স. ম., পৃঃ ৯]

কালিদাসের কাব্যে পাওয়া যাইতেছে—

উপারূঢ়ঃ সামগ্রামিব চন্দ্রমাঃ। [র ব, ১৭, শ্লো ৩০]

৩ দিবস চন্দ্রমা যেন বদন ধূসর [স. ম., পৃঃ ৩৭]

কালিদাসের রচনায় এই তুলনা একাধিক স্থানে লক্ষিত হয়—

শশাঙ্কলেখামিব দিবা [কু. স. ৫।৪৮]

অথবা ক্ষণদাপায়-শশাঙ্ক দর্শনঃ ইত্যাদি। [র. ব. ৮।৭৭]

৪ যেন ঘন পরিভঙ্গে উগিলেন্ত সুর। [স. ম., পৃঃ ১০]

কালিদাসেও এই তুলনা আছে—"ব্যভ্রস্যেব বিবস্বতঃ" [র. ব. ১৭।৪৮]

দৌলতের "চীনদেশী ধ্বজ বস্ত্র"[১] বাক্যাংশের মধ্যে কালিদাসের "চীনাংশুকমিব কেতোঃ"[২] শ্লোকাংশের ধ্বনি পাওয়া যাইতেছে, এবং যেখানে কবি লিখিয়াছেন "সুবর্ণ বরিষে যেন ইত্যাদি"[৩] সেখানেও কবির মনে কালিদাসের "হিরণ্ময়ীং বৃষ্টিং পতিতাং নভস্তঃ"[৪] ছত্রটি উদিত হইয়াছিল কি না কে জানে।

প্রচলিত কবি-প্রসিদ্ধি অথবা প্রাক্তন কবিদের প্রয়োগ অবলম্বনে যে সমস্ত উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও অন্যান্য অলঙ্কার দৌলতের কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলির মধ্য হইতেও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা হইল :

১ স. ম., পৃঃ ৪৭ ২ অ. শ., ১ অঙ্ক
৩ স. ম. পৃঃ ১৪ ৪ র. ব, ৫।২৯

১ কাঞ্চনকমল মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে।
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে ॥
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঞ্জনশরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে ॥
মদন-মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন।
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ ॥ [স. ম., পৃঃ ৯-১০]

২ স্বামী বিনে বিষণ্ণ কামের সে কামিনী।
চন্দ্রের বিচ্ছেদে যেন তাপিত রোহিনী ॥ [ঐ, পৃঃ ১৭]

৩ চকোরে পূজয় চাঁদ জগতে বিদিত। [ঐ, পৃঃ ১৭]

৪ চন্দ্র হানে ভানু তাপ কারণে তোমার। [ঐ, পৃঃ ১৮]

এই ছত্রের সহিত পদাবলী সাহিত্যের "শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি"[১] প্রভৃতি ছত্র তুলনীয়।

৫ মৎস্য যেন জিয়ে সুখে সুশীতল জলে। [ঐ, পৃঃ ২২]

৬ মীন যেন জল বিনি·· [ঐ, পৃঃ ৩৯]

ইহার সহিত হিন্দী কবি জায়সীর 'পদমাবৎ' কাব্যের নিম্নলিখিত ছত্রটি তুলনীয় : জস বিছোহ জল মীন দুহেলা [প. (জা। শু), ২১।২], অর্থাৎ জল না পাইলে মৎস্য যেমন কষ্ট পায়।

৭ সহজে করিব শঠে শঠ সমাচার। [স. ম., পৃঃ ২৬]

এই ছত্রের আদি-মূল বিখ্যাত সংস্কৃত প্রবাদ : শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

৮ নব নীর পানে যেন আনন্দ চাতক। [ঐ, পৃঃ ৬২]

৯ নব মেঘ নাদে যেন আনন্দ ময়ূর। [ঐ, পৃঃ ৬৯]

১০ চন্দ্রের উদয়ে যেন কুমুদ বিকাশ [ঐ, পৃঃ ৭০]

১১ যুবক পুরুষ-জাতি নিঠুর দুরান্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত ॥ [ঐ, পৃঃ ১০]

১ [বৈ. প. (দী. সে., ও খ. মি), পৃঃ ১৩৫]

অথবা পুরুষ ভ্রমরা জান মধু যথা পায়।
স্থগন্ধি-কুসুম-নারী রসেতে খেলায় ॥ [ঐ, পৃঃ ৫৫]

অথবা পুরুষ ভ্রমরা জাতি সম্ভ্রম না এড়ে।
যেই ফুলে মধু পায় তথা গিয়া পড়ে ॥ [ঐ, পৃঃ ৮৯]

সকৃৎ-কৃত-প্রণয়, বহু-বল্লভ পুরুষের সহিত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধুপান মত্ত ভ্রমরের এই যে বহু প্রসিদ্ধ উপমা ইহার সহিত তুলনীয় বড়ু চণ্ডীদাসের দুইটি ছত্র এস্থলে দেওয়া হইল :

পুরুষ ভ্রমর, দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥ [শ্রী. কী., পৃঃ ১৭৩]

দৌলতের কাব্যে চার[১] জায়গায় বিদ্যা ও সুন্দরের সুপ্রাচীন[২] প্রণয় গাথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :

১ চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম ॥ [স. ম, পৃঃ ৩১]

২ চন্দ্রাণীর রূপ ভাবি লোরক ফাপর।
বিদ্যারসে মগ্ন যেন বৈদেশী সুন্দর।॥ [ঐ, পৃঃ ৩৪]

৩ বিদ্যার সম্পাসে যেন বসিল সুন্দর।
দূরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর ॥ [ঐ, পৃঃ ৪৯]

৪ পুরুষবিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী।
সেহ চোর-প্রেমে মজি হৈল কামাধিনী ॥ ঐ, পৃঃ ৯১]

পূর্বে আলোচিত কাব্যালঙ্কার সমূহ ছাড়াও দৌলতের রচনায় এমন সমস্ত আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগকুশলতা আছে যাহা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব। এই শ্রেণীর কতকগুলি উপমা-রূপকাদি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত এখানে প্রদত্ত হইল :

১ সে গুণের ভাগ কেবা বাখানিতে পারে।
পিপীলিকা যেন সিন্ধু তরঙ্গ সন্তারে ॥ [স. ম. পৃঃ ১-২]

ইহার সহিত মহাকবি কালিদাসের বিনয়-বাণীর তুলনা করা যাইতে পারে : তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্। [র. ব. ১।২]

২ দশ দিন পন্থ নৌকা এক দিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায় ॥ [স. ম. পৃঃ ৬]

১ দুই জায়গায় নহে [আ. রা. স. বা সা, পৃঃ ১৯, পা. টী.]

২ আদিতে বিদ্যা এবং সুন্দর যথাক্রমে জ্ঞান ও রূপের প্রতীক্ ছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এবং এই কাহিনীর জড় সুদূর অতীতে নিহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। [জনসেবক. শারদীয়া সংখ্যা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১১৫-১১৭] ; আরও দ্রঃ বি. প., ১৩৫৪, পৃঃ ৫১-৫৪।

৩ চতুর্দিকে পাত্রগণ মাঝে নৃপবর।
তারক বেষ্টিত যেন চন্দ্রমা সুন্দর ॥ [ঐ, পৃঃ ৭]

৪ বন-পাশে নগর এক দারাবতী নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিরাম ॥ [ঐ, পৃঃ ৭]

৫ দ্বারে দ্বারে সুবিচিত্র উড়য় পতাকা।
হেমতরু পরে যেন কিশলয় শিখা ॥ [ঐ, পৃঃ ৮]

৬ মানসের গুপ্ত প্রেম ভাবে ব্যক্ত করে।
সুবর্ণ বরিখে যেন দরিদ্রের ঘরে ॥ [ঐ, পৃঃ ১৪]

৭ হেন মত শোভা করি রহিলা সুন্দরী।
কাব্য-রস-মন্ত্রে কাম-গরল নিবারি ॥
সতত সুস্বর-নাদ মন্দিরা, মৃদঙ্গ।
এহি যন্ত্র নাদে সে বিরহ-সৈন্য ভঙ্গ ॥ [ঐ, পৃঃ ২৭]

৮ মন বিনা তনু যেন মৃত্তিকা পিঞ্জর। [ঐ, পৃঃ ৩৬]

৯ দোহরূপ চিত্ত-পটে দোহ লিখি লৈল। [ঐ পৃঃ ৪৪]

১০ এক পুত্র নৃপতির দোহ চক্ষু জ্যোতি। [ঐ, পৃঃ ৬৬]

১১ শ্রাবণের মেঘে যেন স্রবে নীর ঘন।
পরিজন নারী সবে করয় রোদন ॥ [ঐ, পৃঃ ৬৬]

১২ হেমন্ত অন্তরে যেন বসন্ত উল্লাস। [ঐ, পৃঃ ৭৫]

১৩ কৃত্যা-সূতে পুষ্প-বাক্য গুথিয়া কপটী।
গরল পিলায় যেন অমৃত লেপটি ॥ [ঐ, পৃঃ ৭৮]

১৪ ঝামর নলিনী যেন সলিল বিহীন। [ঐ, পৃঃ ৯৭]

১৫ মধুরসম্বল তুণ্ড হৃদয় গরল ভাণ্ড
কপট মন্ত্রণা দমনক[১]। [ঐ, পৃঃ ৭৭]

দৌলতের সমগ্র কাব্যখানি উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষায় ঝলমল করিতেছে, এবং কোনো কোনো পৃষ্ঠায় ইহাদের সংখ্যা ছত্র-সংখ্যার প্রায় অর্ধেক দেখা যায়।[২] অন্যান্য অলঙ্কারের প্রয়োগও বড় কম নহে; এমন পৃষ্ঠা আছে যেখানে এগুলির সংখ্যা ছত্র-সংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক।[৩] অন্যান্য অলঙ্কার সহযোগে epigram জাতীয় বাক্য রচনা দৌলতের একটি প্রধান বিশিষ্টতা। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে এইরূপ দুই চারিটি প্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইল :

১ জীবন যৌবন ধন না রহিব সর্বক্ষণ
অমর হইব উপকারে। [স. ম. পৃঃ ৪]

২ সঙ্কট সময় কে দিব উপায়
এক বৃদ্ধ নাহি মিলে। [ঐ, পৃঃ ১১]

৩ রাজ সুখ এড়ি রাজা বনে হৈল যতি।
কুন্দ পুষ্প ভোগে অলি তেজিয়া মালতী ॥ [ঐ, পৃঃ ১৩]

৪ চন্দ্রানী ঘরেত থুই তুমি বনে যতি।
ছাড়িয়া রত্নের হার গুঞ্জাত আরতি ॥ [ঐ, পৃঃ ২৩]

৫ মিত্র বশ করিবার প্রীতি বড় সন্ধি। [ঐ, পৃঃ ১৯]

৬ যাহার নাহিক লজ্জা, কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেত ধর্ম কথা, বেশ্যাকে ভৎর্সনা ॥ [ঐ, পৃঃ ২৩]

৭ যাহার নির্বন্ধে রোগ ভোগয় যাবৎ ভোগ
অনুশোচ না করে পণ্ডিতে। [ঐ, পৃঃ ২৫]

৮ চিন্তিয়া যে করে কাজ সভাতে না পায় লাজ
পাছে নহে কলঙ্ক-যন্ত্রণা ॥ [ঐ, পৃঃ ২৫]

১ এস্থলে পঞ্চতন্ত্রের সর্বজনবিদিত করটক-দমনক কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে।

২ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে সপ্তম পৃষ্ঠায় [স. ম. দ্রঃ] ২৫ ছত্রের মধ্যে ১১টি উপমা রূপকাদির প্রয়োগ আছে।

৩ দশম পৃষ্ঠায় [স. ম, দ্রঃ] ২৫ ছত্রের মধ্যে অন্ততঃ ১৫টি অলঙ্কারের (অবশ্য বিভিন্ন নহে) প্রয়োগ রহিয়াছে।

৯ ভালে ভাল সমযুক্ত, মন্দে মন্দ যথা।
বিদ্বানেত বিদ্যা কহি, মূর্খেত মূর্খতা ॥ [ঐ, পৃঃ ২৬]

১০ যাহার নির্বন্ধ যেই না যায় খণ্ডন। [ঐ, পৃঃ ৩৩]

১১ ক্ষুধা হৈলে দু হস্তে না খাই [ঐ, পৃঃ ৩১]
[তুঃ ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ
(শ্রী. কী., পৃঃ ৪৭) ; ভুখল ন খাহ দুহু হাথ (বিদ্যাপতি)]

১২ পুরুষে সাধিব কার্য পুরুষতা ধরি।
একবারে সিদ্ধি নহে পুনি পুনি করি ॥ [ঐ, পৃঃ ৪৫]

১৩ আপনা শরীর যদি না হয় আপনা।
পৃথিবীতে আপ্ত আর হইবে কোন্ জনা ॥ [ঐ, পৃঃ ৬৭]

১৪ মহামায়ায় মোহ-মগ্ন হই নরলোক।
মোর গৃহ, মোর পুত্র, করি ভাবে শোক ॥ [ঐ, পৃঃ ৬৮]

১৫ মহাজন পুরুষের নাহিক মরণ। [ঐ, পৃঃ ৬৮]

১৬ দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যায় আন আইসে, কেহ নহে সার ॥ [ঐ, পৃঃ ৭৫]

১৭ লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ ॥[১] [ঐ, পৃঃ ৮৪-৮৫

১৮ কাণ্ডারী বিহীন নৌকা স্রোতে ভঙ্গ হয়।
পুরুষ বিহনে নারী জীবন সংশয় ॥ [ঐ, পৃঃ ১০১]

১৯ ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পায়।
অগ্নিশেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মায় ॥
চন্দ্র সূর্য অস্ত গতে পুনি উগি যায়।
যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পায় ॥ [ঐ, পৃঃ ৮০]

১ এস্থলের বিষম অলঙ্কারটি লক্ষণীয়।

মহাভারতের একটি কাহিনী প্রায় অবিকৃতরূপেই দৌলতের কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে দৌলতের রচনায় কেবল একটি মুনির নাম ভুল লেখা হইয়াছে এই যা, বাকি কাহিনী প্রায় ঠিকই আছে। দৌলতের কাব্যে চন্দ্রানীর সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটিলে শোকবিহ্বল লোর আত্মহত্যার কথা চিন্তা করিলে লোরের রথের সারথি মিত্রকণ্ঠ মহাভারতের এই কাহিনী সবিস্তার বর্ণনা করিয়া রাজাকে সান্ত্বনা ও অভয় দিতেছে। এই কাহিনীটি মহাভারতে দুইবার বিস্তৃত ভাবে কথিত হইয়াছে,[১] যদিও দুই স্থানের বর্ণনায় সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। দৌলতের কাব্যে কাহিনীটি যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা মহাভারতের দ্রোণপর্বের[২] কাহিনীর অনুরূপ। দৌলতের গ্রন্থের কাহিনীটি এস্থলে সংক্ষেপে দেওয়া হইল[৩]:

সৃঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবী বা স্বর্ণষ্ঠীবীকে প্রহার করিবামাত্র[৪] তাঁহার দেহাভ্যন্তর হইতে বিশুদ্ধ স্বর্ণ নির্গত হইত[৫]: "মুষ্ট কি চাপড় কেহ মারিলে তাহাকে। পুঞ্জে পুঞ্জে স্বর্ণ বর্ষে দৈব পরিপাকে॥" একদা নারদ ও অঙ্গিরা[৬] (বটতলার পাঠ অঙ্গিনা) রাজা সৃঞ্জয়ের সমীপে আসিলে, অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা[৭] ঋষিদ্বয়ের পরিচর্যায় নিযুক্ত হন। দুই ঋষিই সৃঞ্জয়-কন্যার রূপে মুগ্ধ হন, তবে নারদই প্রথমে কন্যা প্রার্থনা করায় রাজা তাঁহাকেই কন্যাদান করেন। ইহাতে অঙ্গিরা (আসলে পর্বত) বিষণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হইলে রাজা তাঁহাকে শান্ত করিতে সমর্থ হন। অতঃপর নারদ নববিবাহিতা রাজকন্যাকে লইয়া অন্তর্ধান করেন। কিছুকাল পরে একদা কয়েকজন চোর রাজকুমার সুবর্ণষ্ঠীবীর স্বর্ণপ্রসব রহস্য অবগত হইয়া রাজপ্রাসাদে গোপনে প্রবেশ করে ও রাজকুমারকে চুরি করিয়া লইয়া যায়। চোরেরা রাজপুত্রকে এক বনমধ্যে লইয়া গিয়া ধনলোভে তাঁহাকে এমনি প্রহার সুরু করে যে রাজকুমার অত্যল্পকাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[৮] একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে রাজা ও রানী যখন শোকে নিতান্ত কাতর সেই সময় নারদ উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে পুনর্জীবিত করিলেন।[৯]

১ ম. দ্রোণপর্ব, ৫৫, ৭১; শান্তিপর্ব. ৩০-৩১।

২ দ্রষ্টব্য ৫৫, ৭১।

৩ স. ম., পৃঃ ৬২-৬৮।

৪ প্রহারের ফলে স্বর্ণ বর্ষণের কথা কিন্তু মহাভারতে কোন স্থলেই নাই। প্রহারের কথা দৌলতের নিজের কল্পনা হইলেও বলিতে হয় যে চোরগণ কর্তৃক অতিরিক্ত প্রহারের ফলে রাজপুত্রের মৃত্যু বেশ স্বাভাবিকই হইয়াছে।

৫ মহাভারতে দ্রোণপর্বেও দেহাভ্যন্তর হইতেই স্বর্ণ নির্গমের কথা আছে (৫৫), তবে শান্তিপর্বে এই কাহিনীর যে ভিন্ন প্রকারের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার মধ্যে উক্ত হইয়াছে যে রাজপুত্রের থুতুর সহিতই স্বর্ণ বাহির হইত—"বভূব কাঞ্চনষ্ঠীবী যথার্থ নাম তস্য তৎ" (শান্তিপর্ব, ৩১।২৪)।

৬ দৌলৎ এই ঋষির নামেই গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। কেন না, মহাভারতে এই ঋষির নাম পর্বত, শান্তিপর্বে (৩০) যাঁহাকে নারদের ভাগিনা বলা হইয়াছে।

৭ দৌলতের কাব্যে এবং মহাভারতের দ্রোণপর্বে কন্যার কোনই নাম পাওয়া যায় না, তবে শান্তিপর্বে তাঁহাকে সুকুমারী নামে অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

৮ দ্রোণপর্বেও দস্যুগণ হস্তে রাজপুত্রের মৃত্যুর কথা আছে। তবে শান্তিপর্বে সুবর্ণষ্ঠীবীর মৃত্যুর ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের [পা. টী. ৯ দ্রষ্টব্য]।

৯ পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে মহাভারতের দ্রোণপর্বে বর্ণিত সুবর্ণষ্ঠীবীর কাহিনীর সহিতই দৌলতের এই কাহিনীর প্রায় সম্পূর্ণ মিল আছে। মনে হয়, দ্রোণপর্বের কাহিনীটিই অধিক প্রসিদ্ধ ছিল [O. S. (T), I. p. 20. f. n; ঐ, V. p. 11, f. n. (1);

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে দৌলতের কাব্যে রামায়ণ মহাভারতাদির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। বিশেষ করিয়া যে স্থলে চন্দ্রানীকে লইয়া পলায়মান লোর রাজা চন্দ্রানীর ক্লীব স্বামী খর্বকেতুর সহিত যুদ্ধে রত হন সে স্থলের যুদ্ধ-বর্ণনায় দৌলৎ রামায়ণ-মহাভারতাদির যুদ্ধবর্ণনার অনুকরণ করিয়াছেন। দৌলৎ যে তাঁহার নিতান্ত পার্থিব কাহিনী মধ্যেও রামায়ণাদির যুদ্ধের অপার্থিব বাতাবরণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অতি সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ লোর-চন্দ্রানীর পলায়নবার্তা শুনিয়া খর্বকেতুর যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইবার সূচনা মাত্রেই তাহার সৈন্যদলে যে-সাড়া পড়িয়া গেল[১] তাহা আমাদিগকে কৃত্তিবাসের রামায়ণের যুদ্ধযাত্রার চিত্রগুলি মনে করাইয়া দেয়।[২] অতঃপর দুই পক্ষই রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধে নামিয়াছেন; রথের সারথিদ্বয়ের নামগুলিও চমৎকার—মিত্রকণ্ঠ (লোরের) ও বজ্রবাহু (খর্বকেতুর)। লোরকে দেখিবামাত্র খর্বকেতু চিৎকার করিয়া তাঁহাকে যে গালাগালি সুরু করিল তাহাও হুবহু রামায়ণের অনুরূপ। খর্বকেতু লোরকে দেখিতে পাইয়া বলিতেছে:

শুনরে অধম মূঢ় অবোধ দুর্মতি।
পরনারী হরে যেই মরণ দুর্গতি॥
অবশ্য শুনিছ পাপী পুরাণে কথন।
প্রজাপতি বংশে জর্ম রাজা দশানন॥
সুরাসুর আদি যত ত্রিভুবনে বৈসে।
দাস প্রায় খাটিলেক রাবণ আদেশে॥
এক ছত্রে বসুমতী শাসিল রাবণে।
ঠাট পাট অস্তে গেল নারীর কারণে॥

H. I. L. (W), I, p. 407, f. n. (1).]। শান্তিপর্বের কাহিনীতে দেখিতে পাই যে কেবল নারদ ঋষিই রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হন ও পরে তাঁহাকে বিবাহ করেন। পর্বত মাতুল নারদের এই কার্যে অতিশয় বিরক্ত হন ও তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। অবশেষে, অবশ্য পর্বত তাঁহার অভিশাপ ফিরাইয়া লন এবং নারদ পত্নী লইয়া আপন আবাসে চলিয়া যান। [দ্রোণপর্বে অবশ্য নারদ ও তাঁহার পত্নীর মিলনের কথা কিছু নাই, এবং মনে হয় শান্তিপর্বের কাহিনীটিরও অনুসরণ করিয়া দৌলৎ এই মিলনের কথা লিখেন]। আবার শান্তিপর্বে লিখিত হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র সৃঞ্জয় কুমারের সুবর্ণ প্রসবের কথা অবগত হইয়া পাছে মর্ত্যের রাজার ঐশ্বর্য কালক্রমে ইন্দ্রত্বকেও অতিক্রম করিয়া যায়, এই ভয়ে সুবর্ণষ্ঠীবীকে বধ করিতে বজ্রকে আদেশ করেন। বজ্র কুমারের ছিদ্র অন্বেষণে তাঁহার পিছনে ঘুরিতে থাকেন:

"এবমুক্তস্তু শক্রেণ বজ্রঃ পরপুরংজয়ঃ।
কুমারস্যান্তরপ্রেক্ষী নিত্যমেবান্বপদ্যত।" [ম (ভা. ও. রি. সো), শান্তিপর্ব, ৩১।২৯]

ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সুযোগ বুঝিয়া বজ্র ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া কুমারকে বধ করেন। দৌলৎ যদিও শান্তিপর্বের এই কাহিনী গ্রহণ করেন নাই, তথাপি এই কাহিনীও যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না তাহার কিছু আভাস মিলে দৌলতের কাহিনী মধ্যে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক ছত্রটিতে: "ছিদ্র পাই ব্যাঘ্রে ধরি সমূলে বিনাশে।" [স. ম., পৃঃ ৬৮]

১ স. ম., পৃঃ ৫৩

২ কৃ. রা. লঙ্কাকাণ্ড, ১৯, ২৩, ৪১, ৫২ ইত্যাদি।

তুমি কোন্ তৃণ ছার পতঙ্গ নির্বলী।
বীরের রমণী লৈয়া তোমার ধামালী ॥[১]

কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাবণকে দেখিয়া অঙ্গদও প্রায় এই ভাবেই আরম্ভ করিল :

তুই অতি দুরাচারী হরিলি পরের নারী
পরলোকে নাহি তোর ভয়।[২] ইত্যাদি।

এইরূপ পরস্পর গালি দিয়া যুদ্ধারম্ভ রামায়ণাদিতে প্রচুর মিলে।[৩] দৌলতের কাব্যে যুদ্ধের দৃশ্যও ঠিক রামায়ণাদি মহাকাব্যের অনুরূপ দৃশ্যাবলীর মতো। দৌলৎ বর্ণিত নিতান্ত সাধারণ দুই জন মানুষের মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধের ভিতরেও দেখিতে পাই তীরে তীরে কাটাকাটি হইতেছে; তীরযোগে ধনুক খণ্ড খণ্ড হইতেছে; শর কোথাও অগ্নিসম, কোথাও বজ্র সদৃশ; কোথাও উল্কাপাত প্রমাণ শরজালে বন আচ্ছন্ন, দিবস অন্ধকার। শুধু তাই নয়, "দেব ঋষিগণ, কৌতুকে দেখন্ত রণ, কারো নহে জয় পরাজয়।"[৪] কবির লেখনী ইহাতেই ক্ষান্ত হয় নাই, জয় সংশয়ে আকুল রাজা লোর শেষ অবধি ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তবে বামণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। মৃত্যু কালে খর্বকেতু লোর রাজকে শুধু যে ক্ষমা করিয়া গেলেন তাই নয়, যথা সম্ভব প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে শুভেচ্ছা জানাইয়া তবে ইহলীলা সংবরণ করিলেন।[৫]

লোর ও বামণের যুদ্ধের মধ্যে একবার লোর সহসা আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে লোরের সারথি মিত্রকণ্ঠ নিরুপায় হইয়া চন্দ্রানীর বস্ত্রাংশ তীরাগ্রে বাঁধিয়া খর্বকেতুর রথে সেই তীর নিক্ষেপ করিলে চন্দ্রানীর মৃত্যু কল্পনা করিয়া শোকার্ত বামণ ধনুর্বান ত্যাগ করে। সারথি সেই অবসরে লোরের চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হন এবং লোর পুনরায় আত্মস্থ হইয়া নবোদ্যমে যুদ্ধ করিয়া রণজয় করেন। যুদ্ধমধ্যে এই ধরণের কৌশল রামায়ণ মহাভারতেও লক্ষিত হয়। যেমন রামায়ণে দেখিতে পাই যে, মকরাক্ষ চতুর্দিকে গাভী লইয়া যুদ্ধ করিতে আসে, যাহাতে রাম গোবধভয়ে তীর না ছুঁড়িতে পারেন[৬], ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধক্ষেত্রে মায়া সীতা বধ করিয়া রামের চিত্তবৈকল্য ঘটাইয়া যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করিতেছেন[৭] ইত্যাদি। মহাভারতেও দেখি স্ত্রীপূর্ব শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মবধের আয়োজন চলিতেছে।[৮] এতদ্ব্যতীত দৌলতের কাব্যে এক রথের ছায়া হইতে আর একটি রথ সৃষ্টির মতো অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথাও আছে।[৯]

১ স. ম., পৃঃ ৫৪

২ কৃ. রা, লঙ্কাকাণ্ড, ১১

৩ ঐ, ২২, ২৪, ৩৪, ৩৮. ৪৩ ইত্যাদি। বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণেও ইহার অভাব নাই।

৪ স. ম., পৃঃ ৫৭

৫ কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখি, রাবণ মৃত্যুকালে রামের প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়া তবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। [কৃ. রা., লঙ্কাকাণ্ড, ১০৬]

৬ কৃ. রা, লঙ্কাকাণ্ড, ৫২। বাল্মীকির রামায়ণে অবশ্য মকরাক্ষের এইরূপ কৌশলের কথা নাই [বা. রা, লঙ্কাকাণ্ড, ৭৯]।

৭ কৃ. রা, লঙ্কাকাণ্ড, ৫৬, বা. রা, লঙ্কাকাণ্ড, ৮১।

৮ ম, ভীষ্মপর্ব, ১০৮।৭৭-৭৮, ৮১-৮৩; ১০৯।৩৪-৪৩

৯ স. ম., পৃঃ ৭২

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দৌলতের কাব্য তৎসমশব্দবহুল তৎকালীন সাধুভাষায় রচিত এবং আরবী-ফার্সি শব্দের প্রতি তাঁহার কোনোরূপ পক্ষপাত দৃষ্ট হয় না। একমাত্র ইস্‌লাম ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা প্রসঙ্গে কবি পুস্তকারম্ভে প্রথম তিন পৃষ্ঠায় এবং অন্যত্র কদাচিৎ দুই এক ছত্রে অপরিচিত আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; এবং সে সমস্ত স্থলেও ইহাদের প্রয়োগ শতকরা ছয়টি শব্দের অধিক নহে। শুধু এইটুকু বাদ দিলে নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে দৌলতের কাব্য আগাগোড়াই সাধু বাংলাভাষায় রচিত। কোরাণ শরীফ বাদ দিলে আরবী-ফার্সি কাহিনীর মধ্যে সমগ্র পুস্তকে একটি মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা দাতা হাতিম তাই সম্পর্কে :

স্থসন্ধানী, স্থবিক্রম, স্থগম্ভীর সমুদ্র সম,
কলিতে হাতিম সম দানে[১]। [স. ম., পৃঃ ৩]

ভাষা বিচার[২]

দৌলতের রচনায় যে-সমস্ত অপ্রচলিত অথবা অধুনা-লুপ্ত অথবা ঔপভাষিক শব্দ ও শব্দরূপের প্রয়োগ আছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে দেওয়া হইল :

ক্রিয়াপদ

১। গৌরবার্থক ও অগৌরবার্থক বহুবচনে এবং গৌরবার্থক একবচনে সামান্য বর্তমান ও অতীত ক্রিয়াপদে সর্বদাই -ন্ত বা -ন্তি [<সং-ন্তি] প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেমন, করান্ত বা করেন্ত [তু. করান্তি—শ্রী. কী., পৃঃ ৪১]; আর্জিলেন্ত (অর্জন করে বা করেন); দেয়ন্ত; হইলেন্ত; পুজেন্ত; বুঝন্ত বা বুঝেন্ত; পালেন্ত; চলেন্ত; বেহারেন্ত; বসিলেন্ত [তু. বসিলান্ত—শ্রী. কী., পৃঃ ৮]; পুছেন্ত [তু. পুছন্তি—শ্রী. কী. পৃঃ ৫]; খেপিলেন্ত (ছুঁড়িল বা ছুঁড়িলেন) [তু. খেপিলেঁা—ঐ, পৃঃ ১৪২]; ই.।

এইরূপ অসংখ্য পদ আছে, যেমন : ভাবিলেন্ত, হাসেন্ত, করিলেন্ত, করাইলেন্ত (ণিচ্), বুঝায়ন্ত (ণিচ্), রাখিলেন্ত, আইসেন্ত, নিবেদিলেন্ত, ই.।

২। বর্তমান কালে উত্তম পুরুষের কয়েকটি প্রাচীন রূপ দেখা যায় : মাগম [আমি বা আমরা মাগি]; হম [হই]; ধরহেঁা [আমি ধরি]; ই.। [তুঃ কহম (আমি বলিব), গো. বি., পৃঃ ৮৫; বন্দম (আমি বন্দনা করি), ঐ, পৃঃ ১][৩]। অবশ্য ইহার সংগে আধুনিক রূপও প্রচুর আছে।

১ এই হাতিম তাই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন [Enc. Is. No. 18, পৃ ২৭১]। তিনি কবি ছিলেন এবং তাঁহার দানশীলতা প্রবাদ বাক্যে দাঁড়াইয়াছে [Enc. Britt., II, পৃঃ ২৯০]।

২ দ্রঃ J. A. S., vol. xx, No. 2, 1954.

৩ শ্রী. কী.'এ এরূপ স্থলে আমুনাসিক রূপই মিলিতেছে : খাঙ. যাঙ, ই.।

৩। ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষে পূর্ববঙ্গের উপভাষার রূপ প্রচুর লক্ষিত হয় : আনম (>আমুম); দেম (>দিমু) ; মিলাম (>মিলাইমু) ; ইত্যাদি। আধুনিক আদর্শ রূপের সহিত খাঁটি পূর্ববঙ্গের রূপও যথেষ্ট রহিয়াছে : জাইমু, কহিমু, দিমু, তেজিমু, থাকিমু ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কালের উত্তমপুরুষের আর একটি রূপ কচিৎ ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে : যেমন, বসিবাম [স. ম., পৃঃ ৫২]।

৪। বর্তমান কালের মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদে প্রায় সর্বত্রই আদি মধ্য বাংলার[১] সি-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় : বলসি ; বুঝসি ; করাওসি (ণিজন্ত রূপ) ; চিন্তসি ; সোআওসি (ণিজন্ত) ; সুনাওসি (ণিজন্ত) ; ইত্যাদি। [তু: শ্রী. কী: বুঝসি ; বোলসি ; করসি ; ই.]।

৫। ক্রিয়াপদের একটি অধুনা-লুপ্ত রূপ মধ্যে মধ্যে দেখা যায় : দিবারে [মৃত্যুদ্বারে নারে কেহ দিবারে কপাট— স. ম., পৃঃ ৭১] ; পুছারি বা পুছারে [ফিরি তাকে না পুছারি, স. ম., পৃ: ৮২ ; অবধি অন্তরে ফিরি না পুছারে, ঐ] ; ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এই প্রকার রূপ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে : দিবারে ; আছের ; কহিআর ; দিআর ; ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের এই রূপগুলি নিম্নলিখিত প্রকারে আসিয়াছে বলিয়াই মনে হয় ; দিবারে <দিবা (<√দা+তব্য)+কার (<√কৃ) ; পুছারে <পুচ্ছা (<√প্রচ্ছ্)+কার ; কহিআর <*কহিআ+কার- =কথিতং কুরু ; ইত্যাদি।[২]

৬। গ্রন্থমধ্যে সংখ্যাতীত নামধাতুর প্রয়োগ আছে। এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল : সমর্পিল ; আরোহিল ; চিন্তিয়া ; প্রমোদিতে ; লীলয় ; আদেশিল ; প্রবেশিল ; নমস্কারি ; পরীক্ষিয়া ; উদ্দেশিতে ; ইচ্ছিল ; অন্বেষি ; বিসর্জ্জিসি ; প্রবোধিতে ; আলাপয় ; বার্ত্তিলেক (=বার্তা ঘোষণা করা হইল। তু: হি. বতানা=বলা) ; প্রশংসিল ; বিলাপে ; প্রণমিয়া ; ইত্যাদি।[৩]

এইরূপ অজস্র নামধাতুর প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন : আদেশিব ; আরোপিয়ঁা ; নিষধিল ; অবগাহি ; উদ্ধারিলোঁ ; উপেখসি ; চিন্তিআঁ ; চোরাআঁ ; চোরায়িআঁ ; তপিল ; দংশিল ; প্রবোধিআঁ ; বিরোধিল ; বিলপিল ; বিলসিল ; সুখাএ ; ইত্যাদি।[৪]

৭। প্রথম পুরুষে অনুজ্ঞায় স্বার্থিক ক-প্রয়োগ-যুক্ত অধুনা-লুপ্ত রূপ যথেষ্ট মিলিতেছে : আছউক

১ ভা. ই. পৃঃ ১৩৬

২ O. D. B. L., পৃঃ ৯৯৬ ; অবশ্য এই ক্রিয়ারূপ গুলির "র" √কৃ ধাতুর পরিবর্তে √পার্ ধাতু হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে [সা. প. প. ৩য় সংখ্যা, ১৩৫২, পৃঃ ১৪১-১৪২] ; তবে √কৃ ধাতুর সমর্থনে এইটুকু বলা যায় যে বীরভূমের কথ্য ভাষায় আনা করাও=আনাও ; বলা করাও=বলাও ; ইত্যাদি প্রকারের যুক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহারের প্রচলন আজিও লুপ্ত হয় নাই। কথ্য হিন্দী ভাষাতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায় : দিয়া করো , খায়া করো ; ইত্যাদি।

৩ এতৎ প্রসঙ্গে মৎলিখিত প্রবন্ধ "দৌলৎ কাজির কাব্য ও আলাওল" দ্রষ্টব্য ("দেশ," ৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৮, পৃঃ ১৫৮)।

৪ ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে উনবিংশ শতাব্দীতেও মধুসূদনকে অতিরিক্ত নামধাতু প্রয়োগের জন্য গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বা আচৌক (=থাকুক) [স. ম., পৃঃ ২০, ২১ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনুরূপ অর্থে আছুক শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে— শ্রী. কী. পৃঃ ৪৭, ৯৬, ১৩২, ১৮৩ ; মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও আছুক শব্দের প্রয়োগ আছে—ক. ক. চ., পৃঃ ১১] ; লভৌক ; সাজউক ; খণ্ডউক ; ক্ষেপৌক ; পড়ৌক ; করৌক ; খসৌক ; থাউক ; ইত্যাদি।

ক-বিহীন[1] অনুজ্ঞার প্রয়োগ কিছু দুর্লভ বলা চলিতে পারে। যেমন : নেহৌ (= লওয়া হোক) ; করৌ (=করা হোক) ; ইত্যাদি।

উপরের দৃষ্টান্ত গুলিতে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অনুজ্ঞার রূপ অ+উ অথবা ঔ যোগেও নিষ্পন্ন হইতেছে, আধুনিক[2] উ-নিষ্পন্ন রূপ ছাড়াও।

গোর্খ-বিজয় গ্রন্থেও এইরূপ অ+উ বা ঔ যোগে নিষ্পন্ন স্বার্থিক ক-যুক্ত অনুজ্ঞার প্রয়োগ আছে [যথা ধরৌক (গো. বি., পৃঃ ১৬), ভরৌক (ঐ; পৃঃ ৯১), ই.]।

৮। মধ্যম পুরুষে ভবিষ্যৎকালে অনুজ্ঞায় অনেক স্থলে আদি মধ্যবাংলার রূপ রহিয়া গিয়াছে, যদিও আধুনিক[3] রূপও সংগে বহু আছে : করহ (<করিষ্যথ)[4] ; মারহ (<মারিষ্যথ) ; থাকহ ; ধরহ ; বুঝহ ; ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এইরূপ আছে : থাকহ (শ্রী. কী., পৃঃ ৪৭, ৮৮) ; করহ (ঐ, পৃঃ ৯, ২৪, ই.) ; বুঝহ (ঐ, পৃঃ ৫৪, ৫৭, ই.) ; ইত্যাদি।

৯। মধ্যম পুরুষে বিশুদ্ধ ভবিষ্যৎকালে প্রায়ই বে স্থানে বা প্রয়োগ দেখা যায় : রাখিতে না পার ভার্যা রতি রস ছলে। পৃথিবী পালিবা কোন্ বীর্য বুদ্ধি বলে [স. ম., পৃঃ ২২] ; ভার্যার বিচ্ছেদ হেতু পাছে পাইবা খেদ [ঐ] ; পুনর্বার হৈলে যেই জানো সে করিবা [ঐ, পৃঃ ২৩] ; ইত্যাদি।

১০। প্রথম পুরুষে সামান্য বর্তমান নিষ্পন্ন হইয়াছে প্রায়ই পদান্তে -অয় যোগ : আছয় (=আছে) ; বলয় (=বলে) ; পুছয় ; পুজয় ; আলাপয় ; ভুলয় ; করয় ; বঞ্চয় ; দেখয় ; জানয় ; ইত্যাদি।

বলে, দহে, প্রভৃতি প্রচলিত রূপও প্রচুর আছে।

১১। প্রথম পুরুষে ভবিষ্যৎকালে বে স্থানে অধিকাংশ স্থলে ব ব্যবহৃত হইয়াছে[5] : সঙ্কট সময়, কে দিব উপায় [স. ম., পৃঃ ১১] ; লোরক থাকিব ধ্যান দেবী বিদ্যমান [ঐ, পৃঃ ৪১] ; যুগীরূপে লোর যাইব সেই দেবালয় [ঐ] ; এ সকল শুনে যদি বামন প্রচণ্ড ! জাতি বংশ নাশিব করিব নব খণ্ড ॥ [ঐ, পৃঃ ৪২] ;

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ ক-বিহীন অনুজ্ঞার প্রয়োগ অনেক আছে : আছু (শ্রী. কী. পৃঃ ৩০, ৩৫, ১১৩), করু (ঐ, পৃঃ ১০, ৬৮. ৭২), ইত্যাদি।

২ ভা. ই., পৃঃ ১৩৮

৩ অনুরূপ আধুনিক রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রচুর আছে।

৪ ভা. ই., পৃঃ ১৩৯

৫ পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় অধুনাও এইরূপ প্রয়োগ প্রচলিত। তবে এটিকে সম্পূর্ণ পূর্ববঙ্গীয় রূপ বলা বোধ হয় ঠিক নয়; কেন না শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এইরূপ প্রয়োগ আছে : যবে বড়াই আদেশিব মোরে (শ্রী. কী., পৃঃ ১৭০), মোর সকল সখিজন জাইব শুন কলসে (ঐ. পৃঃ ১১৫), ইত্যাদি।

ইত্যাদি। তবে স্বার্থিক ক-যুক্ত যে প্রয়োগও কচিৎ আছে: কার শক্তি ধৈর্য ধরিবেক মহীতলে [ঐ, পৃঃ ৩৬]। কোথাও কোথাও বা-প্রয়োগও পাওয়া যায়: এতেক সে মহাজনে বুঝিয়া রহস্য। লোকেরে সাদর করি পালিবা অবশ্য ॥ [ঐ, পৃঃ ৯]; বামনে পাইবা কোথা চন্দ্ররূপ নারী [ঐ, পৃঃ ১৮]; ইত্যাদি।

অসমাপিকা

দৌলতের কাব্যে অসমাপিকা ক্রিয়াপদে আধুনিক রূপই চোখে পড়ে। কেবল স্থানে স্থানে পদান্তের য়া ব্যতিরেকেও অসমাপিকার প্রয়োগ দেখা যায়[১]: মানাই (=মানাইয়া); হারাই (=হারাইয়া); সাজাই (=সাজাইয়া); হই (=হইয়া); ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য: কতকগুলি ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্যে (verbal noun) পূর্ববঙ্গের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়: জাগন (শয়নেতে নিদ্রা বাড়ে জাগনেতে কাম, স. ম., পৃঃ ৪৭); চিনন (চারি মধ্যে বড় ছোট চিনন দুষ্কর, ঐ, পৃঃ ৭৮); কামন (বুঝিলুম আজু সিদ্ধি না হৈল কামন, ঐ, পৃঃ ৪৫); ইত্যাদি।

কারক বিভক্তি

১। বিভক্তিহীন কর্তৃকারক এবং বিভক্তিযুক্ত কর্তৃকারকের প্রয়োগ সংখ্যায় প্রায় সমান সমান। বিভক্তিযুক্ত কর্তৃকারকে পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে[২] অকারান্ত পদে এ-বিভক্তি এবং অন্য স্বরান্ত পদে য় বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়; যেমন: (ক) বিভক্তিহীন: রাজা যায় [স. ম., পৃঃ ৫০]; বসিল সুন্দর [ঐ পৃঃ ৪৯]; রাণী কহে [ঐ, পৃঃ ৫১]; রহস্য শুনয় যদি বামন দুর্জয় [ঐ, পৃঃ ৫২]; ইত্যাদি। (খ) এ-, য়-, বিভক্তিযুক্ত: বাপে মায় শুনিলেহ [ঐ, পৃঃ ৫২]; বামনে দেখিল [ঐ, পৃঃ ৫৪]; রাজায় বলয় [ঐ, পৃঃ ৪২]; রাজায় দেখিয়া বৃদ্ধা [ঐ, পৃঃ ৪০]; কহে মালিনীয়ে [ঐ, পৃঃ ৮৩]; রত্তনায় বলে [ঐ, পৃঃ ৮৭]; ইত্যাদি।

২। বিভক্তিযুক্ত ও বিভক্তিহীন উভয় প্রকার কর্মকারকই দৃষ্ট হয়: সারথিকে বুঝাইয়া বলে লোর রায় [স. ম., পৃঃ ৫২]; ধাইকে দেখিলা বালা [ঐ, পৃঃ ৪১]; ওষ্ঠক[৩] কম্পয় ক্রোধে [ঐ, পৃঃ ৫৩]; রহাস্যক বুঝায় [ঐ, পৃঃ ৪৫]; আদেশিলা যুবজনে [ঐ, পৃঃ ১১]; কুমারে প্রণামি [ঐ, পৃঃ ১৮]; কুমার সম্বোধি [ঐ, পৃঃ ২২]; জামাতা পালয় ভূমি [ঐ, পৃঃ ২৪]; নৃপ আদেশিলা সৈন্যগণ [ঐ, পৃঃ ২৪]; আইল অঙ্গিনা মুনি রাজা বোলাইতে [ঐ, পৃঃ ৬৪]; ইত্যাদি।[৪]

১ তুঃ শ্রী. কী: হই (=হইয়া), পৃঃ ১৮৯; জাই (=যাইয়া), পৃঃ ৩১; ইত্যাদি।

২ ভা. ই., পৃঃ ১১৯

৩ তুঃ শ্রী. কী.: ওঠ আধর উঠক জিনি, পৃঃ ৪

৪ ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সর্বনাম ব্যতীত কোথাও কর্মকারকে "রে"-বিভক্তির প্রয়োগ নাই, যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিশেষ্যপদেও কর্মকারকে রে বিভক্তির প্রয়োগ আছে, যেমন: বোলহ রাধারে (শ্রী. কী., পৃঃ ৯), বোলহ কাহ্নেরে (ঐ, পৃঃ ৯০); ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় বিশেষ করিয়া কবিতায় এবং পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায়, বিশেষ্যপদে রে-বিভক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।

৩। করণ কারকের বিভক্তি হইতেছে : এ, েয় এবং য় : দর্পে ভূমি পালে [স. ম., পৃঃ ১৫] ; বলে বর্শি খসাইতে নারে [ঐ, পৃঃ ৪৬] ; সেই শর শরে কাটি পাড়ে [ঐ, পৃঃ ৫৬] ; এই ছলে লোর-রূপ দেখয় সুন্দরী [ঐ, পৃঃ ৪৫] ; কুরালিয়ে খুদি বর্শি [ঐ, পৃঃ ৪৭] ; প্রণতিয়ে মাগে এই বর [ঐ, পৃঃ ৬৮] ; ভক্তিয়ে তুষ্ট ভেল [ঐ, পৃঃ ৬৯] ; জামাতা-ভক্তিয় তুষ্ট হৈলন্ত শ্বশুর [ঐ, পৃঃ ৭৩] ; শক্তিয় নিবারি [ঐ, পৃঃ ৮০] ; জ্যোতিয় বেষ্টিত তনু [ঐ, পৃঃ ৩১] ; ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর তৃতীয়ার রূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রচুর লক্ষিত হয় : স্তুতিএঁ ; সুরতিএঁ ; ফুলে ; তাম্বুলে ; মাথাএ ; ইত্যাদি। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এঁ বিভক্তির সহিত ত এবং এঁ বিভক্তির সহিত েহ যোগে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়[১] দৌলতের গ্রন্থে তাহা নাই।

৪। সম্প্রদানে পরসর্গের মতো জন্যে, কারণে, হেতু, উদ্দেশি প্রভৃতি শব্দের এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। তবে নিশ্চিতভাবে প্রাচীন বলা যায় এরকম রূপ নাই।

৫। অপাদানে প্রচলিত হন্তে (প্রাচীন), হতে, হৈতে প্রভৃতি পরসর্গ ব্যতীত কেবল ত এবং এ বিভক্তির প্রয়োগ কিছু কিছু দেখা যায় : নারদে মাগিলা কন্যা রাজাত সত্বরে [স. ম., পৃঃ ৬৩] ; প্রাণপণ করি তারে আপদে উদ্ধারি [ঐ, পৃঃ ৫৫] ; ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও অপাদানে এইরূপ ত ও েত বিভক্তির প্রয়োগ আছে :

ঘরত [শ্রী. কী., পৃঃ ২৯] ; রাধাতে [ঐ, পৃঃ ৯৯] ; আহ্মাতে [ঐ, পৃঃ ১৫০] ; রাধিকাত [ঐ, পৃঃ ১২৪] ; ইত্যাদি।

৬। সম্বন্ধ পদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে র, এর এবং আর বিভক্তি যোগে আধুনিক রূপই দেখা যায়। কের ও কার বিভক্তির প্রয়োগ একেবারেই নাই ; তবে ক বিভক্তি দুই এক স্থানে মিলে[২] : দোসরক গুণ [স. ম., পৃঃ ৭৯] ; দিবসক যুক্তি [ঐ, পৃঃ ৮৪]।

৭। অধিকরণের বিভক্তি হইতেছে : েত, ত, এ : সভাতে [পৃঃ ১২] ; দেশেতে [পৃঃ ১৫] ; হাতত [পৃঃ ১৩] ; হস্তেত [পৃঃ ১৩, ১৪] ; বৎসরেত [পৃঃ ২৭] ; পুরীত [পৃঃ ৪০] ; জলে শোভে [পৃঃ ৮] ; দ্বারে [পৃঃ ৬৭] ; ইত্যাদি।

কয়েকটি দৃষ্টান্তে অধিকরণ প্রসারিত হইয়া গৌণকর্মের কাজ করিতেছে। যেমন : দ্বারী যাদ রাজাতে কহিল এ বচন [পৃঃ ১৩] ; কাহাতে কহিমু [পৃঃ ২০] ; বিদ্বানেত বিদ্যা কহি, মূর্খেত মূর্খতা [পৃঃ ২৬] ; ইত্যাদি।[৩]

কতকগুলি অব্যয়পদেও অধিকরণের েত বিভক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন : কোথাতে যাইমু [পৃঃ ১২] ; কোথাতে বসতি [পৃঃ ২২] ; যথাতে বসয় লোর কান্ত [পৃঃ ৪০] ; এথাতে লোরকরাজ ধ্যান ভঙ্গ করি [পৃঃ ৪৪] ; ইত্যাদি।

১ সা. প. প., ৩য় সংখ্যা, ১৩৪২, পৃঃ ১২৯-৩০

২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও সম্বন্ধ পদে 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ আছে, যেমন : যমুনাক তীরে [পৃঃ ১৪২] ; দ্রঃ—সা. প. প., ৩য় সংখ্যা ১৩৪২, পৃঃ ১২৯, ১৩০, ১৩৫।

৩ তুঃ গো. বি., পৃঃ ১২ : দেবীত পুছিল।

নিম্নলিখিত ছত্রের 'কেমত' শব্দের তটি অধিকরণের বিভক্তি নহে : কেমত (=কেমনে) দেখিমু মুই কামের কামিনী [পৃঃ ৩২] ; এস্থলে কেমত শব্দটি * কেমন্ত শব্দ হইতে আসিয়াছে (কেমত < * কেমন্ত) [ভা. ই. পৃঃ ১৩৩]।

সর্বনাম

দৌলতের কাব্যে সর্বনামের আধুনিক রূপই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, তবে প্রাচীন বিভক্তিও কিছু কিছু আছে। বিভিন্ন কারকে সর্বনামের রূপগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :

১। (ক) কর্তৃকারক—একবচন : আমি, মুই, মুঞী, মুঞি ; তুমি, তুই ; সে, সেই ; আপনে, আপন।

(খ) কর্তৃকারক—বহুবচন : আমরা ; তোমরা, তোরা ; তারা, তাহারা ; ইত্যাদি।

২। কর্মকারক : আমাকে; মোকে, আমা, মোহরে, মোহক, মোহকে, আমারে, মোরে ; তোমাকে, তোকে, তোমা, তোমারে, তোমাত[১] ; তাহাকে, তাকে, তাহারে, তা, সে, সে সবে ; আপনে।

৩। অপাদান কারক সাধারণতঃ হন্তে, হৈতে, হতে যোগেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেমন : তো হন্তে তাহার হৈব সহস্র যাতনা [পৃঃ ৩৭] ; তোমা হতে লোর দুঃখী [পৃঃ ৩৯] ; আন কার্য্য আমা হৈতে না হৈব সর্বথা [পৃঃ ৪৩] ; তাহা হস্তে শত গুণ দীর্ঘ তার দর্প [পৃঃ ৫১] ; তা হন্তে কি পুরুষের আছে অপমান [পৃঃ ৪৮] ; তোমা হৈতে স্নেহ মোর অধিক আছয় [পৃঃ ৬৮] ; ইত্যাদি।

৪। সম্বন্ধপদ : আমার, মোর, মোহর, আমা (আমা সনে), মেরি[২] ; তো, তোমার, তোর, তেরা,[৩] তোহর, তোমা (পৃঃ ৭৬) ; তাহার, তার, তাহা (সনে), তাহান, তান, তা সভান[৪] ; আপনা ; এহার।

৫। অধিকরণ কারকে বিশেষ কোনো প্রাচীন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না।

দোঁহ (হা) শব্দটির দুই একটি কারকে বিভিন্ন রূপে প্রয়োগ আছে, তবে পূর্ববঙ্গের প্রভাবেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক আনুনাসিক চিহ্ন কোথাও নাই। এই শব্দের প্রয়োগের দুই একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেখানো হইল : জয় পরাজয় মোর দোহ সমসর [পৃঃ ৫২] ; এক পুত্র নৃপতির দোহ চক্ষু জ্যোতি [পৃঃ ৬৬] ; কুমার কুমারী দোহ প্রায় এক প্রাণ [পৃঃ ৭১] ; ইত্যাদি। আবার 'দোহান' এই রূপেও পদটির প্রয়োগ রহিয়াছে কর্তৃকারকে : তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল [পৃঃ ১০] ; কাম রসে রতি শাস্ত্রে দোহান বিদ্বান [পৃঃ ৪৯] ; ইত্যাদি। এদিকে সম্বন্ধ পদেও 'দোহান' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে : শিশু হস্তে প্রীতি, দোহান আরতি, বাড়াইল বহুল আদরে [পৃঃ ৯৬]। সম্বন্ধ পদে আবার 'দোহানের' শব্দেরও একাধিকবার প্রয়োগ আছে : অন্যোন্য দোহানের যুড়াইব নয়ন [পৃঃ ৪২],

১ এই কহিলুম তোমাত [পৃঃ ৪৩]

২ খেলি, কেলি, মিলি, সকল গেল মেরি [পৃঃ ২৮]

৩ পৃঃ ৮২

৪ পৃঃ ৬৭

কি কহিমু দোহানের মদন তরঙ্গ [পৃঃ ৪৯], ইত্যাদি। কর্মকারকে 'দোহাকে' এই রূপের প্রয়োগ আছে : দোহাকে নিছিয়া [পৃঃ ১৯]।

বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ

দৌলতের রচনায় কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ সমষ্টি বা বাক্যাংশের কুশল প্রয়োগ ঘন ঘন চোখে পড়ে। এখানে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল : চাতরে চাতরে[১] (<চত্বর); আস্তে ব্যস্তে (<অস্ত-ব্যস্ত[২]); যত (জত) ইতি; তেকারণে; উদিতে লুকিতে (পৃঃ ৩০); আগুসারি; যেন মতে; বাড়িয়া (=অগ্রসর হইয়া); আগু বাড়ি[৩]; অবধি গমিয়া গেল (=সীমা ছাড়াইয়া গেল); নিকুঞ্জ খেলিতে (=শিকার করিতে); কহিতে আছিএ (পৃঃ ৭); ইত্যাদি।

ভাষার অন্য বৈশিষ্ট্য

দৌলৎ কাজির আদি নিবাস বা মাতৃভূমি ঠিক কোথায় ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সহিত বলা কঠিন। তবে খুব সম্ভবতঃ তিনি চট্টগ্রাম-বাসী ছিলেন।[৪] যদি এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্যে বা শব্দপ্রয়োগে কোথাও ইহার সমর্থন আছে কি না দেখা প্রয়োজন। তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও শব্দপ্রয়োগের নিজস্ব রীতি সম্বন্ধে উপরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে দৌলৎ প্রধানতঃ আদর্শ সাধু বাংলায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনায় প্রাদেশিক উপভাষা বা পূর্ববঙ্গীয় রীতির নিঃসন্দিগ্ধ নিদর্শন খুব বেশি নাই। যে দুই চারি জায়গায় পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে শব্দ বা বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখা যায় সেগুলির মধ্যেও কিছু কিছু যে লিপিকর বা মুদ্রাকর প্রমাদ তাহাতে সন্দেহ নাই এবং অপর কতকগুলি দৌলতের সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ প্রয়োগের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান হয়। দৌলতের রচিত পয়ারে পদান্তের মিলে যেখানে পাওয়া যাইতেছে 'ফুল' ও '(বিম্-)-ভোল'; অথবা, 'লোভ' ও 'শুভ'; অথবা, 'রূপ' ও 'গোপ'; অথবা 'ভুল' ও 'বোল'; অথবা 'লোর' ও '-তুর'; অথবা, '(কৌ-)-তুক' ও 'শোক'; অথবা, 'রোল' ও '(আ-)-কুল'; অথবা 'লোর' ও 'শূর'; ইত্যাদি, সেখানে স্বভাবতঃই মনে হয় উচ্চারণে নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গের প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু এ প্রসঙ্গেও বলা প্রয়োজন যে পশ্চিম বঙ্গের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্লোকেও পদান্তের মিলে অনুরূপ প্রয়োগ অসংখ্য রহিয়াছে, যেমন : 'মণে' ও 'গুণে' [পৃঃ ১৮], '(তাম্-)-বুল' ও 'কোল' [পৃঃ ৩৪], 'দধী' ও 'শুধী' [ঐ], 'তুঈ' ও 'হোই' [ঐ], 'বটে' ও 'টুটে' [পৃঃ ৩৬], '(ঈ-)-শরে' ও 'চুরে' [পৃঃ ৩৮], ইত্যাদি। ইহা ছাড়া দৌলতের রচনায় পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ রীতিতে বহু শব্দের বানানে অপিনিহিতির প্রভাব দেখা যাইতেছে। যেমন, পৈরায়স্ত

১ তুলনীয় : "কাতারে কাতারে"। ২ O. D. B. L. পৃঃ ৩১৪

৩ তুঃ শ্রী. কী., পৃঃ ১৪। হিন্দীতে অনুরূপ প্রয়োগ আছে; যেমন, বঢ় জাও বা আগে বঢ় জাও (=অগ্রসর হও)।

৪ আ. রা. স. বা. সা., পৃঃ ১৩-১৪

(<পরাইয়ন্ত = পরান), জৈক্ষ (<যক্ষ), তৈক্ষক (<তক্ষক), তটৈক্ষণ (<তত্ক্ষণ), রৈক্ষক (<রক্ষক), সৈত্য (<সত্য), ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির সবই যে সংস্কৃতজ্ঞ কবি দৌলতের লেখনী-প্রসূত তাহা মনে করিবার কারণ নাই, কেন না, এই সমস্ত একই শব্দের চলিত বা আদর্শ বানানও প্রায়ই আবার অন্যত্র মিলিতেছে। বস্তুতঃ মনে হয় যে এই সমস্ত বানানে অধিকাংশ স্থলেই লিপিকর বা মুদ্রাকরের হাত রহিয়াছে।

অবশ্য দৌলতের রচনায় এমন দু' একটি শব্দ আছে যাহা অদ্যাবধি প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গেই প্রচলিত। যেমন "কৈ গেল শশিকলা" (পৃঃ ১২) এই ছত্রে 'কৈ' (= কোথায়) শব্দটি, অথবা "কনে বা বুঝিতে পারে নৌকার মহিমা" (পৃঃ ৬) এই ছত্রে 'কনে' (= কে) শব্দটি নিতান্তই পূর্ববঙ্গীয় শব্দ বলিয়া মনে হয়।

দৌলতের রচনায় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'ও' এই স্বরবর্ণের পরিবর্তে 'হ' এই ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ বহু স্থানে লক্ষণীয়, যদিও ও-স্বরের ব্যবহারও ঐ একই অর্থেই পাওয়া যায়; যেমন, সেহ (= সেও), তুমিহ (= তুমিও), লোরকেহ (= লোরকও), বসিলেহ (= বসিলেও, অর্থাৎ, যদি সে বসে), শুনিলেহ (শুনিলেও, অর্থাৎ যদি সে শুনে) ইত্যাদি।

'গণ' যোগে ক্লীবলিঙ্গের বহুবচন দুই এক জায়গায় মিলিতেছে: কুসুম গণ (পৃঃ ৯৯)। ফার্সি আন প্রত্যয় যোগে অন্ততঃ একটি অপ্রচলিত বহুবচনের প্রয়োগ চোখে পড়ে: "স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান" [পৃঃ ৮]। অধুনা পূর্ববঙ্গে 'সঙ্গে' শব্দের স্থলে যেমন 'সাথে' শব্দের প্রয়োগ কথাবার্তায়, এমন্ কি, কাহারও কাহারও গদ্য রচনাতেও আত্মপ্রকাশ করিতেছে, দৌলতের কাব্যে (কবিতায় 'সাথে' শব্দের প্রচলন সর্বত্র থাকিলেও) সেরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

লেখ্য ভাষায় অপ্রচলিত স্বতোনাসিক্যীভবনের (spontaneous nasalization) দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে: ধাঁই (= ধাই), হাঁসিয়া (= হাসিয়া), হাঁসি (পৃঃ ৬০), ইত্যাদি। অপ্রচলিত আদিস্বরলোপ (aphesis) দুই এক জায়গায় ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়: কিবা ভিষ্ট (<অভিষ্ট) [পৃঃ ৭২]; কোথা হস্তে গমন (<আগমন) [পৃঃ ৭৭]; ইত্যাদি। অপ্রচলিত সমাক্ষরলোপের (haplology) একটি সন্দেহজনক উদাহরণ পাওয়া যায়: উৎসাহীন (<উৎসাহহীন) [পৃঃ ৬৬]।

সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী

বন্দনা

বিস্‌মিল্লার নাম জান ত্রিভুবন[১] সার।
আদি অন্ত নাহি তান দোসর প্রকার॥
প্রথমে বলিয়ে বিস্‌মিল্লাহ্‌ অর্‌ রহমান।
সর্বস্থানে কল্যাণ পুরয়ে মনস্কাম॥
বিস্‌মিল্লা প্রধান[২] এক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্যসিদ্ধি সর্বস্থান॥
কি করিব যমদুতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্বসিদ্ধি জয়জয় সে নামপ্রসাদ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।
যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডায়॥
সুজন দুর্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করন্তি ভক্ষ্য দান॥
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তুলারাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ॥
কার্যেতে না জপে যদি সে নাম সে কার্য।
যাত্রা ভ্রষ্ট হয় কার্য সকল অন্যায্য॥
গুরুভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমতি।
তাহাকে দেয়ন্ত স্বর্গ কৃপাময় পতি॥
ঋষি মুনি আদি যত পৃথিবীতে বাস।
সকল ভরসা মাত্র রহিমের আশ॥
কার শক্তি সেই গুণ করিব বাখান।
সে নামপ্রভাবে লোকে আপদ কল্যাণ॥
সেগুণের ভাগ্য কেবা বাখানিতে পারে।
পিপীলিকা যেন সিন্ধুতরঙ্গ সন্তারে॥
ক্ষুদ্রবুদ্ধি সে গুণ বর্ণিতে হাবিলাষ।
ভরসা করিলুঁ কল্পতরুমূলে আশ॥
এথেকে কহম মুঞী অল্প বুদ্ধি মতি।
সে নাম বর্ণিতে মোর নাহিক শকতি॥
অনুপাম নীরূপ নীরেখ নিরাকার।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ সমান তাঁহার॥
সার তত্ত্ব কথা নহে বাণিজ্যের ধন।
ঘরে ঘরে বিকিবারে মূল্যের কারণ॥
দুই এক পাইতে কর্ণেত লাগি কহি।
পরমার্থে মোহর এতেক শ্রদ্ধা নাহি॥
মৎস্যের বোটরি নহে বাজারে বিকিতে।
গুরু-গম্য কথা নারে সবে প্রচারিতে॥
সব তেজি খোদা এক জানিউ নিশ্চিত।
তার সম বেদমন্ত্র নাহি পৃথিবীত॥
এরে এড়ি আন যদি কোন জন কয়।
আন[৩] প্রায় মাথা হীন হইব নিশ্চয়॥
ঠগ ঢামন ঢেঙ্গ[৪] ডাকাইত সঙ্গতি।
মস্তক খোয়ায় যেন হই আন-মতি॥
তেকারণে খোদা এক জানিবা সর্বথা।
যে সবে তাহান আজ্ঞা না করে অন্যথা॥
খোদার সদয় ছায়া জানিয়া নৃপতি।
মানিবা তাহান আজ্ঞা না হৈবা প্রকুতি॥
খোদার নবীর আজ্ঞা মানে যেই রাজা।
সকল পৃথিবী করে সেই পদ পূজা॥

১ সংসারের　২ প্রথম　৩ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য　৪ ঠগঠাম নানাঢঙ্গ

দুই তেজি একেতে বান্ধহ কায়া চিত।
কলিমাতে সে কহিছে সংসার বিদিত ॥
লাএলাহা-ইল্লাল্লাহো-মহম্মদ রসুল।
মুখে চিত্তে জপ নিত্য সে নাম অতুল ॥

মহম্মদ আল্লার রসুল সখাবর।
যাঁর নুরে ত্রিভুবন করিছে প্রসর ॥
শ্যাম তনু জ্যোতির্ময় সর্বাঙ্গ দাপনি।
নবুয়ত পৃষ্ঠে যেন জলে দিন-মণি ॥

মহম্মদের সিফত

আহাদ আছিল এক মিম হস্তে পরতেক
যে মিমেত জগৎ মোহন।
নিজ সখা অবতার মহম্মদ অলঙ্কার
মিমে কৈল টুপি কটিবন্ধ[১] ॥
আল্লার দোস্ত মহম্মদ মানহ তাহান পদ
দরুদ সালাম বহুতর।
তাহান চরণ ধুলি সর্বাঙ্গে চন্দন মলি
জুড়াউক পরাণী কাতর ॥
দুই কুলের[২] ঠাকুর আদি অন্ত রূপে ভোর
রূপে রূপে নবীর বড়াই।
নবীর আজ্ঞার বলে উঠক প্রসব শিলে
সর্ব হিত প্রতিষ্ঠার ঠাঁই ॥
সাংসারিক দয়াধর্ম সকল নবীর কর্ম
নবীসূত্র যা হস্তে সমাপ।
অঙ্গুল-ইঙ্গিত-শরে শশী দুই খণ্ড করে
প্রলয় সমান তান দাপ ॥
মুসলমানী মূল বাতি যার তেজে জলে নিতি
না নিবায়ে বায়ু বৃষ্টি জলে।
সপ্ত দ্বীপ[৩] নাম পাইব পুণ্য-বাতি না নিবিব
কি করিব বুক ইস্রাফিলে ॥
লোকেরে দেউক বাণী রসুল সহায় জানি
কোন্ চিন্তা সে লোক সভার।

১ প্রকট ভুবন। ২ দয়ালু গুণের ৩ দীপ

যাহার এমত বন্ধু কি ভয় পাপের সিন্ধু
যে নৌকাতে রসুল কাণ্ডার ॥
এ পাপ সিন্ধুর ঢেউ ভয়ে কম্পে মোর জিউ
নিজ ঘটে ডাকাইত দুর্বার।
সরিয়ত নাও কর ইমান প্রদীপ ধর
রসুল সহায়ে হইমু পার ॥
সেবহ রসুলে অতি বোরাক বাহন গতি
জিব্রাইল যাঁহার যোগান।
আল্লার হুজুরে হায় যুয়ায়ে দর্শন পায়
প্রেম ভাবে সর্বাঙ্গে নয়ান ॥
রসুলের সখাগণ প্রিয় যত পরিজন
একে একে নবী অবতার।
সে সবের পদে ধরি নিবেদহ নমস্কারি
বিপদেতে করিবা উদ্ধার ॥
শ্রীআশরফ খান ধর্মশীল গুণবান
মুসলমান সবার প্রদীপ।
সে রসুল-পরসাদে গুরুজন আশীর্বাদে
রাজসখা হউক চিরজীব ॥
সুসন্ধানী সুবিক্রম সুগম্ভীর সমুদ্র সম
কলিতে হাতিম সম দানে।
শত্রুশিরে দিয়া পদ আজিলেন্ত সুসম্পদ[১]
মহামন্ত[২] আশরফ খানে ॥
কহে কাজি দৌলৎ সাফল্য সে সম্পদ
যার নাম রহয় সংসারে।
জীবন যৌবন ধন না রহিব সর্বক্ষণ
অমর হইব উপকারে ॥

১ সুমহৎ ২ মহামাত্য

রোসাঙ্গের রাজার প্রশস্তি

রসুলের পদযুগ মস্তকেত ধরি ।
পীর গুরুজন পিতৃ মাতৃ নমস্কারি ॥
সুজন সকল পদে মোর পুষ্পাঞ্জলি[১] ।
কহিমু প্রসঙ্গ কিছু রচিয়া পাঞ্চালি ॥
কর্ণফুল নদী পূর্বে আছে এক পুরী ।
রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি ॥
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার ।
নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার ॥
প্রতাপে প্রভাত-ভানু বিখ্যাত ভুবন ।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥
দেব গুরু পূজয় ধর্মেত তার মন ।
সে পদ দর্শনে হয় পাপের মোচন ॥
পুণ্য[২] ফলে দেখে যদি রাজার চরণ[৩] ।
নারকীহ স্বর্গ পায় সাফল্য জীবন ॥
পঞ্চশত[৪] হস্তী যার বহয় আদেশ ।
অরুণ যোগান কালা মাতঙ্গ বিশেষ ॥[৫]
রাজ্য সব উপশম কৈল সুবিচার ।
কাকে কেহ না হিংসে উচিত ব্যবহার ॥
মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি ।
রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি ॥
বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্নভার ।
ভীম সম বলীও না করে বলাৎকার ॥
সীতা সম সুন্দরী যদি সে রহে বনে ।
রাজ-ভয়ে না নিরক্ষে সহস্র লোচনে ॥

মৃগ ব্যাঘ্র বনে যদি একস্থানে চরে ।
ধর্ম-বলে কাকে কেহ অন্যায় না করে ॥
সংসারের লোক কেহ নাহিক দুঃখিত[৬] ।
মহারাজা প্রসাদে সকল আনন্দিত[৭] ॥
চতুর্দিক জিনিয়া পৃথিবী কল্যা বশ ।
সুগন্ধি সমীর বহে রাজকীর্তি[৮] যশ ॥
পবন বাহনে গিয়া কীর্তি[৯] যশরাজ ।
পাতালে উজ্জ্বল করে নাগেন্দ্র সমাজ ॥
কীর্তি[১০] যশ দেখিয়া তক্ষক রাজনাগ ।
মণিছত্র ধরে শিরে করি অনুরাগ ॥
তেকারণে নাগগণ শিরে ছত্রবৎ ।
রহিল সুধর্ম কীর্তি[১১] পৃথিবী যাবৎ ॥
আপনে তক্ষক নাগে লই নাগগণ ।
সহস্রের সঙ্গে কীর্তি[১২] যশস্য গাহন ॥
গাহিতে গাহিতে শব্দ গেল সুরপুর ।
সুরপতি সুরলোক শ্রবণে মধুর ॥
শুনিয়া দেখিয়া ইচ্ছা হৈল পুরন্দর ।
ধর্ম কীর্তি যশ সর্বস্থানে শোভাকর ॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ধরিয়া যোগান ।
যশ কীর্তি[১৩] নিরন্তর সহস্র নয়ান ॥
নির্মল[১৪] ধবল কীর্তি যশ বিদ্যমান[১৫] ।
অক্ষয় অমৃত[১৬] কীর্তি অনন্ত[১৭] সমান ॥
মহামত্ত ঐরাবতে দেখি কীর্তি যশ ।
শ্বেতরূপে সুধর্মের হৈল পদবশ ॥

১ পুটাঞ্জলি ২ প্রাক্ত ৩ বদন ৪ শ্রেষ্ঠ ৫ অরুণ মাতঙ্গ কালা যোগান বিশেষ
৬ না হৈলেক দুঃখী ৭ লোক সুখী ৮ রাজকৃতি ৯ কৃতি ১০ কৃতি ১১ কৃতি
১২ কৃতি ১৩ কৃতি ১৪ নির্মিল ১৫ দীপ্যমান, দিব্যমান ১৬ অমর, অনন্ত ১৭ অনঙ্গ

অপ্সরা গন্ধর্ব যত সুরপুরবাসী।
ধর্ম কীর্তি যশ দেখি হৈলেন্ত উল্লাসী ॥
ধন্য ধন্য শব্দ হৈল দেবের সভাত।
সুধর্মের কীর্তি যশ পূর্ণ সন্নিপাত ॥
সেই ধর্ম কীর্তি যশ যে শুনে যে গায়।
জন্ম-দুঃখী হয় সুখী দারিদ্র্য পলায় ॥
ধর্মপাত্র শ্রীযুক্ত আশরফ খান।
হানাফী মোঝাব ধরে চিস্তি[1] খান্দান ॥
ইমান-রতন পালে প্রাণের ভিতর।
ইসলামের অলঙ্কার শোভে কলেবর ॥
পীর গুরু অভ্যাগত পূজেন্ত তৎপর।
লোক উপকার করে নাহি আপ্তপর ॥
রাজনীতি লোকধর্ম বুঝন্ত সকল।
মিত্রেরে সহায় করে অরি রসাতল ॥
মসজিদ পুষ্করণী দিলা বহুল বিধান।
নানা দেশে গেল তান[2] প্রতিষ্ঠা বাখান ॥
সৈয়দ, কাজি, সেখ, মোল্লা, আলীম, ফকির।
পূজেন্ত সে সবে যেন আপনা শরীর ॥
বিদেশী আরবী রুমী মোগল পাঠান।
পালেন্ত সে সবে যেন শরীর সমান ॥
শ্যাম তনু যুক্তিমন্ত[3] বচন মিষ্টতা।
শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা ॥
দেশান্তরী প্রবাসী[4] পন্থিক বানিজ্যার।
দেশে দেশে কীর্তি যশ বাখান যাহার ॥
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ।
আচি কুচি মাচীন[5] পাটনা আদি দেশ ॥

মহারাজা আয়ুশেস জানি শুদ্ধমন।
তান হস্তে রাজনীতি কল্য সমর্পণ ॥
মহাদেবী অনেক ভাবিল সুনিশ্চিত।
রাজপুত্র হস্তে অধিক সুপাত্র পণ্ডিত ॥
নৃপতিহ পুত্রভাবে হরিষে সাদরে।
মহামাত্য করিলেন আশরফ খানেরে ॥
সৈন্য সনে[6] অভিষেক করিল রাজন।
মহামাত্যে করিলেক রাজ্যের ভাজন ॥
মঙ্গল বিধানে সর্ব[7] কৈলা সমর্পণ।
বিবিধ প্রসাদ দিলা কল্যাণ কারণ ॥
ছত্র সমে দিলা সৈন্য[8] পতাকা দুন্দুমি[9]।
স্বর্ণ অঙ্গরাগ[10] আর বহু মুল্য জমি[11] ॥
দশ হস্তী প্রধান দিলেক বহু ঘোড়া।
রাজখড়্গ সমর্পিলা[12] লস্করী কাপড়া ॥
সেনাপতি হৈলা নানা সৈন্য অধিপতি।
আশরফ নামে শোভা নাম[13] হৈল অতি।
শ্রীআসরফ খান লস্কর উজীর।
যাহার প্রতাপ-বজ্রে চূর্ণ অরিশির ॥[14]
নৃপতির সম্পাশে বৈসেন্ত দিবারাতি।
যথা যায় রাজা তথা চলেন্ত সঙ্গতি[15] ॥
একদিন ইচ্ছা হৈল সুধর্ম রাজার।
সসৈন্য সমস্ত চলে বিপিন-বিহার ॥
ধবল[16] অরুণ কালা লাল[17] বর্ণ গজ।
আকাশ ছাইয়া চলে নানা বর্ণ ধ্বজ ॥
অযুতে অযুতে[18] সৈন্য অশ্ব নাহি সীমা।
কনে বা বুঝিতে পারে নৌকার মহিমা ॥

১ চিস্তিয়া ; চিস্তির ২ মক্কা মদিনাতে গেল ৩ মূর্তিমন্ত ৪ প্রদেশী ৫ কুকি মচিনি
৬ সৈন্য সেনা ৭ সৈন্য ৮ স্বর্ণ ৯ দুন্দুভি ১০ অলঙ্কার ১১ টুপি
১২ সমে দিলা ১৩ আশরফ খান নামে শোভা ১৪ যাহার প্রতাপে বৃষ চূর্ণ অরিশির ১৫ সংহতি
১৬ ধাইল ১৭ নীল ১৮ অর্বুদে অর্বুদে

দ্বাদশ দিবস পন্থ নৌকায় চলিতে।
কৌতুকে চলেন্ত রাজা নিকুঞ্জ খেলিতে॥
নানা বর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে।
নব শশিগণ যেন জলে নামি ভাসে॥
দুই সারি সে নৌকা ভাসয় নানা রঙ্গে।
আরোহিল নৃপ সভা[১] আসরফ সঙ্গে॥
দশ দিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায়॥
রজতের বৈঠা সব শোভন নৌকার।
জল সিঞ্চে স্বর্ণ পাখী পক্ষ যে[২] রূপার॥
দেব সিংহাসনে যেন ইন্দ্র শোভা করে।
দীপ্তিমন্ত নৌকা যেন বিজলি সঞ্চারে॥
মরকত স্তম্ভ সব রজতের ছানী[৩]।
নবরঙ্গ থোপা যেন মুকুতা খেচনি॥
আগে পাছে চামর দোলায় ঘন ঘন।
বিবিধ পতাকা উড়ে নৌকার শোভন॥
স্বর্ণ শিখি-পেখনে বিচিত্র পাছা[৪] নৌকা।
সুরচিত উঞ্চ অগ্র যেন দেখি শিখা॥
হুলাহুলি নৌকা বাহে বহুল বাজন।
দুন্দুভি ভেউর ঢোল মেঘের গর্জ্জন॥
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় নৌকার গঠন।
পবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন॥
নানা বর্ণ পুষ্প পত্র যেন শোভা করে[৫]।
নানা বর্ণ সব নৌকা নদী দীপ্তি[৬] করে॥
খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবন।
সঙ্গে[৭] আশরফ খান আদি পাত্রগণ॥
চতুর্দিকে পাত্রগণ মাঝে নৃপবর।
তারকা বেষ্টিত যেন চন্দ্রমা সুন্দর॥

বন উপবন যত পুষ্প পরিমল।
বহয় সুগন্ধি বায়ু সুরম্য শীতল॥
বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম।
কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অভিরাম॥
তথাতে রচিয়া সভা রহিল নৃপতি।
ময়ূর গঠন যেন সভার আকৃতি॥
অপূর্ব নৃপতি সভা বিনোদের স্থল।
অমাত্য সহিতে রাজা করে কুতূহল॥
যাহার যেমত যুক্ত শিবির রচিয়া।
তাহাতে রহিল সৈন্য আনন্দ করিয়া॥
নৃপের সভাতে নানা যন্ত্র সুললিত।
নানা পাখী নাদে যেন বন কল্লোলিত॥
মগধ রাজ্যের যত যন্ত্র অনুপাম।
কহিতে আছিএ এই সে সকল নাম॥
তার আদি মৃদঙ্গ মোচঙ্গ তবলা।
সে সব মধুর নাদে শ্রবণ চঞ্চলা॥
গীতে নৃত্যে বারাঙ্গনা সুশীতল রব।
শুনিতে প্রত্যেক মনে জাগে মনোভব॥
রাজার সভাতে নিত্য গাহস্ত সুস্বরে।
পুষ্পের ডালেত যেন কোকিলা কুহরে॥
শিবিরে শিবিরে করে নানা কুতূহল।
গাহস্ত বিনোদ সবে সুরঙ্গ মঙ্গল॥
নৃত্য গীত নাট বেশ্যা[৮] চাতরে চাতরে।
মত্ত শিখিগণ যেন খেলয় শিখরে[৯]॥
দ্বারে দ্বারে সুবিচিত্র উড়য় পতাকা।
হেমতরু পরে যেন কিশলয় শিখা॥
স্থানে স্থানে সরোবর সুনির্মল জল।
জলে শোভে বিকশিত সুরঙ্গ কমল॥

১ সখা ২ পঙ্কজ ৩ ছাউনি ৪ পাশ ৫ ভাসে সরে ৬ শোভা
৭ সঙ্গী ৮ নটবেশ ৯ ভূধরে

সহরিষে জলচরে বেহারেন্ত জলে।
হংস হংসী ক্রীড়া করে পদ্মপত্রতলে॥
বনে ভ্রমে রাজ-সেনা বিচিত্র বসন[১]।
বিকচ কুসুম যেন শোভে বৃন্দাবন॥
নগরেত রঙ্গের পসার হুলস্থুল।
পুষ্পের বনিজে যেন গুঞ্জে অলিকুল॥
দ্বারাবতী উজ্জ্বল করিয়া ধর্মরাজ।
দ্বারিকাতে শোভে যেন গোবিন্দ সমাজ॥
সৈন্য সমুদিত রাজা আটোপ করিয়া।
চারি মাস রহে তথা হরষিত হৈয়া[২]॥
তবে মহাপাত্র আশরফ মহামতি।[৩]
আপনা সভাতে আইলা রাজ অনুমতি॥[৪]
নানা জাতি লোক সবে ধরিল যোগান।
সভাতে বসিলা শ্রী আশরফ খান॥
সৈয়দ সেখ আদি মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুয়ান॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।
সারি সারি বসিলেন্ত যেন মহেশ্বর॥
নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান॥
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল॥
নানা পুষ্পে শোভে যেন বৃন্দাবন শোভা।
লোকেরা[৫] শোভন করে মহাজন সভা॥
লোক হস্তে লোক কীর্তি[৬] রহে পৃথিবীত।
চলি গেল রাজা সব রহিলেক কৃত[৭]॥
সুকৃতি যাহার না রহিল ভুবনে।
নাহিক তাহার জীব, মরণ সমানে॥
সাফল্য জীবন যার রহিল সুনাম।
নামে চিরজীবী হৈল জানকী শ্রীরাম॥
এতেক সে মহাজনে বুঝিয়া রহস্য।
লোকেরে সাদর করি পালিবা অবশ্য॥
শ্রীযুক্ত আশরফ খান অমাত্য প্রধান।
ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রমা সমান॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রস চয়।
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়॥
হেন মতে সভা করি বসিয়া থাকিতে।
কহেন্ত সানন্দ চিত্তে প্রসঙ্গ শুনিতে॥
আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ।
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুজ্রাতী গোহারী ঠেট[৮] ভাষা বহুতর।
সহজে মহন্ত[৯] সভা আনন্দ সায়র[১০]॥
শেষে পুনি কৌতুকে কহিলা মহামতি।
শুনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী॥[১১]
ভারতে পুরাণে[১২] সত্য, সত্য সে বাখানে।
চন্দন[১৩] তিলক সত্য উগে সর্ব্বস্থানে॥
প্রাণান্ত করিয়া সত্য পালে মহাজন।
রাজ্য-পাল[১৪] ত্যজি করে সত্যের পালন॥
সত্য-বলে রাজা হৈল পাণ্ডব নন্দন।
সত্য সে পরম সিদ্ধি বিজয় কারণ॥
যত জাতি শাস্ত্র রীতি বৈসয় সংসারে।
আগ্নে সত্য ধরি পাছে বড়াই বিচারে॥

১ ভূষণ ২ বন বিহারিয়া ৩ তার মধ্যে পাত্র আসরফ মহামতি ৪ আপনা ভুবনে আইলা রাজার সঙ্গতি
৫ লোক সে ৬ কৃতি ৭ কীরিত ৮ খোট্টা ৯ মহৎ ১০ কাব্য রস স্থল
১১ শুনিয়া সতীর কথা রাজার আরতি ১২ ভারত পুরাণ ১৩ চন্দ্রমা ১৪ প্রাণ

ইস্থপ সিদ্দিক শাহা রস্থল আল্লার।
সত্য বলে মিসিরের হৈলা অধিকার ॥
সত্য বলে মহাপাত্র বাড়িল উন্নতি।
কোন্ মতে হৈল ময়না পতিব্রতা সতী ॥
ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে[১]।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥
তবে কাজি দৌলৎ বুঝিয়া সে আরতি।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী ॥

কথারম্ভ

রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।
ভুবন বিজয়ী কন্যা[২] জগতে পার্ব্বতী ॥
কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ[৩]।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ ॥
কাঞ্চন-কমল মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে।
অপমানে জলেতে প্রবেশে অরবিন্দে ॥
চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঞ্জন শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে ॥
মদন-মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন।
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ ॥
পুষ্প শর জিনি নাসা শোভে দিব্যমান।
লজ্জা এড়ি অন্তর্গত রহে কামবাণ ॥
অধর বান্ধুলি রুচি কত মধু ভাষে।
স্থকুন্দ-দশন-পাঁতি মুকুতা প্রকাশে ॥
ঘন-চয়-রুচিকেশ শিরেত শোভন।
প্রভা ছাড়ি ভানু যেন তিমির শরণ ॥
স্থবর্ণ কর্ণিক[৪] কর্ণে মাণিক্য নেপুরে।
দোসর অরুণ দোলে চন্দ্রমার কোরে[৫] ॥
মন্মথ-মথিত যে সম্পূর্ণ শ্রীফল।
নিবিড় নির্ম্মল কুচ মুকুল কোমল ॥
নাভি কুণ্ড নহে রতি ক্রিয়ার সর্ব্বস্ব।
মদনের বিভা হেতু মঙ্গল কলস ॥
নির্ম্মল রাতুল অঙ্গ কেতকী সমান।
ভরমে ভ্রমর পাঁতি ধরএ যোগান ॥
চরণ-যুগল নব পল্লব ললিত।
পদে পদে নরপতি[৬] যায় পৃথিবীত ॥
স্থবেশ লাবণ্য প্রতি অঙ্গে কান্তি করে।
কেবল সোহাগ স্থধা অন্তরে[৭] উদগারে ॥
কত কত কুসুম বটরী প্রজাপতি।
নিজ গুণ প্রকাশিতে স্থজিলা যুবতী ॥
প্রিয়বাদী পতিব্রতা স্থলাস স্থমতি।
প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিজ পতি ॥
সর্ব্বকলাযুতা সতী নূতন যৌবন।
স্বামীর লোরক নাম নৃপতি নন্দন ॥
নানা গুণে বিশারদ লোরক দুর্জ্জয়।
বিচক্ষণ বলবন্ত সাহসে নির্ভয় ॥

১ কহিলে সদমে ২ যেন ৩ রূপ রস রঙ্গ ৪ কর্ণিকা ৫ ক্রোড়ে
৬ ঋতুপতি ৭ অঞ্চল, অধরে

অন্তে অন্তে দোহ[১] চিত্তে প্রেমের মুকুল।
তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে দোহান আকুল ॥
যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরান্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত ॥
আচম্বিত মতি হৈল লোরক নৃপতি।
ছাড়িয়া রতন-হার গুপ্তাত আরতি ॥
প্রাণসম মহিষী করিয়া একসরী।
কানন বিহার ইচ্ছে লোরক কেশরী ॥
আদেশিলা নৃপ যত পাত্র যুবাজনে।
ভ্রমিব নগর আমি যাইব কাননে ॥
যুবা সব সঙ্গে চল, রহ বৃদ্ধ জন।[২]
বৃদ্ধ পাত্র সবে কর এ রাজ্য পালন[৩] ॥
রাজ্য পাট সমর্পিলা মহাদেবী স্থান।
চলি গেল নরপতি মঙ্গল বিধান ॥

বনবিহার

লোরক রাজন চলি গেল[৪] বন
এক নারী নাহি সঙ্গে।
ছাড়ি কলানিধি রূপের অবধি
ভোলে বনস্পতি[৫] রঙ্গে ॥
সঙ্গে যুবাজন যেন পুষ্পবন
বিবিধ বস্ত্র[৬] ভূষণা[৭]।
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি শীতল
সঞ্চারে বায়ু যোজনা ॥
বিবিধ বরণ কস্তুরী চন্দন
মোদিত স্খলেত কে না[৮]।
নানা রস পুরি শ্রবণ মাধুরী
পিনাক আদি বেণু বীণা ॥
চলে দলবল ভূমি টলমল
হরিষ বিলাস মনে।
সব ঘর[৯] নারী মদন-প্রহরী
দিয়া যায় সব বনে ॥

১ দুহ ২ যুবা সব সঙ্গে যাও না যাও বৃদ্ধ জন ৩ রক্ষণ ৪ ভেল ৫ বনপত্র
৬ বর্ণ ৭ ভূষণে ৮ স্খলিত সেনা ৯ বর

সব পাত্র গণ প্রথম যৌবন
কাল নির্বাহন্ত হেলে।
সঙ্কট সময় কে দিব উপায়
এক বৃদ্ধ নাহি মেলে॥
রাজার রমণী কামের কামিনী
সেই হৈল একাকিনী।
যৌবন জঞ্জালে বান্ধি চিন্তাঞ্চলে[১]
তেজিতে চাহে পরাণী॥
পথিক[২] যুবতী মদন পিরিতী
কাতর প্রেম পিয়াসা।
সকল বিরহী হইয়া একহি
সেবন্ত ধৈর্য মন-আশা[৩]॥
লোরক রাজন রূপে নারায়ণ
প্রাণ সম নিজ নারী।
যথা তথা যায় বিজয় সদায়
নিশ্চিত যেন মুরারি॥
কানন কুটীরে ললিত মন্দিরে
রচিয়া চারু প্রাসাদ।
নিত্য মহোৎসব শব্দ মনোভব[৪]
কোথা[৫] নাহি পরিবাদ॥
উচ্চস্বরে নাদে পাখী নানা ছাঁদে
জাগয় পুলক ভাব।
বসন্ত পবনে সুগন্ধি চন্দনে
দূর করে মনস্তাপ॥
নির্জ্জন মন্দিরে কেলি কুতূহলে
রহিল লোরক রাজ।
নিত্য সভা করি খেলে পাশা সারি
লইয়া পাত্র সমাজ॥

১ চিন্তাজালে ২ পন্থিক, পুর্ণক ৩ মানসা ৪ শব্দে মোহভাব ৫ তথা

ময়নাবতীর বিলাপ

আহা মোর পতি প্রাণের পোতলী
বিনোদ লোর[১] রাজ্যেশ্বর[২] ।
সময় বসন্ত যৌবন কালে কান্ত
এড়ি[৩] যায় দিগন্তর ॥
পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর
অন্তরে[৪] বাহিরে কালী ।
যাবৎ মত্তমতি পুরি[৫] মনঃপ্রীতি
আর পুষ্পে করে কেলি ॥
ত্যজি রাজ্যপাট বিচিত্র সজ্জা ঠাট[৬]
কামিনী কাম সিংহাসন ।
ছাড়ি ছায়া ছত্র রহে বন পত্র
হেন কি করে নৃপজন ॥
নাহি দয়া মায়া পাষাণ সম হিয়া
দোষ পাইলে করে শাস্তি ।
কেমনে স্ত্রীজনা ধরিব আপনা
পুরুষ নিষ্ঠুর জাতি ॥
না হয় বৈদেশী না হয় তপস্বী
রাজ চক্রবর্তী বীর ।
সৈন্য সনে[৭] লৈয়া বনেতে রহে গিয়া
সভাতে[৮] না ছিল ধীর ॥
প্রাণের বল্লভ মনের মনোভব
পতি সে কাম-সিন্দুর[৯] ।
অঙ্গের চন্দন নয়ন অঞ্জন
কণ্ঠ[১০]-মণিহার মোর ॥

১ লোরক ২ রাজেশ্বর ৩ এড়িলা ৪ ভিতরে ৫ পুরিআ ৬ শয্যা খাট
৭ সৈন্ত সেনা ৮ সভাত কি ৯ সুন্দর ১০ কণ্ঠের

কোথাতে যাইমু কাহাকে[১] কহিমু
কে মোর জানিব বেদন।
মোর নিজ পতি রাখিতে পারে[২] যদি
মোরে তৌলি লও ধন ॥
প্রেমাঙ্কুর মনে পালিলুঁ যত্নে[৩]
শিশু হস্তে সঙ্গে পতি।
সময়ে পুষ্প ফল, চলয় দিগন্তর
মূর্খেও নহে হেন মতি ॥
কৈ গেল শশিকলা কোথা সুমঙ্গলা
ধিক[৪] দেয়[৫] বৈরী মোরে।
মর্মে পাইলুম ঘাও মুখেতে না আইসে রাও
প্রেমানলে তনু পোড়ে ॥
কহে সুরঙ্গনা শুন সতী ময়না
ধৈর্য ধর দিন চারি।
খান আশরফ জগৎ বল্লভ
পুর মানস তোমারি ॥

যোগীর আবির্ভাব

নির্জন কাননে যদি রহিল রাজন।
রাজসুখ এড়ি রাজা বনে হৈল মতি।
নারী বিনে বসতি করয় সর্বজন ॥
কুন্দ পুষ্প ভোগে অলি তেজিয়া মালতী ॥
রাজার সুহৃদ পাত্র মনোজ সুধীর।
হেনকালে দ্বারী এক আসিয়া সত্বর।
রূপে গুণে দোসর লোরক সম বীর ॥
প্রণামিয়া কহে বার্তা রাজার গোচর ॥
একদিন মনোজাদি যত পাত্র লইয়া।
কোথা হন্তে এক যুগী মিলিল আসিয়া।
নৃত্য গীতে আছে রাজা সভাতে বসিয়া ॥
বাহির দ্বারেতে আছে নিশ্চিন্তে বসিয়া ॥
কেহ নাচে কেহ গাহে ফুরে[৬] বংশীরাজ।
না নড়ে না চলে যুগী যেহেন স্থাবর।
বনপতি ক্রিয়া করে যেন বন-মাঝ ॥
বৃত্তান্ত পুছিলে কেহ না পায় উত্তর ॥

১ কাহাতে ২ পারি ৩ অন্তে অন্তে ৪ এদিকে ৫ দেখ ৬ পুরে

জটাধারী ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বিভূতি ভূষণ।
কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন ॥
জ্বলন্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর।
যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর ॥
যুগীর হস্তেত এক সুবর্ণের ঘট।
হাতত বিচিত্র এক পোতলির পট ॥
নানা রূপ রেখা রঙ্গে পোতল রঞ্জিত।
নির্ভয় দৃষ্টিয়[1] যুগী তাক চাহে নিত ॥
সাক্ষাতে অম্বিকা যেন অনুভব করে।
সে পোতলী রাখে চক্ষু-পোতলী উপরে ॥
পরম পোতলী-রূপ জগৎ মোহন।
যোগ ধর্ম্ম যুগীর তাহাতে সর্ব্বক্ষণ ॥
ক্ষণেক হৃদয়ে ধরে ক্ষণেক মস্তকে।
ক্ষণে মোহশ্চিত পড়ে ক্ষণে বসি দেখে ॥
ক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাস ক্ষণে আঁখি বহে ধারা।
ক্ষণে ক্ষণে জিয়ে যুগা ক্ষণে যেন মড়া ॥
মুই দেখি আইলুম এমত ধরাণ।
কি জানি এখনো আছে কিবা গেল প্রাণ ॥
দ্বারী যদি রাজাতে কহিল এ বচন।
পাত্রে[2] পাঠাইয়া যুগী আনিলা তখন ॥
রাজার সভাতে প্রবেশিলা দেশান্তরী।
নৃপতি মন্দির যেন ইন্দ্রের দেউড়ি ॥
বসিছে লোরক রাজা রত্ন সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত শোভয় পাত্রগণে ॥
কান্তিময় তনু যেন হীরার দর্পণ।
কপালে মাণিক্য দোলে প্রসন্ন বদন ॥
দেখিতে দেখিতে শান্ত না হয় নয়ন।
নৃপরূপ দেখি যুগী পাসরে আপন ॥
অন্তর্গত জর হৈল মুখে নাহি বোল[3]।
কলেবর দহে যেন সর্পের গরল ॥
খসিল হস্তের চিত্র দণ্ড পাত্র চারু।
সংজ্ঞা হীন হৈল যুগী যেন বট তরু ॥
সাক্ষাতে বিস্ময় যুগী দেখি চমৎকার।
পাত্র আদেশিলা যুগী শান্ত করিবার ॥
ভৃঙ্গারের জল দিয়া বিচিয়া চামরে।
চৈতন্য করাইলা যুগী বহুল প্রকারে ॥
চৈতন্য পাইয়া যুগী হস্তে[4] লয় পট।
যুগীকে তুষিয়া রাজা বসায় নিকট ॥
মাধুরী সাদরে বার্তা পুছয় রাজনে[5]।
কোথা যাও কোথা হন্তে আইলা নির্জ্জনে[6] ॥
হস্তেত বিচিত্র পট ধর কি কারণ।
সুবর্ণ পোতল দেখি মানস-মোহন ॥
মোহশ্চিত মূর্তি কেনে ঊর্ধ্বশ্বাস ঘন।
স্বরূপে কহত মোকে সত্য বিবরণ ॥
নৃপতির বচন শুনিয়া দেশান্তরী।
সত্য রূপে আদ্য বার্ত্তা কহে ধৈর্য্য ধরি ॥
শ্রবণে শুনেন্ত রাজা মধুর সংবাদ।
বিচিত্র পোতল হৈল চক্ষের প্রমাদ ॥
বুঝিল বৈদেশী যুগী রাজার রহস্য।
রাজ-জ্ঞান-শক্তি হৈল পোতলের বশ্য ॥
মানসের গুপ্ত প্রেম ভাবে ব্যক্ত করে।
সুবর্ণ বরিখে যেন দরিদ্রের ঘরে ॥
জন্মিল ভাবক ভাব খণ্ডিতে দুষ্কর।
সার জলে নহে যেন বিন্দু জলধর ॥
প্রেম-শরাঘাত[7] যার হৃদে কৈল স্থান।
শত চিন্তা তাহার বাড়য় বিদ্যমান ॥

১ দৃষ্টিএ ২ পাত্র ৩ মূলে 'জল' ৪ হস্তে ৫ রাজন ৬ নির্জন ৭ শরাঘাতে

রাজার চিত্তেত চিত্র পোতল লিখিল।
চক্ষের পোতলি করি পোতলি মানিল ॥
নৃপতি চরিত্র যুগী কৈল অবধান।
পোতল হরিলে যায় বল বুদ্ধি জ্ঞান ॥[১]
তবে যুগী বলে কহি শুনহ রাজন।
যে কিছু দেখিলোঁ কহি সত্য বিবরণ ॥

যোগি-দত্ত বিবরণ

পশ্চিমেত এক রাজ্য আছয় গোহারি।
তাহাতে মোহরা নামে রাজা অধিকারী ॥
শূর[২] বংশ ধনুর্ধর বীর অবতার।
জামাতা বামন বীর দুর্জয় তাহার ॥
রাজা সুখ ভুঞ্জয় বসিয়া বৃদ্ধকালে।
বামন বীরের বাহু দর্পে ভূমি পালে ॥
দুর্জয় বামন বীর বিখ্যাত ভুবন।
সমর ভূমিতে যেন সিংহের গমন ॥
খর্ব-রূপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ।
বামন বিক্রম যেন বলির উদাস ॥[৩]
হেন বীর না আছিল পৃথিবী ভিতরে।
বামনের সমুখে বীরতা দর্প করে ॥
সর্বগুণে যৌবন সম্পূর্ণ বীর্য-বল।
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল ॥
তাহার রমণী নৃপ-মোহরা-কুমারী।
রূপে চন্দ্র সম নহে, সে চান্দ গোহারি ॥
গোহারি রাজ্যের যেন প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা।
চন্দ্রমা না হয়[৪] চান্দ গোহারি উপমা ॥
মোহরা নৃপের চান্দ গোহারি নন্দিনী।
সংসারে কহয় যার রূপের কাহিনী ॥
সে রূপের কাহিনী প্রসরে নানা দেশ।
রাজা সকলের কর্ণে অপূর্ব বিশেষ ॥
অপূর্ব সে রূপ যদি শুনয় শ্রবণে।
মানস না হয় শান্ত না দেখি নয়নে ॥
তেকারণে ইচ্ছে লোক সেরূপ দেখিতে।
শ্রবণ নয়ন মাঝে বিবাদ খণ্ডিতে ॥

রাজকন্যার দুঃখ

সুরপুর[৫] সম রূপ মোহরা নগরী।
সে পুরীতে বসে নানা দেশ দেশান্তরী ॥
যুবরাজ যত মহাবীর বলবন্ত।
কুমারী দর্শন হেতু সকলে[৬] বৈসেন্ত ॥
বড় রাজা সব আইল নিজ রাজ্য এড়ি।[৭]
মোহরা দেশেতে যায় দেখিতে কুমারী ॥
নগর ভ্রময় কন্যা বৎসরে দুবার।
সকলের মনোবাঞ্ছা কন্যা দেখিবার ॥

১ পোতল হরিল রাজ-বল-বুদ্ধি-জ্ঞান ২ সুর ৩ বামন-বিক্রমে যেন বলি রহু (রহে) দাস
৪ চন্দ্রমাও নহে ৫ পুরী ৬ তথাত ৭ বড় বড় রাজা সব নিজ রাজ্য এড়ি

পরব সময় যদি হৈল উপস্থিত।
দেব স্থানে যায় কন্যা সখী[1] সমুদিত ॥
পদ্মলীলা[2] সুমঙ্গলা দুই সহচরী।
কামনাশা নামে সখী তৃতীয় সুন্দরী ॥
চতুর্থ সখীর চারু নাম[3] রম্যকলা।
গুণে উন নহে কেহ কর্মেতে কুশলা ॥
এক এক সখী সব উজ্জ্বল তারক।
বুঝিতে ইঙ্গিতে লীলা রসেত পারগ ॥
বুদ্ধিশিখা নামে ধাই মধুর-ভাষিণী[4]।
লোকপ্রিয়া সুতা জান[5] চতুর সন্ধানী ॥
নির্জনে কুমারী সঙ্গে করি এক কেলি[6]।
সময় গোয়ান্ত নানা কাব্য রস খেলি[7] ॥
স্বামি-হীন কুমারীর কোন প্রয়োজন।
কামভাবে নারী প্রিয় না হয় বামন ॥
মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।
নারী সঙ্গে রতিরসহীন মূঢ়মতি ॥
মাসেকে না চাহে লেউটিয়া নিজ নারী।
বন-ক্রীড়া[8] করে নিত্য যেন বনচারী ॥
প্রতিনিতি মহাবীরে[9] কানন ভ্রমিয়া।
শার্দূল মহিষ মৃগ আনেন্ত মারিয়া ॥
বন ভ্রমি আইসে যদি দুর্জয় বামন।
প্রতিদিন[10] রাজদ্বারে বাহিরে শয়ন ॥
আস্তেব্যস্তে কুমারী পাঠায় সখীগণে[11]।
প্রবোধি আনেন্ত গিয়া অবোধ বামনে[12] ॥
কুমারী আদেশ শিরে লই[13] সখীগণ।
ত্বরমানে চলি যায় যথাতে[14] বামন ॥
গিয়া সবে কুমারে[15] বাহির দ্বারে দেখে।
যত্নভাবে কুমারকে[16] পূজে একে একে ॥
সুগন্ধি শীতল জলে ধোলায়ন্ত[17] পাও।
কোন সখী ধবল চামরে করে বাও ॥
সত্বরে যোগায় কেহ সুবর্ণ আসন।
কেহ রাজ উপযোগ্য যোগায় বসন ॥
কোন সখী ভৃঙ্গারের জল সুবাসিত।
যোগায় কুমার তৃষ্ণা বুঝিয়া ইঙ্গিত ॥
কর্পূর বাসিত পান করিয়া সংযোগ।
কোন সখী কুমারকে করায়ন্ত ভোগ ॥
সুবর্ণ বাটাতে ভরি অগুরু চন্দন।
কুমারের অঙ্গে কেহ করান্ত লেপন ॥
মালা গুথে[18] কোন সখি যেন মালাকার।
কুমারকে পৈরায়ন্ত নানা পুষ্পহার ॥
বিশেষ বিবিধ দ্রব্য রাজ উপহার।
যোগায়ন্ত সখীগণে ভুঞ্জয় কুমার ॥
কেহ কাব্য শাস্ত্র পড়ি কহে উপদেশ।
কুমারীর সঙ্গে মিল করাইতে বিশেষ ॥
কেহ রতি পাঠ করি করায়ন্ত ভাব।
বিরহ প্রসঙ্গ কহে কুমারী বিলাপ ॥
প্রথম-যৌবনী কন্যা রূপে মনোহারী।
বচন অমৃত পূর্ণ সে চান্দ গোহারী ॥
গুণবতী কলাবতী রতি রস লৈয়া।
সুবেশ লাবণ্য লীলা ভুবন বিজয়া ॥
চারুশীলা প্রিয়তমা নৃপতি তনয়া।
হেন নারী তোমার কিংশুকে[19] নাহি দয়া।

১ দেব ২ নীলা ৩ নামে ৪ বাদিনী ৫ যেন ৬ মিলি ৭ কেলি
৮ বনে ক্রীড়া ৯ মহাবীর ১০ নিতিপ্রতি ১১ সখীগণ ১২ বামন ১৩ লৈআ ১৪ যথাত
১৫ কুমারকে গিয়া সবে ১৬ সখীগণে ১৭ ধোয়ালন্ত ১৮ গাথে ১৯ কি শোকে

দেবের দুর্লভ কন্যা মানবীর কুলে[১]।
একসরী বঞ্চে পূর্ব-জন্ম-পাপ-ফলে ॥
তুমি হেন স্বামী যার বিদিত জগতে।
সে কেন লাঞ্ছনা পায় মদনের ঘাতে ॥
একাকিনী নারী দেখি দুরন্ত বসন্ত।
পুষ্পশর লৈয়া করে লাঘব অনন্ত ॥
স্বামী বিনে বিষণ্ণ সে কামের[২] কামিনী।
চন্দ্রের বিচ্ছেদে যেন তাপিত রোহিণী ॥
চকোরে পূজয় চান্দ জগৎ বিদিত।
তুমিত চকোর চান্দ পূজে বিপরীত ॥
তবেত[৩] তোমাতে নাহি নারী-স্নেহাদর।
উদাসীন[৪] মত দ্বারে বঞ্চ একসর ॥
রাজার কুমারী সেহ রহে দুঃখ সহি।
স্বামী বিনা বঞ্চে যেন দারুণ বিরহী ॥
অন্তঃপুরে রমণী, তোমার দ্বারে বাস।
ক্ষণেক না গেলা তুমি কুমারীর পাশ ॥
দিবসে নিরক্ষে পন্থ তোমার উদ্দেশে।
রজনী শয্যাতে জাগে মদন কেলেশে ॥
পরিজনে কুমারী বিরহ দুঃখ দেখি।
প্রবোধিতে বচনে না পারে কোন সখি ॥
শীতল মন্দিরে কন্যা নাহি রহে স্থির।
মদন বেদনা চিত্তে আঁখি[৫] ঝরে নীর ॥
হিত তত্ত্ব উপদেশ না শুনে শ্রবণে।
ক্ষণে আলাপয় ক্ষণে বিলাপে আপনে ॥
যৌবন কালেত কন্যা বড় চিন্তা পায়।
অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-বিষ সর্বাঙ্গে বেড়ায়[৬] ॥
সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝার শকতি।
স্বামী সে চিকিৎসা-হেতু, ঔষধ সুরতি ॥
সুরাসুর নর পশু যত জীব জান[৭]।
সুরতি সম্ভোগ বিনু[৮] না জুড়ায়[৯] প্রাণ ॥
রাজার কুমার তুমি প্রথম যৌবন।
তোমার উচিত কাম সংগ্রাম এখন ॥
তোমা সঙ্গে চন্দ্রানীর সুরতি সঙ্গম।
কমলিনী ভ্রমরের যেন সমাগম ॥
এই মোর নিবেদন তোমার চরণে।
যে জুয়ায় সেই কর বুঝিয়া আপনে[১০] ॥
সখী মুখে শুনি বীরে[১১] কুমারীর কাজ।
ভক্তিভাবে সম্বোধি[১২] কহয় যুবরাজ ॥
সর্বথা যাইব[১৩] আমি[১৪] কুমারীর পাশ।
মধুপানে করিমু বিরহ-দুঃখ নাশ ॥
রঙ্গ খেলা সুখ শয্যা সঙ্গে সে কামিনী।
রতিরণে পরাজিমু মদন বাহিনী ॥
যুবরাজ-বচন শুনিয়া সখীবর।
কুমারে প্রণামি যায় কুমারী গোচর ॥
ধাই সঙ্গে কুমারী লইয়া সখীগণ।
নির্জনে বিলাপ করে কামভীত মন ॥
হেনকালে সুলোচনা কুমারী সভাত।
প্রণামিয়া কহে যুবরাজের সংবাদ ॥
মহাবীর হও[১৫] তুমি বনিতা যাহার।
তাকে নিবেদিলুঁ যত বিলাপ তোমার ॥
যত ইতি নিবেদিলুঁ কুমার-চরণে।
সে সব কহিব শুন তোমাকে[১৬] এখনে ॥

১ মানবের কোলে ২ কামর ৩ তবেও ৪ উদাসীর ৫ আঁখে
৬ ছড়ায় ৭ বান (?) ৮ বিনে ৯ ধরএ ১০ এথনে
১১ বীর ১২ সংবাদ ১৩ যাইমু ১৪ আজি ১৫ হয় ১৬ তোমাত

তুমি বিনা সে নারীর জীবন জঞ্জাল।
যৌবন হইয়া বৈরী বুকে মারে শাল॥
তুমি বিনে সন্তাপিব বিরহের জ্বাল।
সহজে বিরোধ বৈরী বিপত্তির কাল॥
তুমি বিনে কাম-বাণ[১] বাড়িতে সে যায়।
খস্থয়া শরীরে যেন গরল উগায়॥
তুমি বিনে পরিমল সমীরণ মন্দ।
হিত মিত বিপরীত চন্দন ও চন্দ॥
সে চান্দ গোহারীরূপ চন্দ্র অবতার।
চন্দ্র হানে ভানুতাপ[২] কারণে তোমার॥
অন্তঃপুরে নারী থুই না যাও নিকট।
পদ্ম উপেক্ষিয়া যেন ভ্রমরা কপট॥
চকোর হইয়া চান্দ পাশেতে না যাও।
আঁখির গোচরে[৩] রত্ন দিবসে হারাও॥
রাজার জামাতা তুমি রাজার নন্দন।
উদাসীন[৪] মত ভার্যা পাসরো আপন॥
গুণযুতা রাজসুতা সে চান্দ গোহারী।
বামনে পাইবা কোথা চন্দ্ররূপ নারী॥
খর্বরূপ খর্ববুদ্ধি হৈয়া হতমতি।
খর্ব হস্তে কেমনে ধরিবা নিশাপতি॥
সাম দণ্ড উপদেশ শুনিয়া তোমার।
সর্বথা কহিল আজি আসিতে[৫] কুমার॥
তুমিহ আপন বেশ করহ রচিত।
দেখিতে[৬] বামন যেন হয় পুলকিত॥
কাজলে উজ্জল কর কমল[৭] নয়ন।
দৃষ্টিতে ভুলয় যেন অবোধ বামন॥

নব ঘন জ্যোতি[৮] কেশ কুসুমে[৯] জড়িয়া।
তাহাতে বামন চিত্ত রাখহ বান্ধিয়া॥
কর্ণপুটে[১০] রত্নময় পৈর অলঙ্কার।
দেখিতে বামন চিত্তে লাগে কাম ভার[১১]॥
কস্তুরী তিলক মুখে মৃগাঙ্ক সে চান্দে।
বামন চকোর[১২] যেন দেখি পড়ে[১৩] ফান্দে॥
কাঞ্চন কটোরা কুচ চর্চিয়া চন্দনে।
নিজ হিয়া তথা যেন সম্বরে বামনে॥
নেপুর কিঙ্কিনী হার কেয়ূর কঙ্কণ।
রতি-রণে হৈব তার[১৪] মদন-বাজন॥
সুবেশ চরিত্রে কর স্বামি-মন বন্দি।
মিত্র বশ করিবার প্রীতি বড় সন্ধি[১৫]॥
এ দুই অক্ষর[১৬] মধ্যে সর্বত্রে কুশল।
মিত্র সঙ্গে হয় হাস্য অরি সঙ্গে ছল॥
হরষিত কুমারী শুনিয়া সখী-কথা।
আসিব বামন আজ নাহিক অন্যথা॥
সখীগণ সমেত কুমারী কৈলা সাজ।
তারাগণ সঙ্গে চন্দ্র যেন মহীমাঝ॥
দ্বারে দ্বারে যোগান ধরিলা সখীগণ।
হেন কালে প্রবেশিল পুরীতে বামন॥
স্বামীর বদন হেরি ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
আগু বাড়ি খাটেতে বসাইলা করে ধরি॥
একত্রে বসিলা দেখি[১৭] কুমার কুমারী।
আনন্দ উল্লাস হৈল অন্তস্পুর[১৮] নারী॥
যাহার যেমত যুক্ত[১৯] ব্যবহার করে।
কেহ নাচে কেহ গাহে শীতল সুস্বরে॥

১ বন ২ ভানুতাপে ৩ গোচর ৪ উদাসীর ৫ আসিবে ৬ দেখিলে
৭ কুমুদ ৮ রুচি ৯ কুসুমে ১০ পুরে ১১ জাগে যেন মার ১২ ঠাকুর
১৩ বাধে, বাজে ১৪ আর ১৫ কন্দি ১৬ অঙ্কির ১৭ খাটেতে বসিল যদি
১৮ অন্তঃপুর ১৯ নিত্য

করতাল মৃদঙ্গ রবাব[১] বংশীনাদ।
উপাসঙ্গ[২] মৃদঙ্গের করকা সংবাদ॥
ধাই গিয়া মহিষীকে কহিল সত্বর।
চিরদিনে চন্দ্রানীর করে দিল কর॥
শুনিয়া আনন্দে রাজা মহাদেবী সঙ্গ।
দেখিতে আইল কন্যা জামাতার রঙ্গ॥
কন্যা জামাতারে দেবী[৩] একত্রে দেখিয়া।
করিল বহুল দান দোহাকে নিছিয়া॥
মোহরা নৃপতি করে মঙ্গল বিধান।
পুরোহিতে পড়ে পাঠ আনন্দ কল্যাণ॥
সসৈন্যসামন্ত রাজা করে মহোৎসব।
ব্যাল্লিস বাজনা বাজে শব্দ মনোভব॥
হেন কালে শুভমস্ত করিয়া নৃপতি।
পুন নিজ পাটে গেলা মহিষী সঙ্গতি॥
শ্রীযুত আশরফ খান লস্কর উজির।
ধৈর্যে মেরু, ধ্যানে[৪] গুরু ধার্মিক শরীর॥
প্রসন্ন হৃদয় সদা সতত আনন্দ।[৫]
বামন চন্দ্রানী কেলি কৌতুকে পুছন্ত॥
যেন মতে কেলি করে[৬] বামন চন্দ্রানী।
কহেন্ত দৌলৎ কাজি সে সব কাহিনী॥

চন্দ্রানীর সঙ্গে বামনের রাত্রিযাপন

তথাতে[৭] চন্দ্রানী সঙ্গে বামন কুমার।
মালতীর সঙ্গে যেন মর্কট বিহার॥[৮]
নৃত্য গীতে অর্ধরাত্রি জাগে পৌরজন।
তার শেষে নিদ্রাচোরে[৯] হরিল চেতন॥
নিদ্রা-মদে মত্ত যদি হৈল সখী সব।
খাট হস্তে উঠে বীর যেন খর্ব শব[১০]॥
প্রদীপ নিবারি বীর বিস্তারি বসন।
ভূত প্রায় খাট হেটে করিল শয়ন॥
তা দেখিয়া কুমারী বিস্ময় বড় মনে।
নিদ্রা-সূত্র-বন্ধনে বিভোল[১১] পরিজনে॥
মদন বেদনে কন্যা জাগে একসর।
চক্ষেতে না আইসে নিদ্রা হৃদয় ফাপর॥
সঙ্গী হেন নাহি কেহ[১২] কহিতে সরম।
পশুপ্রায় নিদ্রা যায় স্বামী নরাধম॥
আছউক কেলি কলা রভস সুরতি।
ভার্যাভাবে উত্তর না দিল মূঢ়মতি॥
আপনে আপনে কন্যা করয় বিলাপ।
কাহাতে কহিমু মুই মনের সন্তাপ॥
কোন্[১৩] বিধি পূর্বজন্মে দিল মোরে শাপ।
কিবা[১৪] উপনীত হৈল কর্ম[১৫]-ফল পাপ॥
হাহা বিধি কি কহিমু কারে দিমু দোষ।
মোর কর্মফলে পতি খর্ব কাপুরুষ॥
সৃজিয়া আপনে কেনে প্রজাপতি ভোর।
বলেহ না করো বিধি শুকে বকে জোড়॥

১ করতাল তাল কত তরল ২ উঠে সঙ্গে ৩ নৃপ ৪ দানে ৫ প্রসন্ন হৃদয় নিত্য সদায় আনন্দ
৬ ছিল ৭ হেথাতে ৮ মাকড়ের অঙ্গে যেন মুকুতার হার ৯ ঘোরে ১০ খবভ; (মূলে) (?) খব
১১ বিহ্বল ১২ (মূলে) কহে ১৩ কি এ; কেন ১৪ কি এ ১৫ (মূলে) পূর্ব

কোথা রতি কোথা কাম কোথা পত্নী পতি।
খঞ্জনে বায়সে কোথা একত্রে বসতি ॥
বয়সী চন্দ্রানী নারী বামন বিরস[১]।
ভস্ম শ্মশানেত দৈবে মজাইলু[২] পায়স ॥
কথঞ্চিৎ[৩] দুঃখে ক্লেশে নিশি হৈল শেষ।
প্রবোধ না পায় বালা বিলাপে বিশেষ ॥
সন্তাপে কহয় বালা মোর হৈল মইল[৪]।
উঠ উঠ সখী সব রজনী পোহাইল ॥
এ বলিয়া চন্দ্ররানী করয় ক্রন্দন।
জাগিল সকল সখী উঠিল বামন ॥
নিদ্রা হন্তে উঠি বীরে লৈল ধনুশর।
পশুবধে সিংহ যেন যায় বনান্তর ॥
ভার্যা ভাবে কুমারীকে না দিল উত্তর।
বচন সন্দেশ পুনি হইল দুষ্কর ॥
ধাই সঙ্গে মহাদেবী আসিয়া সত্বর।
কুমারীকে সন্তোষার্থে বুঝাই[৫] বিস্তর ॥
যদি প্রীতি না করে বামন মূর্খ শঠ।
ধাই গিয়া বুঝিবেক তাহার কপট ॥
মহাদেবী বচন শুনিয়া সে কুমারী।
গদ গদ নিবেদন্ত মর্ম আপনারি ॥
বারে বারে সখী পাঠাইনু তার ঠাঁই।
ধাই পাঠাইব পুনি পূর্ব[৬] প্রীতি চাই ॥
সখীগণ সঙ্গে তাকে পূজিনু বিস্তর।
বিদ্যাধরীগণে যেন পূজে পুরন্দর ॥
স্বামী ভাবে আপ্তভাব করি বহুতর।
সেবিনু তাহারে যেন প্রত্যক্ষ শঙ্কর ॥
মাতা পিতা[৭] তাকে মোকে দেখি একস্থানে।
নিজ পুরে[৮] প্রবেশিল মঙ্গল বিধানে ॥

তথাপিহ মোকে না কহিল দুই বচন।
আচৌক রমণী কেলি সুরতি শয়ন ॥
সহজে বর্বর পতি মূর্খ[৯] দুরাচার।
তার সনে মোহর সঙ্গম নাহি আর ॥
তাহার মোহর প্রেম সূত্র ছিন্ন[১০] ভাব।
অন্তে অন্তে আজি হন্তে হইল সন্তাপ ॥
মহিষী বলেন্ত শুনি কুমারী-বিষাদ।
রাজসুতা-কাতরতা রাজ্যের প্রমাদ ॥
বুঝিমু সকল মর্ম পাঠাইয়া ধাই।
এ বলিয়া মহাদেবী দিলেন পাঠাই ॥
ঝাটে চল ধাই তুমি বুঝিয়া রহস্য।
পরম বিরোধ, কিবা কার্যেত আলস্য ॥
মহিষী-আদেশ ধাই শুনিয়া সত্বর।
চলি গেলা যথাতে কুমার ধনুর্ধর ॥
কুমারে দেখিল যদি ধাইর বদন।
সম্ভ্রমে নোয়াই শির রহিল বামন ॥
বচনে পণ্ডিত ধাই হৃদয় বিষাদ[১১]।
কুমার সম্বোধি কহে কুমারী-সংবাদ ॥
যত ইতি মহিষী গঞ্জিলা জামাতারে।
সে সব কহন্ত ধাই, শুনয়[১২] কুমারে ॥
রাজবংশে জন্মিয়া না বুঝ হিতাহিত।
বলবন্ত হৈয়া কর বুদ্ধি বিপরীত ॥
রাখিতে না পার ভার্যা রতি-রস-ছলে।
পৃথিবী পালিবা কোন্ বীর্য-বুদ্ধি-বলে ॥
উদার চরিত্র হৈয়া পাতিলা প্রমাদ।
প্রাণসম ভার্যা সনে বাড়াই[১৩] বিবাদ ॥
মহাবলী বীর্যশালী হেন কর গর্ব।
রূপে সে বামন হৈলা বুদ্ধি কেন খর্ব ॥

১ নীরস ২ মজালুম ৩ (মূলে) কদাচিৎ ৪ কাইল ৫ বুঝায় ৬ পূর্ণ ৭ মাও বাপে
৮ পুরী ৯ মূঢ় ১০ শক্র-চিহ্ন ১১ (মূলে) বিষাদ ১২ শুনায়ে ১৩ বাড়াইয়া

বিপরীত বুদ্ধি হৈয়া পড়িলা সংশয়।
ছাড়িয়া নরেন্দ্র পদ বনেত লীলয়[১] ॥
বলে কোন্ কার্য, যদি না জানে উপায়।
ভাগ্যে রত্ন দিলে সেই খাইতে না পায় ॥
ভাগ্যে কোন্ কার্য, যদি না জানে উদ্যোগ।
তাল-ফল নহে জেনো[২] বায়সের ভোগ ॥
মহতের[৩] ভার্যা প্রাণ, সম দুই অন্তর[৪]।
প্রেম ভাবে গৌরী অঙ্গ[৫] প্রত্যক্ষ শঙ্কর ॥
ভার্যা হেতু পঞ্চ ভাই প্রবেশিল বনে।
জগৎ-মাধুরী ভার্যা পুরুষ কারণে ॥
ভার্যা বিনু পাটেত না শোভে নরপতি।
স্ত্রী বিনে পুরুষের কোথাতে বসতি ॥
মৎস্য যেন জিয়ে সুখে সুশীতল জলে।
সুপুরুষ[৬] পুলকিত সুকামিনী কোলে ॥
কাপুরুষ না শোভয় রমণী সম্পাশ।
লবণ উদকে নহে কুমুদ বিকাশ ॥
তুমি কেনে ভার্যা তেজ অবোধের প্রায়।
অক্ষয় অমৃত নিধি ঠেল দুই পায় ॥
যদি চাহ রাজপদ উন্নতি ঐশ্বর্য।
মানাই আপন ভার্যা সুখে ভুঞ্জ রাজ্য ॥
গুরুজন সুহৃদের ধরহ নিষেধ।
ভার্যার বিচ্ছেদ হেতু পাছে পাইবা খেদ ॥
বৃথা তুমি পড়িলা পুরাণ ইতিহাস।
না বুঝিলা রতি-শাস্ত্র স্ত্রী উপহাস ॥
যেই ভাল দেখ সেই কর নিরাতঙ্ক।
স্ত্রীকুলে না রাখিও পুরুষ-কলঙ্ক ॥

এ সব কহিল তোর[৭] মহিষী শাশুড়ী।
যথোচিত কর নিজ ধর্ম অনুস্মরি[৮] ॥
এতেক[৯] তোমার যোগ্য না হবে[১০] কুমারী।
মণ্ডূকের ভোগ কোথা অমৃত মাধুরী ॥
কুমারীহ তোমাকে কহিল পুনি পুনি।
পশুবধে কোন্ পুণ্য বুঝ মনে গুনি ॥
চন্দ্ররানী ঘরে থুই তুমি বনে মতি।
ছাড়িয়া রত্নের হার গুঞ্জাতে আরতি ॥
পশু হন্তে অধিক[১১] হও তুমি মূঢ় মতি।
ধন্য পশুজাতি সেহ না ছাড়ে দম্পতি ॥
যুবরাজ হৈয়া ব্যাধ-কর্মেত যতন।
গৃহকার্য না চিন্তিলা গুরুর গঞ্জন ॥
কোথা তোর[১২] ধর্ম কর্ম কোথা সুচরিত।
নপুংসক আকৃতি তুমি রমণী বর্জিত ॥
এথেকেহ লজ্জা নাহি কি বলিব আন।
তোর প্রতি দুন্দুমির[১৩] শব্দের নিশান ॥
পৃথিবী বিখ্যাত বীর বামনের ভার্যা।
অন্তর্গত শূন্য ফল যেন হীন মজ্জা ॥
যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা।
তস্করেত ধর্মকথা বেশ্যাকে ভর্ৎসনা ॥
বুদ্ধিশিখা ধাই সর্ব কর্মেত নিপুণ।
এক গুণ সংবাদ কহিল শত গুণ ॥
ধাইর বচনে বীর ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত।
মূর্খ দর্পে কহে কথা হৃদয় কম্পিত ॥
পৃথিবী জিনিল আমি[১৪] নিজ বাহুবলে।
স্ত্রী হৈয়া মোকে পুনি পুনি নিন্দা বোলে[১৫] ।

১ নিলয় ২ যেন ৩ মহন্তের ৪ (মূলে) অন্ধর ৫ অঙ্গে ৬ পুরুষেরো
৭ তব ; তোরে ৮ অনুসরি ৯ এ থেকে ১০ হএ ১১ খিক ১২ তব
১৩ দুন্দুভির ১৪ মুঞি ১৫ বলে

মোহর বচন ধাই শুন সাবধান।
বুদ্ধিশিখা ধাই তুমি জননী সমান॥
শাশুড়ীকে কৈও মোর সহস্র প্রণাম।
তাহান গঞ্জনা মোর প্রীতি[১] মনস্কাম॥[২]
করিমু প্রতিজ্ঞা ধাই তোমার বিদিত।
কুমারী-সম্পাশে আজু[৩] যাইমু নিশ্চিত॥
চন্দ্রানীকে অপরাধ ক্ষেমিতে[৪] বলিবা।
পুনর্বার হৈলে যেই জান সে করিবা॥
ধাই যদি শুনিলেক কুমার উত্তর।
সত্বরে চলিয়া গেল মহিষী গোচর॥
কুমারী মহিষী দোহে আছে সভা করি।
কহে ধাই বার্তা[৫] মহাদেবী নমস্কারি॥
তোমার গঞ্জনা আদি কুমারী সংবাদ।
একে একে শত গুণ[৬] কহিমুঁ তাহাত॥
তাকে[৭] না দেখিলুঁ ক্রীড়া চাতুরী-কারণ।
সর্বভাবে শুদ্ধমতি অবোধ বামন॥
শুদ্ধভাবে মহিষীকে জানাইল প্রণাম।
অপরাধ ক্ষেমিতে কহিল রানী-ঠাম॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীরে মোহর বিদিত।
চন্দ্রানী সম্পাশে অদ্য আসিব নিশ্চিত॥
ধাই মুখে মহিষী জামাতা-বার্তা শুনি।
নৃপতিকে কহে বার্তা অবসাদ গুনি॥
দুহিতা বিরহ রাজা শুনিয়া শ্রবণে।
রাজসুখ বিষ লাগে কুমারী কারণে॥
বৃদ্ধকাল হৈল মোর জীবন সংশয়।
কন্যা অনুযুক্ত[৮] নহে জামাতা দুর্জয়॥
ভুবন বিদিত বীর জানে সর্ব লোক।
জামাতা পালয় ভূমি মুই করি ভোগ॥
যাহার নামের শব্দে কম্পে শত্রুগণ।
নামে সে নৃপতি মুই ভূপাল বামন॥
মুখ্য বীর বামন বিখ্যাত মহীতলে।
তাহার প্রসাদে ভূমি ভুঞ্জি বৃদ্ধকালে॥
এত শুনি নৃপ আদেশিলা সৈন্যগণ।
আশু বাড়ি আন গিয়া জামাতা বামন॥
শ্রীযুত আশরফ খান বিনোদ ঠাকুর।
শুচিরুচি মন যেন হীরার মুকুর॥
মূর্তিময় রূপবন্ত[৯] রুচি ঘনশ্যাম।
পদে পদে পদ লৈয়া যাহার বিশ্রাম॥

বামন-চন্দ্রানীর সাক্ষাৎকার

নিকুঞ্জ খেলিয়া বীরে চলি গেলা[১০] সুমন্দিরে
লাগ না পায়ন্ত সেনা পাছে।
সন্ধ্যাকালে যেন সুর প্রবেশিল অন্তঃপুর
আচম্বিতে গেলা ভার্যা কাছে[১১]।

১ প্রতি, প্রীত ২ তাহান গঞ্জনে মোর প্রীত মনস্কাম ৩ আজি ৪ ক্ষমিতে ৫ ধাই বার্তা কহে
৬ একে দশ গুণ করি ৭ তাতে ৮ কন্যা উপযুক্ত; কন্যার সুযোগ্য ৯ মূর্তিমন্ত রূপ নব ১০ ভেল ১১ পাশে

স্বামীকে দেখিয়া রাণী অমৃত সংযোগ[১] বাণী
হাস্যমুখে পুছেন্ত কাহিনী।
তোমার চলন সাজ না দেখিয়ে[২] যুবরাজ
আগে পাছে যোগান বাহিনী ॥
কোথাতে চামর ধ্বজ পতাকা তুরঙ্গ গজ
দুন্দুভি বাজনা কোথা তোর।
কেনে একসর গতি আমার নিকটে রাতি[৩]
আচম্বিত যেন আইলা চোর ॥
না দেখি ভূষণ[৪] বাস রভস[৫] উল্লাস হাস
কহ কেনে বিষাদ[৬] প্রবন্ধ।
ভার্যা বড় অনুরাগে স্বামীতে উত্তর মাগে
না বোলয় স্বামী খর্ব-ছন্দ ॥
চাতুরী সুভেষ বালা জাগায় অনঙ্গকলা
অঙ্গে অঙ্গে পরশি বিশেষ।
রসপুরে রসবতী শুক্ররূপ যেন পতি
বৃষসঙ্গে রোহিণী বিলাস ॥
বুঝিয়া স্বামীর চিত চন্দ্রানী ভাবয় ভীত
বৃথা মোর আশা অভিলাষ।
নর রূপ করি বিধি পাষাণ নির্মিত যদি
তথাপি[৭] পাইতুম[৮] রস হাস ॥
বিধির কারণ কর্ম অন্ধ, কালা, খর্ব, জর্ম,
চেষ্টা বলে না হয় খণ্ডিত।
যাহার নির্বন্ধে[৯] রোগ ভোগয় যাবৎ ভোগ
অনুশোচ না করে পণ্ডিত ॥
এতেক চিন্তিয়া রামা ছাড়িয়া সঙ্গতি[১০] সীমা
করে কর হানয় আক্রোশে।
মূঢ় পতি বাম করি ধৈর্য ধর্ম অনুস্মরি[১১]
মন-করী রাখে প্রেমাঙ্কুশে ॥

১ সিকএ ২ দেখি যে ৩ পতি ৪ ভুবন ৫ সরস ৬ বিবাদ ৭ তাত কি
৮ পাইতু ৯ নির্বন্ধ ১০ সঙ্কেত ১১ অনুসরি

তবে বুদ্ধিশিখা ধাই কহয় কুমারী ঠাঁই
কর জুড়ে উপদেশ বাণী।
দেখিলা উদার কান্ত বুঝিলা তাহার অন্ত
খেদ পরিহর এথা জানি॥
ধাইর বচন শুনি সখী সনে চন্দ্ররানী
নিশি বসি করয় মন্ত্রণা।
চিন্তিয়া যে করে কাজ সভাতে না পায় লাজ
পাছে নহে কলঙ্ক-যন্ত্রণা॥
জাগে বালা পতি আশে[১] নয়ান ঘূর্ণিত শ্বাসে[২]
শয়ন করিল নিশি শেষে।
শয্যাগত দেখি নারী বামনে ধনুক ধরি
ব্যাধ যেন চলে পরিতোষে॥
শ্রীযুত আশরফ রাজসখা মনোভব
লস্কর-নায়ক গুণসার।
জ্ঞানবান্ দয়াসিন্ধু বৈদেশী জনের বন্ধু
রস-নিধি মহিমা অপার॥

বামনের বনগমনে চন্দ্রানীর খেদ

প্রভাতে বামন যদি চলি গেলা[৩] বন।
মাতৃস্থানে কহে বালা সন্তাপিত মন॥
লাজ ভয় কুমারীর গ্রাসিল মদনে।
জননী গোচরে কহে বিরহ বেদনে॥
স্বামিহীন বয়সীর কি ফল সংসারে[৪]।
বিফলে বঞ্চয় নিশা রমণী আহারে[৫]॥
স্বামিগুণ গণি গণি সীদতি[৬] অঙ্গনা।
হৃদে কামানল জ্বলে দক্ষিণে[৭] পবনা॥
বায়ু অগ্নি হৈল যদি কুমারীর বৈরী।
সুখাইব যৌবন-ধন না আসিব ফিরি॥
স্বামী লাগি[৮] বিরহেত চিত্ত সুখ হেতু।
কামাকুল সাগরে নারীর স্বামী সেতু[৯]॥

১ প্রতি আশে (প্রত্যাশায়) ২ লাসে ৩ ভেল ৪ সংসার ৫ বাহার
৬ সিদতি ৭ দক্ষিণ ৮ জাগে ৯ কেতু

সেই স্বামী যাহার সেই সে সুভাগিনী।
নিবারি বিরহ-শত্রু তোষিব রমণী ॥
এমত না হয় যদি স্বামি-ব্যবহার।
সহজে করিব শঠে শঠ সমাচার ॥
ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা।
বিদ্বানেত বিদ্যা কহি মূর্খেত মূর্খতা ॥
প্রেম নারী বশ করে রসিকের রসে।
যাহার যেমত ভাব করিব[১] বিশেষে ॥
রহস্য বুঝিয়া মাও কহিও[২] এথেকে।
শুকের সহিত ক্রিয়া[৩] না করয় বকে ॥
যেবা বলে বামন সে কিসের সমান।
সম্ভোগে[৪] শিশুর প্রায়, জ্ঞানে নহে আন ॥
পশুমত স্বামী মোর, বুঝিলুঁ ধরণ।[৫]
তা হস্তে মোহরে মাও তরাও এখন ॥
না মাগম্ কেলি কলা রতি রঙ্গ আশ।
পশু সঙ্গে মনুষ্যের কোন্ অভিলাষ ॥
মূর্খ স্বামী সঙ্গে ক্রিয়া সহস্র জঞ্জাল।
একাকিনী সময় গোঁয়াই সেই ভাল ॥
ভিন্ন এক মন্দির রচিয়া দেও মোকে।
সখীগণ সঙ্গে তথা থাকিমু কৌতুকে ॥
পুনি যদি তাকে মোকে করাও মিলন।
গরল ভক্ষিয়া মুই তেজিমু জীবন ॥
কুমারী প্রতিজ্ঞা যদি মহিষী শুনিল।
নৃপ অনুমতি এক[৬] গৃহ বিরচিল ॥
অপূর্ব সুন্দরী[৭]-গৃহ করিল[৮] নির্মাণ।
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় সুরপতি স্থান ॥

ফটিকের স্তম্ভ সব শোভে মনোহর।
নানা বর্ণ[৯] আচ্ছাদিল নেত পাটাম্বর ॥
মরকত পরিপূর্ণ বিরচিত বেড়া[১০]।
নৈশ আকাশে যেন[১১] নক্ষত্র পরম্পরা[১২] ॥
ব্যাল্লিশ দুয়ার কৈলা গৃহ চতুঃপার্শ্বে[১৩]।
অঙ্গ শীতলিত যেন মলয়া বাতাসে ॥
ব্যাল্লিশ দ্বারেত দ্বারী ব্যাল্লিশ কামিনী।
প্রতি এক দ্বারে শোভে দশ সুবদনী ॥
চারি সখি শোভে যেন এ চারি নক্ষত্র।
চন্দ্রানী-চন্দ্রের গুরু ধাই যেন শুক্র ॥
হেন মত শোভা করি রহিলা সুন্দরী।
কাব্য-রস-মন্ত্রে কাম-গরল নিবারি ॥
সতত সুস্বর নাদ মন্দিরা মৃদঙ্গ।
এহি যন্ত্র নাদে সে বিরহ-সৈন্য ভঙ্গ ॥
কুল লজ্জা অস্তম্পট করি নারী রহে।
দক্ষিণ পবনে যেন শরীর না দহে ॥
বৎসরেত দুই বার যায় দেব স্থানে।
না দেখে সুন্দর রূপ তপন[১৪] নয়ানে ॥
কুমারী গমন কাল দেখিয়া সময়।
দেখিতে নৃপতি সবে করয় উপায় ॥
যুবরাজ বীরগণ[১৫] যত বণিজার।
করে বহু চেষ্টা সে কুমারী দেখিবার ॥
ছোট বড় কিবা নারী পুরুষ সকল।
কুমারী দর্শন হেতু মরম বিকল ॥
রাজ-অলঙ্কার[১৬] শোভা তেজি রাজাগণ।
পন্থিকের ছলে সেই[১৭] রূপ নিরীক্ষণ ॥

১ কহিল ২ কহির ৩ ক্রীড়া ৪ সম্ভোগ ৫ পশুমত স্বামীর বুঝিলাম ধরণ ৬ লই
৭ সুন্দর ৮ করিয়া ৯ বর্ণে ১০ দ্বার ; ঘর (?) ১১ নিশীথাকাশে যেন ১২ পর পর
১৩ (মূলে) চতুর্পাশে ১৪ গগন ১৫ যুবরাজ গণ আর ১৬ অহঙ্কার ১৭ করে; আসে

দেখিতে দেখিতে রূপ না ভরে নয়ান।
রূপের মহিমা শুনি জুড়ায় পরান ॥
একদিন হৈল যদি পরব সময়।
ইচ্ছা কৈল চন্দ্রানী[1] যাইতে দেবালয় ॥
সুবর্ণের ধ্বজা ছত্র পতাকা বিমান।
আরোহিল চন্দ্ররানী চন্দ্রমা সমান ॥
আগে পাছে তারে বেষ্টি[2] সমস্ত কামিনী।
বিদ্যাধরীগণ যেন যোগান ইন্দ্রাণী ॥
প্রতি নারী অঙ্গে[3] রঙ্গ বিদ্যুৎ সঞ্চারি।
সুবিচিত্র পরিধানে[4] চলে মত্ত করী[5] ॥
বিচিত্র অঞ্চল উড়ে মধুর পবন।
মত্ত শিখী গতি যেন চাতুরী পেখন ॥
নানা বর্ণ নারী সবে রঙ্গ অভিলাষে।
চন্দ্রানীর সঙ্গে জাতি হাস্য পরিহাসে ॥
কার হস্তে চামর কাহার হস্তে ফুল।
কার হাতে নানা রঙ্গ গাহুল বিস্তোল ॥
হেন মতে শুভমস্ত করিয়া কুমারী।
দেবস্থানে প্রবেশিল লই সব নারী ॥
সেই দিন মুই ভক্তি নিশ্চয়[6] করিয়া।
রহিলুম দেবস্থানে সমাধি জুড়িয়া ॥
লস্কর আশরফ [সে] যে নায়ক প্রধান।
জ্ঞানে মহোদধি ধৈর্যে সুমেরু সমান ॥
বহুবিধ সৈন্য-পতি সভার তিলক।
প্রমোদ হৃদয়[7] নিত্য সুহৃদ-পালক ॥
যাবৎ অরুণ চন্দ্র সংসারে প্রসারে।
তাহান সুকীর্তি যশ রহুক[8] সংসারে ॥

যোগীর কন্যা-দর্শন

আমিহ সেদিনে পরব জানিয়ে
গেলুঁ দেবস্থান বরি[9]।
কালীর অগ্রেতে নিজ সমাহিতে
রহিলুঁ সমাধি জুড়ি ॥
সমাধি চরিত নাহি জানি রীত[10]
কে জানে তাহার মরম।
যে করে সমাধি হয় সর্ব সিদ্ধি
কি করিব কাল যম ॥
পরস্পর ভয় সব দূরে যায়[11]
গহিনে মজয় মন।

১ ইচ্ছা হৈল চন্দ্রানীর ২ চারু বেষ্টি ৩ সঙ্গে ৪ পরিধান ৫ করি ৬ নিশ্চয়া
৭ হৃদয়ে ৮ রহুক ৯ বলি ১০ হিত ১১ রয়

উর্দ্ধশ্বাস বয় পাড়িয়া মারয়
  কাম আদি বৈরী[১] গণ ॥
জ্ঞান সমুদ্রেত ডুবি মন চিত্ত[২]
  বিম্ব মত কায়া ভাসে।
নাহি মিলে স্থল হইয়া চঞ্চল
  মন বান্ধি সেই আশে ॥
নয়ন মুদিয়া পাতাল ভেদিয়া
  দৃষ্টি চন্দ্র মূলে করে।
স্থলে ডিম্ব রাখি জলে কূর্ম থাকি
  কূর্মে ডিম্বে দৃষ্টি ধরে ॥
মারি মায়াজাল জগৎ জঞ্জাল
  দশ দিশ[৩] করে দূর।
লক্ষ্য অন্তস্পট লজ্ঞি দেখ তট
  নির্মল চিত্তের মুকুর ॥
পরিণাম ভাল জানিয়া সকল
  রাখিলাম এই চিত।
একহি ভাবনা ভাবিতে আপনা
  লোক হন্তে হৈনু ভীত ॥
বাহির ভিতর দোহ সমসর
  তাতে নাহি দয়া মায়া।
সমুখে বিমুখে সূর্য জ্যোতি দেখে
  পরিচয় মন কায়া ॥
জ্ঞান-মদে মত্ত লৈয়া দেবী-পদ[৪]
  রূপেতে রহিনু ভুলি।
রানীহ সে ক্ষণ লই সখীগণ
  আইল দেবস্থানে চলি ॥
প্রদক্ষিণ করি রাজার কুমারী
  দেবী পাশে দাণ্ডাইল।

১ বীর ২ চিত ৩ দশা ৪ হৈয়া দেবী-পদ্ম

সাক্ষাতে পার্বতী জিনি[1] রূপ কান্তি
ধ্যানে দৃষ্টি মোর হইল ॥
অলক্ষিতে যেন কুমারী দর্শন
হইল মোর সঙ্কেত[2] ।
তিন রাত্রি দিন ছিনু সংজ্ঞাহীন
সেই স্থানে সমাধিত[3] ॥
লক্ষ্য[4] রূপ ধরি ধ্যানে দৃষ্টি করি
সাধিয়া যোগ কারণ ।
রূপ বিনে কৃষ্ণ বিন্দু[5] করে দৃষ্ট[6]
কঠিন সূর্য সাধন ॥
তেকারণে আজি আত্মা-রূপ ভজি
চিন পাইল যদি রূপী[7] ।
রূপাবৃত তত্ত্ব[8] স্থূল বর্ণ যত
রূপেতে আছয় গুপি ॥
যদি রূপ দেখে ধ্যানেতে প্রত্যক্ষে
সাফল্য হয় সমাধি ।
সেই রূপ-মূলে মুইহ ব্যাকুলে
ভ্রমিতে বেড়াওঁ[9] অবধি ॥
লস্কর উজির ধার্মিক সুধীর[10]
শ্রীযুত আশরফ খান ।
পরম সমাধি পূর্ণ রাজনিধি
সিদ্ধি-কর মনস্কাম ॥

১ জালি ২ (মূলে) সঙ্গতি ৩ (মূলে) সমাধিতি ৪ (মূলে) লক্ষ্মী ; অলক্ষ্য (?) ৫ বস্তু
৬ রূপ বিনে সৃষ্টি/বিন্দু করে দৃষ্টি ৭ রূপি=রূপই ৮ রূপ ব্রত তত্ত্ব ৯ বেড়াই ; বেড়াও
১০ (মূলে) শরীর

যোগীর বিবরণ ও লোরের গোহারি যাত্রা

তিন দিন রাত্রি মুই সংজ্ঞাহীন মতে।
মৃত প্রায় আছিলুম দেবীর অগ্রেতে॥
সেই রূপ দেখি মোর মতি ভোলে নিত।
ভূমিগত তিন দিন আছিনু মূর্চ্ছিত॥
মোহিত দেখিয়া তথা দেবস্থানী লোক।
চৈতন্য করাই পাছে পুছিল মোহক॥
কহ কেনে তোমার বিভোল চিত্ত-মতি।
কোথা দেব-সেবা তোর তপস্যা ভকতি॥
কোথাতে সমাধি তোর যোগ[1] মন্ত্র ধ্যান।
মূর্চ্ছাগত দেখি যেন অবোধ অজ্ঞান॥
দেবস্থানী লোকে বহু গঞ্জিল মোহরে।
ভিন্ন জন পরাভব না সহে শরীরে॥
ধ্যানেতে দেখিনু দেবী-রূপ যেন[2] মতে।
জ্ঞান ধ্যান সব হরি নিল আচম্বিতে॥
পরব দিনেত যত্নে এহি দেব-স্থানে।
সমাধি জুড়িয়া রহি দেবী বিদ্যমানে॥
মহামন্ত্র আহুতিয়া করিনু তর্পণ।
প্রসন্ন হইয়া দেবী দিল দরশন॥
কান্তিময় দিব্য রূপ মহা দীপ্তিমান্।
সাক্ষাতে অম্বিকা যেন কৈনু অনুমান॥
অন্তর্ধান হৈল রূপ নিমেষে দেখিতে।
তুরিত[3] চপলা হেন উদিতে লুকিতে॥
সফল করিনু মুই তপ মন্ত্র জ্ঞান।
আচম্বিত হেন রূপ দেখি বিদ্যমান॥

নয়নে সিঞ্চিয়া মধু হরিলেক চিত।
তেকারণে দেখ মোরে বেকত মূর্চ্ছিত[4]॥
তবে সে সকলে বলে করিয়া আক্রোশ।
যোগী হই না চিনিলা দেব কি মানুষ॥
নহে নহে দেবী-রূপ নহেত রুদ্রাণী।
অদ্‌ভুতা রাজসুতা চারু[5] সে চন্দ্রানী॥
বৎসরেত দুই বার পরব সময়।
সখীগণ সঙ্গে কন্যা আইসে দেবালয়॥
অনুমানে বুঝি সেই রাজার কুমারী।
দেবী প্রণামিতে[6] দৃষ্টি পড়িল তোমারি॥
চন্দ্র-সম জ্যোতিয় বেষ্টিত-তনু বালা।
তোমার মনেত হৈল সে সর্ব-মঙ্গলা॥
চন্দ্র সূর্যে না দেখে যাহার বদন।
নয়নে দেখিলা তুমি সাফল্য জীবন॥
বড় বড় রাজা সবে তেজি রাজ-সুখ।
বৃথা ধর্ম্ম রূপ ধরে দেখিতে সে মুখ॥
যে দেখিলা সেই রূপ আঁখি ধন্য মানি।
কারো শক্তি দেখিতে না[7] পায় চন্দ্ররানী॥
চারি যুগ বঞ্চ যদি এই দেবালয়।
পুনি না দেখিবা তুমি সে রূপ নিশ্চয়॥
তবেহ[8] সে সব বাণী মনে না ধরিনু।
সে রূপ দর্শন হেতু তথাতে রহিনু॥
রূপ থাক না দেখিনু ছায়ার আকৃতি।
চিরদিন তথাতে পূজিনু প্রজাপতি॥

১ যোগ্য ২ হেন ৩ ত্বরিত : তড়িৎ ৪ এত মোহশ্চিত ৫ (মূলে) চারু অদ্‌ভুতা রাজসুতা
৬ প্রণমিতে ৭ কার শক্তি দেখিতে যে (সে) ৮ তবুহ

যবে তারি[১] রূপ-মদ আঁখি কৈল পান।
জপ তপ সমাধি না লয় মনে আন॥
চিত্তের নয়নে রূপ দেখি অনুক্ষণ।
কর্মফলে না পাইনু তান দরশন॥
শুবে ধ্যানে যেই রূপ দেখিনু বিদিত।
চিত্র-পটে সেই রূপ পোতল লিখিত॥
বিচিত্র পোতল[২] পট সেই হেতু ধরি।
এক তিল না দেখিলে আপনা পাসরি॥
দেখিতে দেখিতে রূপ ভ্রমি দিগন্তর।
আর না দেখিনু রূপ তার সমসর॥
বনে আইনু মনস্তাপ দূর হৈব জানি।
এথাতে দেখিনু তুমি রূপে রাজ-মণি॥
রূপ দেখি রূপের স্মরণ হৈল মনে।
চন্দ্রানী তোমার যোগ্য বুঝি অনুমানে॥
পুরুষের মধ্যে তুমি রূপে স্বরপতি।
স্ত্রীর[৩] মধ্যে চন্দ্ররানী শচী[৪] কলাবতী॥
চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥
যে কিছু পুছিলা তুমি কহিলাম তত্ত্ব।
এক মুখে কি কহিমু সে রূপ-মহত্ত্ব[৫]॥
বাউলে কহিল যদি রহস্য সকল।
রূপের মহত্ত্ব[৬] শুনি নৃপতি বিকল॥
পুনি পুনি পুছে রাজা যোগীকে কাহিনী।
কেমত দেখিমু মুই কামের কামিনী॥

আজু হন্তে গুরু তুমি কহ উপদেশ।
কোন বুদ্ধি পাই[৭] চন্দ্র গোহারি উদ্দেশ॥
রাজ্যে মোর কার্য নাই হৈমু দেশান্তরী।
সর্বথা যাইমু যথা[৮] চন্দ্রানী গোহারি॥
রাজার বচনে যোগী কহে আগুসারি।
মোর সঙ্গে চল তুমি মোহরা নগরী॥
পুণ্যফলে সাধো কার্য সিদ্ধি সর্ব স্থান।
সত্য রীত[৯] বীর্যশালী তুমি পুণ্যবান্॥
দেখিয়া চন্দ্রানী সিদ্ধি হৈব মনোভব।
পৃথিবীতে কিছু নাহি তোমার দুর্লভ॥
যোগীর বচনে রাজা হরিষ বিশেষ।
সৈন্য সব সজ্জা হৈতে করিল আদেশ॥
চলচল শব্দ হৈল মঙ্গল বিধান।
চন্দ্রানী উদ্দেশে রাজা করিল পয়ান॥
আগে যোগী সঙ্গে রাজা, পাছে দল বল।
চলিতে চলিতে পাইল গোহারি-মণ্ডল॥
লোরক আইল শুনি মোহরা-নৃপতি।
অভ্যাগত জানি রাজা করিল ভকতি॥
রাজনেতে[১০] গৃহ দিল বহু উপহার।
অন্নে অন্যে করিলেন্ত বিবিধ বেভার[১১]॥
শ্রীযুত আশরফ নায়ক প্রধান।
নানা শাস্ত্র কাব্য রসে করে অবধান॥
তাহান সুকীর্তি[১২] যশ অমৃত বিধান[১৩]।
পূর্ণ ঘট করি পিব সকল সুজ্ঞান॥

১ ধরি ২ পোতলি ৩ নারী ৪ শশী ৫ মাহাত্ম্য ৬ মাহাত্ম্য ৭ বলে
৮ তথা ৯ ব্রত ১০ রজনীতে; রাজরীতে ১১ বেপার ১২ সুকৃতি ১৩ সমান

চন্দ্রানীর লোরক দর্শন

গোহারি দেশেতে আইলা লোরক নৃপতি।
সৈন্য সঙ্গে তথা রহে যোগীর সঙ্গতি॥
রাতদিন লোরকের অহি সে ভাবন।
কেমনে দেখিতে পাই চন্দ্রানী-বদন॥
তবে সে নয়ন শান্ত খণ্ডে মন-ক্লেশ।
সে মুখ দর্শনে মোর সাফল্য বিশেষ॥
কঠিন নির্জন স্থানে চন্দ্ররানী থাকে।
বিক্রম উপায়ে কেহ না দেখে তাহাকে॥
দুস্তর[১] দেয়াল উচ্চ গিরি-শৃঙ্গ-সম।
যথা বৈসে চন্দ্ররানী সে পন্থ দুর্গম॥
নগরে ভ্রময় যদি রক্ষীতে[২] বেড়িয়া।
দণ্ডকের পন্থ লোক[৩] খেদায় মারিয়া॥
এক দুই তিন করি মাস হৈল ছয়।
না পাইল কুমারীর দর্শন সময়॥
হেন মতে হৈল যদি বৎসর পূরণ।
বৃদ্ধ রাজে বাত্তিলেক যত রাজাগণ॥
অব্দে দুই বার অভ্যাগত সকলেরে।
সভা রচি বৃদ্ধ রাজে নিমন্ত্রণ করে॥
মোহরা নগরে যত নৃপতি বৈসেন্ত।
নিমন্ত্রণ বার্তা শুনি সকলে[৪] আনন্দ॥
যাহার যেমত যোগ্য[৫] সাজিল বিশেষ।
নানা রঙ্গ[৬] অঙ্গরাগ পরিধান ভেশ[৭]॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ দিব্য রথে।
চলিলেন্ত যাহার যে নিজ মনোরথে॥
লোরকেহ আপনা[৮] করিয়া চারু সাজ।
চলিলা গন্ধর্ব যেন নরের সমাজ॥
যত রাজা সভাতে মিলয় একে একে।
প্রাসাদ-গবাক্ষে থাকি চন্দ্ররানী দেখে॥
যাহার নির্বন্ধ যেই না যায় খণ্ডন।
লোররাজ-রূপ হৈল[৯] চন্দ্রানী-নয়ন॥
রূপ দেখি চন্দ্রানী বিস্ময় হৈল মনে।
দেব কি গন্ধর্ব কিছু না বুঝে ধরণে[১০]॥
দেখিতে দেখিতে বালা হৈল অচেতন।
কি হৈল কি হৈল করি ধায় সখীগণ॥
মহাদেবী সঙ্গে ধাই আইলা সত্বর।
কুমারী কুমারী শব্দ বাহির অন্দর॥
অন্তস্পুরে[১১] রোল হৈল উদধি-তরঙ্গ।
ব্যগ্র হৈল বৃদ্ধরাজ সভা হৈল ভঙ্গ॥
সভাভঙ্গে মনোভঙ্গ[১২] হৈল রাজগণ।
যার যে শিবিরে গেলা বিষণ্ন বদন॥

১ দুষ্কর ২ রক্ষীকে ৩ দণ্ড করি পন্থ লোকে ৪ সকল ৫ সাধ্য ৬ রঙ্গে
৭ বেশ ৮ আপনে ৯ দেখে ১০ ধারণে ১১ অন্তঃপুরে ১২ মনাভঙ্গ

চন্দ্রানীর দুঃখ ও ধাই কর্তৃক প্রবোধ দান

চিন্তে যোগী সনে রাজা বৎসর পুরিল।
তথাপিহ কুমারী-দর্শন না মিলিল ॥
অনুশোচে লোরক পোতল রূপ হেরি।
লভ্যের কারণে মুই হারাইলুঁ কড়ি ॥
নিজ ধন তেজি পর ধন করে আশ।
পম্বলের (?)[১] পুষ্প যেন সুখ অভিলাষ ॥
নিজ নারী তেজি পর নারী করে লোভ।
অবশ্য লাঞ্ছনা হয় কার্যেত অশুভ ॥
নৃপ হই রাজ্য তেজি পর রাজ্যে বাস।
নৌকা ভঙ্গে ডুবে যেন[২] তরিবারে আশ ॥
দৈবে মোর হৈল হেন দুই কুল হানি।
তেজি আইলুঁ ময়নাবতী না পাইলুঁ চন্দ্রানী ॥
চন্দ্রানীর রূপ ভাবি লোরক ফাঁপর।
বিদ্যা-রসে মগ্ন যেন বৈদেশী সুন্দর ॥
রূপ কল্পি কল্পি লোর চিন্তায় আকুল।
সেরূপ চন্দ্রানী তার[৩] মনেতে ব্যাকুল ॥
যে অবধি কুমারকে দেখিল কুমারী।
মন বান্ধা দিয়া তনু লই গেল হরি ॥
সখিগণ সঙ্গে বালা না করে মিলন।
তেজিল ভূষণ[৪] ভোগ অঙ্গের চন্দন ॥
মলিন চিকুর সব মলিন অম্বর।
দিবস-চন্দ্রমা যেন বদন ধূসর[৫] ॥
না খায় তাম্বূল না করয় জলপান[৬]।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু নিশ্চল নয়ান ॥
কার সঙ্গে কিছু মাত্র না কহে কথন।
চিত্তেত কল্পয় সেই রূপ অনুক্ষণ ॥
শীতল শয্যাতে নিদ্রা না আইসে নয়নে।
ক্ষণে আলাপয় ক্ষণে বিলাপে আপনে ॥
বসিলেহ শান্ত নহে[৭] উন্মত্ত চরিত।
দিবা রাত্রি সুন্দরী চকিত বিলোকিত ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে বিলাপে মন্দিরে।
স্থির নহে পদ-গতি ঢলি ঢলি পড়ে ॥
কুমারীর চরিত্র দেখিয়া সখীগণ।
অনুমানে বুঝিতে না পারে কোন জন ॥
কেহ বলে দেব-দৃষ্টে[৮] পড়িল কুমারী।
কেহ বলে গন্ধর্ব সহিতে ক্রিয়া নারী[৯] ॥
কেহ বলে অন্তরীক্ষ হস্তে বিদ্যাধরে।
কুমারী সহিত নির্জনেতে [১০]ক্রীড়া করে ॥
কেহ বলে বায়ু-ব্যাধি, হইল উন্মত্ত।
মর্ম [১১]কেহ না বুঝিল কুমারীর তত্ত্ব ॥
বড় চিন্তা পায় ধাই মনে বিকলতা[১২]।
কন্যার চরণে ধরি পুছে মর্ম কথা ॥
কহ চন্দ্ররানী তুমি কেনে দুঃখ-মতি[১৩]।
ভুবন বিখ্যাত বীর তোর[১৪] নিজ পতি ॥

১ (মূলে) সম্লোলের (? ২ জনে ৩ সে রূপ চন্দ্রমা হেরি; সে রূপ-চন্দ্রে চকোর ৪ ভুবন ৫ দোসর
৬ জল না করয় পান ৭ শান্তি নাহি ৮ দৃষ্টি ৯ তারি ১০ নির্জনেতে কুমারী সহিত
১১ মর্মে ১২ ব্যাকুলতা ১৩ দুঃখমতী ১৪ তোর হবে

ছত্রধারী পিতা তোর জননী মহিষী।
চন্দ্ররানী কোন্ দুঃখে হও দিন-শশী ॥[১]
শিশু হস্তে তোকে মুই করিলুঁ পালনা[২]।
মোকে কেনে গুপ্ত মর্ম অন্তরে বেদনা[৩] ॥
প্রথমে জন্মিলা যবে এই মহীতলে।
নাভি ছেদ তোমার করিলুঁ কুতূহলে ॥
কোলে করি যত্নে ধরি দিলুঁ স্তন-পান।
মোর হৃদে শয্যা তোর মলমূত্র-স্থান ॥
দ্বিতীয় বরষী যদি হইলা সুন্দরী[৪]।
সুবর্ণ পোতল যেন ভ্রমি কান্ধে[৫] করি ॥
তবে যদি পূর্ণ হৈল চতুর্থ-বরষী।
শাস্ত্র অভ্যাসিতে সঙ্গে থাকি অহর্নিশি ॥
এখনে হইল তোর প্রথম যৌবন।
ছায়া প্রায় সঙ্গে তোর থাকি অনুক্ষণ ॥
দাসী হস্তে বিশেষ করিলুঁ ধাই-পনা[৬]।
মোকে কেনে গুপ্ত মর্ম অন্তরে বেদনা ॥
ছোট শক্তি মোকে না জানিও চন্দ্ররানী।
বিবিধ উপায়,[৭] সিদ্ধি, সর্ব কলা জানি ॥
আমা হস্তে তোর আপ্ত আর কেবা আছে।
মোকে না কহিলে ক্লেশ পাইবা পুনি পাছে ॥
সত্য কহ কাহাকে [৮]মজিল মন তোর।
যদি হয় সিদ্ধা, বিদ্যাধর, সুরাসুর ॥
মহামন্ত্র আহুতিমু আকর্ষণ বলে।
সুরাসুর গন্ধর্ব আনিমু ক্ষিতি-তলে ॥
গন্ধর্ব কি[৯] পিশাচ কিন্নর জৈক্ষ[১০] ভূত।
ঘণ্টা মধ্যে বান্ধি দিমু দেখিবা অদ্‌ভুত ॥

এ সকল বিনে যদি হয় আন জন।
তুমি সে ঘৃণায় তাকে না করিবা মন ॥
ধাঁই মুখে শুনি বালা উপদেশ বাণী।
ভরসা পাইয়া মনে গুণে চন্দ্ররানী ॥
মাতৃ হস্তে ধাই মোর অধিক পালিতা।
সখীগণ হস্তে ধাঁই বিশেষ সঙ্গিতা ॥
মোহর আনন্দে ধাই জুড়ায় নয়ান।
মোহর বেদনে ধাই মরণ সমান ॥
নিদান সময়ে ধাঁই প্রাণের দোসর।
ধাই সম বন্ধু নাহি ভুবন ভিতর ॥
ধাই হস্তে মোর কার্য গোপ্ত না যুয়ায়।
ধাই বুদ্ধি কার্য সিদ্ধি হৈব সর্বথায় ॥
এতেক চিন্তিয়া রামা কার্যের কুশল।
ধাই স্থানে কহে মর্ম বেদনা সকল ॥
শুন ধাই কহি সত্য বেদনা আপন।
আচম্বিতে রূপ এক দেখিল[১১] নয়ন ॥
নিমন্ত্রণ করিলেক পিতা মহারাজ।
তখনে মিলিল তথা নৃপতি-সমাজ ॥
তথাতে দেখিলুঁ এক যুবক সুন্দর।
রূপে পঞ্চশর কিবা হুর[১২] বিদ্যাধর ॥
সে অবধি মোর প্রাণ নাহি মোর অঙ্গে।
মোর মন জ্ঞান গেল সে পুরুষ সঙ্গে ॥
তেকারণে দেখ মোরে অধিক চঞ্চল।
মুখে না আইসে বাণী হৃদয় বিকল ॥
সেই ভাবে হৈলুঁ মুই উন্মত্ত ফাপর।
মন বিনে তনু যেন মৃত্তিকা-পাঞ্জর[১৩] ॥

১ কোন্ দুঃখে দিনে দিনে মসী ২ পালন ৩ বেদন ৪ (মূলে) সোন্দরী ৫ স্কন্ধে ৬ পানা ৭ উপায়ে ৮ কাহাতে ৯ নতু গন্ধর্ব ১০ যক্ষ ১১ (মূলে) দোখলু ১২ সুর ১৩ পিঞ্জর

সেই রূপ স্মরি মোর সন্তাপিত মন।
নিশ্চয়[১] কহিলুঁ ধাই মর্ম্মের বেদন ॥
পুনি যদি তাকে মুই দেখম্ নয়নে।
জ্ঞান বুদ্ধি বল মোর জন্মিবে তখনে ॥
তবে ধাই পুনি বলে শুন চন্দ্ররানী।
কাহাকে দেখিলা তুমি নির্ণয় না জানি ॥
যাকে তুমি দেখিলা সে না দেখিল তোরে।
তাকে দেখা দাও যেন দেখি ভোলে তোরে ॥
প্রথম যৌবন বালা কলিকা[২] বয়সী।
হেমন্তে[৩] পুষ্পের গন্ধ অঙ্গেত পরশি ॥
বিমল কমল[৪] দেহ গন্ধ[৫]-ভরপুরা।
মাধুরী দেখিয়া লোভে আসয় ভ্রমরা ॥
তোর রূপে সুরাসুর মুনি মন টলে।
কার শক্তি ধৈর্য ধরিবেক[৬] মহীতলে ॥
দরশন হয় যদি তাহার তোহর।
সহজে চন্দ্রমা তুমি সে হৈব চকোর ॥
রশ্মি-লোভে চকোরে না এড়ে চন্দ্র পাশ।
চন্দ্র বিনে চকোরের জীবন বিনাশ ॥
তো হস্তে তাহার হৈব সহস্র যাতনা।
দেখা দিয়া বুঝ বালা পিরিতি কেমনা ॥
চন্দ্রানী বলয় ধাই বল অনুচিতে।
বহু লোক দেখিব তাহাকে দেখা দিতে ॥
ধাই বলে পুনি তুমি কর নিমন্ত্রণ।
সভা করি বার্তি আন যত রাজাগণ[৭] ॥
তখনে রচিব[৮] আমি তাহার সন্ধান।
তাহার তোমার দৃষ্টি না দেখিব আন ॥

তবে সভা সুন্দরী রচিল অনুপাম।
যেন সভা[৯] কামাকুলী[১০] বিশ্রামের ঠাম ॥
যথ ইতি রাজা বৈসে মোহরা নগরে।
বার্তিল তাম্বুল দিয়া প্রতি ঘরে ঘরে ॥
রাজা সবে শুনিয়া কুমারী-নিমন্ত্রণ।
শ্রবণে আনন্দ বাড়ে পুলকিত মন ॥
লোর আদি যুবা বৃদ্ধ যত রাজাগণ[১১]।
কৌতুকে চলিয়া যায় চন্দ্রানী-ভবন ॥
একে একে রাজা সব রূপের[১২] গন্ধর্ব।
লোর রাজা আইল যেন দ্বিতীয় কন্দর্প ॥
সবে[১৩] মহা বীর্যশালী বিক্রমে নিপুণ।
রূপে গুণে অস্ত্রে শাস্ত্রে[১৪] কেহ নহে উন ॥
হেন মতে সভাতে বসিল সব রাজ।
স্বর্গেত শোভয় যেন গন্ধর্ব-সমাজ ॥
অন্ন ভুঞ্জি রাজা সব আনন্দিত মন।
কর্পূর তাম্বুল সব করয় ভক্ষণ ॥
হরিষে বসিয়া বালা গবাক্ষের রন্ধ্রে।
ধাইকে ধরিয়া দেখায় নৃপ লোরকেরে ॥
লোর-রূপ দেখি ধাই চিত্ত হৈল শান্ত।
নয়ন আনন্দ যেন দেখি[১৫] কুল-কান্ত ॥
মনে মনে চিন্তে[১৬] ধাই দর্শন-কারণ[১৭]।
কোন্ মতে কুমারী দিবেক দরশন ॥
বসিছেন রাজা সব মণ্ডলী-স্বরূপ।
কুমারীর দ্বার[১৮] রহে লোর পৃষ্ঠ-গোপ ॥
কস্তুরী সুগন্ধি সব বহু পরিমল।
কুমারী পাঠাই দিলা বরিতে সকল ॥

১ নিশ্চিত ২ বালিকা ৩ হেমাঙ্গ, বসন্তে (?) ৪ (মূলে) বিমলা কমলা দেহ ৫ গন্ধে
৬ ধরি রবে ৭ রাজগণ ৮ করিব, সে দিব ৯ জন সভ ১০ কামাকুল ১১ রাজগণ
১২ রূপেতে ১৩ সব ১৪ শস্ত্রে ১৫ নয়ন আনন্দে যেন দেখে ১৬ চিন্তা ১৭ দর্শন-করণ
১৮ দ্বারে

নানা পুষ্পমালা আর আগর চন্দন।
কৌতুকে নৃপতি সবে করন্ত ভূষণ॥
প্রমোদিত সভা সব সুগন্ধির বাসে।
হরিষ ভ্রমরা-পাঁতি যেন মধু-রাশে[১]॥
সভার আনন্দ যেন হরিষে[২] দেখিল।
সময় বুঝিয়া ধাই উপায় চিন্তিল॥
কাজি দৌলৎ আর শ্রী[৩]আশরফ খান।
লস্কর উজির তাতে সহস্র[৪] গুণবান্॥

দর্পণে চন্দ্রানীর রূপ-দর্শনে লোরের মূর্চ্ছা

সভার সময় পাই উপায় রচিয়া ধাই
বুদ্ধিশিখা শিখাওন্ত[৫] কাজ।
নব রত্নে বিরচিত দর্পণ এক সুরচিত
পাঠাইয়া দিল সভা-মাঝ॥
অপূর্ব মুকুর শোভা যেন দিনমণি-প্রভা
প্রজ্জ্বলিত হীরার দর্পণ।
বৃদ্ধ যুবা রাজাগণ[৬] দর্পণেত হৈল মন
নিজ রূপ দেখে ঘন ঘন॥
এক হস্তে লই একে ছলে বলে কেহ দেখে
দর্পণেতে হুলাহুলি করে।
তবে লোরে লই করে আপনা বদন হেরে
দেখে ধাই গবাক্ষের রন্ধ্রে॥
লোর করে দরপন দেখি ধাই তত্ক্ষণ
বলে বালা দেও দরশন।
তোর প্রতিরূপাকার[৭] দর্পণেত অবতার
দেখি হৈব লোরক মোহন॥
শুনিয়া ধাইর বাণী তুরমান চলে রানী
দ্বার মেলি[৮] দরশন দিল।
সেই রূপ রেখাকার[৯] চন্দ্ররানী অবতার
লোর-করে দর্পণে উগিল॥

১ আশে, মাসে ২ হরিষ ৩ কহন্ত ৪ বহু, শত ৫ শিক্ষাবন্ত ৬ রাজগণ
৭ প্রীতি রূপাকার ৮ খুলি ৯ একাকার

দেখিয়া অপূর্ব রূপ   দর্পণেত সেইরূপ[১]
ফিরি লোরে চাহে চারিভিত।
দেখিলা মহিষী[২] রামা   রূপে যেন তিলোত্তমা
বিম্ব[৩] যেন দেখিতে[৪] লুকিত॥
দেখিয়া যে[৫] রূপ সাজ   আচম্বিত যুবরাজ
মোহশ্চিত পড়ে সভা-মাঝ।
হাহাকার করে লোক   সর্বলোক ভাবে শোক
না জানি কি হৈল লোর-রাজ॥
লোরক মূর্চ্ছিত[৬] জানি   অন্তস্পুরে[৭] চন্দ্ররানী
শত গুণ উত্তাপ শরীর।
বহুত প্রযোগ[৮] যত্নে   সান্তাইয়া বহু জনে
লোর লই গেলেন্ত শিবির॥
শিবিরে আইলা লোর   রূপ-মদে মতি ভোর
নিশি দিশি নাহি পরিচয়।
ক্ষণে কাঁপে কলেবর   দগধে মদন-শর
জীব[৯] কি না মানয় সংশয়॥
ভাবিয়া সে কলাবতী   উনমত্ত[১০] নৃপ-মতি
অনুক্ষণ বিলাপি গোঁয়ায়।
প্রথম দর্শন-প্রীতি   মধু হস্তে মধুবতী
না দেখিলে প্রাণী[১১] না ধরায়[১২]॥
কি দেখিলুঁ ধিগদৃষ্ট[১৩]   নয়নে লাগিল মিষ্ট
না দেখিলুঁ নয়ন ভরিয়া।
হেরিতে হারাইলুঁ নিধি   পুনি যদি মিলায় বিধি
মানাইমু পঞ্চ প্রাণী দিয়া॥
অনুশোচ লোর পতি   কোন মতে অব্যাহতি
হৈব মোর কুমারী দর্শন।

১ যেঁই রূপ ২ মহেশ ৩ বিম্বু ৪ চকিতে ৫ সে ৬ (মূলে) মুশ্চিত ৭ অন্তঃপুরে
৮ প্রয়াস ৯ জীবে ১০ উনমত ১১ প্রাণ ১২ ধরয়, যুরায় ১৩ ধিক্ অদৃষ্ট

অন্তস্পুরে[১] রাজসুতা দণ্ডে দণ্ডে পুছে বার্তা
ধাই স্থানে পুছে বিবরণ ॥
শোকাকুলী বিকলতা[২] লোর আর রাজ-সুতা
এক হস্তে এক নহে উন।
অন্তে অন্তে ভাবি নেহা দিনে দিনে ক্ষীণ দেহা
শরীরে ভেদিল[৩] কামাগুন ॥
অনুতাপে চন্দ্ররানী মীন যেন জল বিনি
সুমন্দিরে চিত্ত নহে স্থিত।
দিবসে উন্মত্ত ভেশে[৪] রজনী বঞ্চয় ক্লেশে
ধাই-মুখে শুনে[৫] নিজ হিত ॥
ধাই বলে চন্দ্রমুখী তোমা হতে লোর দুঃখী
দুঃখী সে দুঃখীর মর্ম জানে।
স্মরিতে তোমার গুণ, লোরকের দশ গুণ
অন্তর ভেদয় কাম-বাণে ॥
রাজকুলে জন্ম বালা ধৈর্য ধর্ম না চিন্তিলা
পাসরিলা জাতি কুল লাজ।
তোর কাতরতা হেরি হাসিবেক নর নারী
কি মুখে বসিবা সভা-মাঝ ॥
বহুল সন্ধান যোগে লোর দেখাইলুঁ তোকে
এথেকেহ তোর ক্ষেমা[৬] নাই।
পরিণাম চিন্ত কাজ[৭] পাছে যেন নহে লাজ
ক্ষুধা হৈলে দু হস্তে না খাই ॥
অসম্ভব মনে ভাব[৮] উপায় সে হয় সব[৯]
বৈভবে বিক্রমে কিছু নহে।
দেখ ধৈর্য পরিহরি অনলে পতঙ্গ পড়ি
বিফলে সুরঙ্গ-দেহ দহে ॥
ক্রোধ করি চন্দ্ররানী ধাইকে বলয় পুনি[১০]
তুমি কি না জানো মোর মর্ম।

১ অন্তঃপুরে ২ বিহ্বলতা ৩ শরীর দহিল ৪ বেশে ৫ শুনি ৬ ক্ষমা, ক্ষান্তি
৭ চিন্তি কাজ, চিন্ত আজ ৮ মনোভব ৯ উপায় সেহ সম্ভব ১০ শুনি

যে হয় মদন-দাস　　　জাতি কুল সর্বনাশ
　　প্রেমানলে[১] দহে লজ্জা ধর্ম ॥
ধাই বড় বিচক্ষণ　　　বুঝিয়া[২] কুমারী-মন
　　লোর বিনে চিত্ত নহে শান্ত।
কুমারীর হিত চাই　　　আপনে চলিল ধাত্রি
　　যথাতে বসয় লোর কান্ত ॥
ধাত্রি যদি গেল তথা　　　দ্বারী গেল নৃপ যথা
　　নৃপ-স্থানে করে নিবেদন।
এক বৃদ্ধা কোথা হৈতে　　　রহিয়াছে দ্বারপথে
　　মাগয় নৃপতি-দরশন ॥
এত শুনি রাজ্যেশ্বর　　　কহে আন বৃদ্ধবর
　　কিবা কাজে আইলা বৃদ্ধা নারী।
দ্বারী রাজ-আজ্ঞা পাইল　　　বৃদ্ধা নারী হাকারিল
　　আইস বৃদ্ধা নৃপ অন্তঃপুরী ॥
দ্বার[৩]-পাল আজ্ঞা পাইল　　　বৃদ্ধা নারী লৈয়া আইল
　　প্রবেশিলা শিবিরে ত্বরিত[৪]।
রাজায় দেখিয়া বৃদ্ধা　　　লঘু লঘু পুছে বার্তা
　　কহ কিসে আইলা পুরীত ॥
তোমাকে না চিনি আমি　　　জাতি কুল কহ তুমি
　　কিবা নাম কোথাতে বসতি।
শুন মহারাজ লোর　　　ব্রতশীলা নাম মোর
　　বৈদ্যকুলে আমার উৎপত্তি ॥
করিয়ে[৫] বৈদ্যালি কাজ　　　বসতি গোহারি মাঝ
　　শুনি আইলুঁ মহিমা তোমার।
যত রোগ ব্যাধি জ্বালা　　　ঔষধে করিমু ভালা
　　মর্মে পীড়া না রহয় আর[৬] ॥
শুনিয়া বৈদ্যের বাণী　　　হাসি বলে লোর পুনি
　　তুমি কি জানিবা মর্ম-ব্যথা।

১ কামানলে　২ বুঝিল　৩ (মূলে) দ্বারী　৪ (মূলে) ললিত　৫ করি এ　৬ কার

গ্রামিক নগরি ছলি খায় যে উদর পালি
তোর[1] সে ঔষধি ব্যাধি[2] কোথা ॥
অনাদর বাক্য শুনি ক্রোধে বলে ধাত্রি পুনি
ভাল আইলুঁ হিতের কারণ।
আমার মহিমা, মান, যত বিদ্যা, গুণ, জ্ঞান,
সব বৃথা করিলা রাজন ॥
চন্দ্রানী প্রসাদে মোর সম্পদের নাহি ওর
প্রসাদ না দিলা চিন্তা নাই।
মহত্ত্ব পাইতে আইলুঁ নিন্দা সে প্রসাদ পাইলুঁ
এ বলিয়া চলি যায় ধাই ॥
শুনিয়া চন্দ্রানী নাম দশ গুণ বাড়ে কাম
চকিত লুকিত লোররাজ।
দেখয় চলিলা বৃদ্ধা নৃপতি করিলা বাধা
পরিপাটি কহে নিজ কাজ ॥
কে লৈলা চন্দ্রানী নাম সেই মোর মনস্কাম
এথা কি দেখিলা চন্দ্রমুখী।
কহ কহ ব্রতশীলা তুমি কিসে নাম লৈলা
তেকারণে মুই বড় দুঃখী ॥
অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-বিষ বাড়ে মোর অহনিশ
অন্তর দগধে[3] মর্ম পোড়ে।
মহৌষধি জানে কেবা মানাই অনঙ্গ দেবা
সান্তাইয়া রাখে প্রাণী মোরে ॥
দেখিয়া নৃপতি-ক্লেশ মদনে মোহিত ভেশ
প্রমাদ চিন্তিয়া[4] বৃদ্ধা নারী।
নৃপতি কাকুতি বাধা না শুনি চলিল বৃদ্ধা
যথা বৈসে মোহরা কুমারী ॥
লস্কর উজির-বর বহুবিধ ধর্ম স্বর
নীতি শাস্ত্র শ্রবণে যাঁহার।

১ তার ২ আর্দি ৩ দহনে; অবধি ৪ চিন্তয়

হস্তী ঘোড়া নব রত্ন দান করে বস্ত্র অন্ন
দুঃখিতের খণ্ডে দুঃখ-ভার ॥
প্রতাপ প্রচণ্ড অঙ্গ[১] চতুরঙ্গ বল সঙ্গ
সারি সারি যাঁহার যোগান ।
আশরফ নাম দম্প[২] দুর্জনের প্রাণে কম্প[৩]
ভয়ে ধায় শত্রু বলবান্ ॥

মন্দিরে চন্দ্রানী ও যোগি-বেশী লোরের সাক্ষাৎ

ধাইকে দেখিলা বালা প্রসন্ন বদন ।
হরিষে পুছয় বালা লোর বিবরণ ॥
কহ কহ লোর প্রাণনাথের সংবাদ ।
খণ্ডোক বিরহ-জ্বালা মদন বিবাদ ॥
ধাই কহে সর্ব সিদ্ধি হৈল[৪] কার্য ভাল ।
দুইর[৫] দর্শন মিল করাইমু তৎকাল ॥
সঙ্কেত করিয়া আইলুঁ লোরকে নিশ্চয় ।
যোগি-রূপে লোর যাইব সেই দেবালয় ॥
সত্বর সন্ধানে যাই সেই দেব-স্থান ।
লোরক থাকিব ধ্যান[৬] দেবী বিদ্যমান ॥
তাহার তোমার তথা হইব দরশন ।
অন্যে অন্যে দোহানের জুড়াইব নয়ন ॥
বচনে প্রবোধ করি রাজার নন্দিনী ।
লোর রাজ সম্ভাষিতে ধাই গেল পুনি ॥
দ্বারী গিয়া রাজাতে কহিল নমস্কারি ।
রাজদ্বারে আসিয়াছে পুনি বৃদ্ধা নারী ॥

শুনিয়া বৃদ্ধার[৭] বাণী নৃপতি সত্বর ।
আজ্ঞা দিল বৃদ্ধা নারী আনহ গোচর ॥
বিকল বিভোল রাজা স্থির নহে প্রাণী ।
ক্ষণে ক্ষণে শ্বাস এড়ে ঘোষে চন্দ্ররানী ॥
ধাই বলে রাজা কেন হেন ব্যবহার ।
রাজা হই পাশরিলা নীতি আপনার ॥
রাজায় বলয় বৃদ্ধা স্বরূপে কহিবা ।
বেদনা বুঝিয়া যদি ঔষধি করিবা ॥
মোর মর্ম-ব্যথা যদি পার চিনিবারে[৮] ।
বৈদ্য বিশারদ হেন জানিমু তোমারে[৯] ॥
হাসিয়া বলয় বৃদ্ধা এই কোন্ কথা ।
নিমিষে চিনিলুঁ তোর মর্মে কাম-ব্যথা ॥
তোমার অন্তরে[১০] দহে মদন-গরলে ।
নিবারণ নহে মোর বৈদ্য-শক্তি-বলে ॥
মহৌষধ নহে[১১] কাম-বিষ-নিবারণ ।
কাম নির্বিষের মন্ত্র প্রিয়া-দরশন ॥

১ প্রচণ্ড ভুজ ২ দম্পে ৩ প্রাণ কম্পে ৪ হৈলে ৫ দু এর ৬ ধ্যানে
৭ বৃদ্ধের ৮ চিনিবার ৯ তোমার ১০ অন্তর ১১ নাহি

তোমা[১] মুখে জপ নিত্য চন্দ্রানীর নাম ।
পুনি পুনি কহ তুমি সেই মর্নস্কাম ॥
বিখ্যাত বামন জান সে যাহার স্বামী ।
তাহার রমণী-নাম নিত্য জপ তুমি ॥
চন্দ্রানীর বৈদ্য আমি সর্ব লোকে জানে ।
চন্দ্রানীর নাম লও আমা বিদ্যমানে ॥
এ সকল শুনে যদি বামন প্রচণ্ড ।
জাতি বংশ নাশিব করিব নব খণ্ড[২] ॥
আজ্ঞা দেও ঘরে যাই না চাহি প্রসাদ ।
বৃদ্ধ রাজে শুনিলেহ জীবন প্রমাদ ॥
নৃপতি বলয় বৃদ্ধা না কর সংশয় ।
যাবৎ আমার জীব তোমার কি ভয় ॥
এই উপকার কর মাগি পরিহার ।
চন্দ্রানীর সঙ্গে মিল করাও আমার ॥
বৈদ্য হৈলে[৩] সকলের গুরু সমতুল ।
না লঙ্ঘিব চন্দ্রানী তোমার কোন বোল ॥
যে জনে করয় পর-মনোরথ-সিদ্ধি ।
জন্মে জন্মে সুরপুরী[৪] মিলায় যে বিধি ॥
নৃপ-চাটু শুনি বৃদ্ধা হৈল সকরুণ ।
লোর স্থানে কহি দিল সঙ্কেত নিপুণ ॥
আন কার্য আমা হৈতে না হৈব সর্বথা ।
করাইমু দর্শন দুয়ে[৫] নাহিক অন্যথা ॥
যোগিরূপে যাও তুমি যথা দেব-স্থান ।
রহিবা সমাধি জুড়ি দেবী বিদ্যমান ॥
যোগিরূপে রহ গিয়া সেই দেবালয় ।
দর্শন উপায় তোমা কহিলুঁ নিশ্চয় ॥
কুমারীহ পরব দিনেতে[৬] তথা যাইব ।
দুইর[৭] দর্শন মনোমত[৮] তথা হৈব ॥
মহাযোগী হয় যদি পরম সমাধি ।
তাকে নাহি[৯] খেদায়ন্ত হেন আছে[১০] বিধি ॥
তুমিহ[১১] কুমারী তথা নির্ভয় কৌতুকে ।
অন্যে অন্যে দরশন হৈব মন-সুখে ॥
দর্শন উপায় এই কহিলুঁ তোমাত ।
এ বলিয়া ধাই গেল কুমারী সভাত ॥
প্রসন্ন দেখিল ধাই-বদন-মণ্ডল ।
জানিল কুমারী কার্য হয়েছে কুশল ॥
ধাই সঙ্গে কুমারীর ছিল সঙ্কেতন ।
নিভৃতে কহিল যত লোর বিবরণ ॥
তোমার কারণে লোর ধরে পীতাম্বর ।
গৌরী প্রেম ভাবে যেন উন্মত্ত শঙ্কর ॥
দেবী অগ্রে সমাধিত আছে নৃপ লোর ।
কুমারীহ লোর রূপ ভাবে[১২] কামাতুর ॥
আজ্ কাল্ গণে রামা পরব উদ্দেশ ।
নব রঙ্গ ঋতু লৈয়া পরব প্রবেশ ॥
পরব দিবস হৈল আনন্দ কুমারী ।
দেব-স্থানে চলি যায় যেন বিদ্যাধরী ॥
বহু শব্দ বহু বাদ্য বহু যন্ত্র ধ্বনি ।
মনোরথ-রথ পরে রথী চন্দ্ররানী ॥
বুদ্ধিশিখা সুচরিতা রথের সারথি ।
শিক্ষাবন্ত সারথি রথীহ কলাবতী ॥
হরষিত কুমারী প্রবেশি দেব-স্থানে ।
এক মহা যোগী দেখে দেবী বিদ্যমানে ॥

১ তুমি ২ খণ্ড খণ্ড ৩ হৈল ৪ স্বর্গপুরী ৫ দুই ৬ দিনেত দুয়ের
৮ (মূলে) মনোরথ ৯ কেহ ১০ নাহ ; নহে ১১ তুমিও ১২ ভাবি

যোগী নহে চন্দ্রানীর সেই পঞ্চ প্রাণী।
চন্দ্রানীহ[1] যোগি-প্রাণ অন্যে অন্যে জানি[2] ॥
অষ্টাঙ্গে[3] প্রণামি[4] বালা দেবী পূজা করে।
যোগীর বদন,[5] রূপ, দীর্ঘাঞ্জনে[6] হেরে ॥
চতুর্দিকে পরিজন, রাজসুতা মাঝে।
ভরদৃষ্টে না নেহালে সখীগণ-লাজে ॥
যোগীহ চন্দ্রানী-মুখ হেরে দৃষ্টি বঙ্কে।
সম দৃষ্টি না নেহালে সমাধি কলঙ্কে ॥
দর্শনের খেদ না টুটয় অন্যে অন্যে।
বঙ্ক দৃষ্টে নেহালিত[7] শান্ত নহে মনে ॥
দেবী পৃষ্ঠে গিয়া প্রদক্ষিণা ছলে বালা।
ইঙ্গিতে গ্রীবার ছিণ্ডে রত্নময় মালা ॥
ছিণ্ডিয়া পড়য় রত্নমালা সবে দেখি।
দাণ্ডাইল কুমারী বসিল সব সখী ॥
অধোমুখে[8] রত্ন গুথে সখীগণ বেড়ি[9]।
এই ছলে[10] লোর-রূপ দেখয় সুন্দরী ॥
কুমারী দেবীর পৃষ্ঠে লোরক সম্মুখে।
চারি চক্ষু জুড়ি অন্যে অন্যে রূপ দেখে ॥
দেখিতে দেখিতে রূপ দোহ শান্ত হৈল।
দোহরূপ চিত্তপটে দোহ লিখি লৈল ॥
বহুল সুগন্ধি পুষ্প মৃগমদ সঙ্গে।
দেব স্থানে সিঞ্চে বালা পড়ে যোগি-অঙ্গে ॥
মনে মনে চিন্তে লোরে কুমারী সন্ধান।
পুষ্প দিয়া আমাকে বরিল দেবস্থান ॥
ছিণ্ডিল গলার হার গুথিলেক পুনি।
কণ্ঠে হৃদে শোভা করি চলিল চন্দ্রানী ॥
এক পন্থে দুই কার্য লভিল চন্দ্রানী।
পাইয়া দুর্লভ বন্ধু পূজিল ভবানী ॥
সখী সমুদিত দেবী প্রদক্ষিণা করি।
কুতূহলে মন্দিরেত চলিল কুমারী ॥

লোরের টুঙ্গিতে আরোহণ ও কুমারীর সহিত মিলন

এথাতে লোরক রাজ ধ্যান ভঙ্গ করি।
নিজ স্থানে চলি যায় যোগি-রূপ ধরি ॥
কুমারীর দ্বার পন্থে যায় লোর বীর।
দুর্গম স্থানেতে দেখে কুমারী মন্দির ॥
উচ্চতর গিরিবর লঙ্ঘন না যায়।
মনে মনে চিন্তে বীর প্রবেশ উপায় ॥
দ্বার, পন্থ[11], গৃহ, গড়, দেয়াল, প্রাচীর।
বুঝিয়া পন্থের[12] গতি গেল লোর বীর ॥
বহু গুণ দিয়া দীর্ঘ সূত্রক বাঁধিল।
দুই হস্ত দড়ি অগ্রে কাষ্ঠ খণ্ড দিল ॥
দড়ি অগ্রে বান্ধিলেক বরশি লোহার।
দড়ির সোপান সাজ করিল কুমার ॥

১ চন্দ্রানী ও ২ মানি ৩ সাষ্টাঙ্গে ৪ প্রণমি ৫ মোহন ৬ দীর্ঘ দৃষ্টে
৭ নেহালিতে ৮ অধঃমুখে ৯ ঘেরি ১০ কালে ১১ হস্তে ১২ সবের

এক ভাগ রাত্রি যদি মন্দিরে গমিল।
শুভক্ষণ করি[১] লোর রথে আরোহিল॥
কি কহিমু লোরেশ্বর রথের মহত্ত্ব।
মিত্রকণ্ঠ সারথি রথের মনোমত॥[২]
দড়ির সোপান লই রথের উপর।
নিশাভাগে যায় লোর যেন নিশাচর॥
মন্দির নিকটে গেল দেয়ালের পাশ।
বিনি লক্ষ্যে পন্থ নাহি[৩] উঠিতে প্রকাশ[৪]॥
দেয়ালের চারি পার্শ্বে ফিরে রাজ লোর।
চন্দ্রের উদ্দেশে যেন ভ্রময় চকোর॥
দ্বারে দ্বারে দ্বারী জাগে হাঙ্কারে হুঙ্কারে।
কার শক্তি তদ্দ্বারেতে[৫] দ্বার করিবারে॥
তবে লোর ভাবি চিন্তি দড়ির বরশি।
খেপিলেন্ত[৬] কুমারীর মন্দির উদ্দেশি॥
ভেদিয়া শিলার ছানি বরশি রহিল।
সখীগণ মিলি বর্শি উখারি ফেলিল॥
বরশি উখারি বালা বিষাদিত মন।
আপনার কার্যে বাদ করিলুঁ আপন॥
করিলুঁ দুষ্কৃতি কর্ম সখী সম্বোধিতে[৭]।
বিবাদ পাতিলুঁ নাথ মন্দিরে আসিতে॥
কে মোরে প্রাণের নাথ দিবেক আনিয়া।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি কে নিল হরিয়া॥
শিব গৌরী কালী পদে মোর আরাধন।
ক্ষেপৌক বরশি পুনি লোরক রাজন॥
বরশি খসিল রাজা লজ্জায় বিকল।
প্রথম যাত্রাতে মোর হইল নিষ্ফল॥

না জানি কি বল-বীর্য্য মোহর টুটিল।
ছানিতে ক্ষেপিল বরশি কেনে না ফুটিল॥
বুঝিলুঁ আজু সিদ্ধি না হৈল কামন।
ভাবিয়া সোপান দড়ি সম্বরে রাজন॥
শিবিরেতে মতি যদি হৈল নরপতি।
পৌরুষতা রহাস্যক বুঝায় সারথি॥
পুরুষে সাধিব কার্য পৌরুষতা ধরি।
একবারে সিদ্ধি নহে পুনি পুনি করি॥
দুর্লভ সন্ধানে যদি বারে বারে নহে।
যাবৎ[৮] কুশল হয়[৯] করি অনুগ্রহে॥
দৈবে যদি কুশল না হয় বারংবার।
তাহাতে পুরুষে গ্রহ না করৌক আর॥
একবারে কেন হও বিক্রমে নৈরাশ।
বারংবার পরাক্রম সিংহের অভ্যাস॥
এতেক বুঝিয়া তুমি[১০] আপনার কার্যে।
পুনর্বার বরশি ক্ষেপিবা নিজ বীর্যে॥
পুনি পরীক্ষিয়া কর প্রহার রাজন।
দৈবে যদি না ঘটে সে কার্যে কি যতন॥
মিত্রকণ্ঠ-বচন শুনিয়া নৃপবর।
ক্ষেপিল বরশি পুনি ছানির উপর॥
ছানি ভেদি রহে বর্শি বলের প্রহারে।
সখীগণ বলে বর্শি খসাইতে নারে॥
শক্তিহীন হৈল যদি অন্তস্পুরে[১১] নারী।
কুরালিয়ে খুদি বর্শি ফেলিল উখারি॥
বরশি খসিয়া পড়ে রাজার সাক্ষাৎ।
বৃথা হৈল প্রহার বাড়িল অবসাদ[১২]॥

১ দেখি ২ মিত্রকণ্ঠ রথের সারথি মনোমত; মিত্রকণ্ঠ সারথি রথের মনোরথ। ৩ বাহি; চাহি
৪ প্রয়াস ৫ তদ্ধারেতে ৬ ক্ষেপিলেন্ত ৭ সমুদিতে ৮ যাবৎ না
৯ যাবৎ কুশল না হয়; যাবৎ কুশল নয় ১০ আজি ১১ অন্তঃপুরে ১২ বলি হৈল বিষাদ

বরশি পড়িল দেখি লজ্জিত কুমার।
অনুমানে চন্দ্ররানী না ক্ষেপিব আর ॥
প্রবেশের[১] উপায় করিল লোররাজ[২]।
আপনে করিলুঁ বাধা আপনার কাজ[৩] ॥
হরি হরি, মুই পরাধিনী অপরাধী।
হারাইলুঁ যৌবন-কালে পাই কাম-নিধি ॥
সব তেজি রাজসুতা নিরাঞ্জন স্তবে।
ত্রিলক্ষ[৪] ঈশ্বর নাম কায়মনে জপে ॥
তুমি হরি হর[৫] তুমি কমল-লোচন।
তুমি দেব-নৃপ তুমি শ্রীমধুসূদন ॥
তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু গোবিন্দ মাধব।
তোমা নাম প্রভাবেত হয় অসম্ভব ॥
তুমি রবি তুমি শশী তুমি জল স্থল।
স্থাবর জঙ্গম যত তুমি চলাচল ॥
তুমি রাহু শিব গ্রহ তুমি কেতু ছায়া।
দুখ সুখ তোমা[৬] লীলা গৃহ[৭] সব মায়া ॥
তুমি রেণু মরু কর বিন্দু সিন্ধু ভর।
মহাশূন্যে বুন্দের[৮] উৎপত্তি তুমি কর ॥
তুমি রুদ্র তুমি ইন্দ্র অষ্টলোক-পাল।
নররূপে নরেশ্বর মায়ার জঙ্গাল[৯] ॥
এক সেবা এক দেবা[১০] সেবয় কুমারী।
লোর সংঘটন[১১] হেতু বর মাগে নারী ॥
সাফল্য হৈল কুমারীর শুভ স্তুতি।
পুনি বর্শি ক্ষেপিতে রাজার হৈল মতি ॥
সম্বরিয়া দড়ি পুনি সাজাই রাজন।
দেব ধর্ম উদ্দেশিয়া ভাবি নিরঞ্জন ॥
তৃতীয় বারেতে বর্শি করিল প্রহার।
পুণ্যফলে লাগে[১২] বর্শি না খসৌক আর ॥
এ বলিয়া ক্ষেপে বর্শি ছানির উপরে।
বজ্র যেন ভেদি রহে কৈলাস শিখরে ॥
ভেদিয়া রহিল বর্শি উপরের ছানি।
কুমার বিক্রম দেখি আনন্দ চন্দ্রানী ॥
থাউক উখারি[১৩] বর্শি সখীগণ বলে।
লড়িতে[১৪] না পারে যদি টানে দলে বলে[১৫] ॥
সুদৃঢ়[১৬] লাগিছে বর্শি দেখিল কুমারী
সখীগণ সঙ্গে করি গেল অন্তস্পুরী ॥
এক রূপ চারি শয্যা রচিল কুমারী।
সুবর্ণ বেষ্টিত[১৭] চারি খাট মনোহারী ॥
চারিভিতে চারি খাট দেখিতে সুন্দর।
একরঙ্গী[১৮] চারি শয্যা চারি খাটপর ॥
কুসুমে রচিত শয্যা সুগন্ধি শীতল।
কস্তুরী চন্দন শিলা[১৯] গন্ধ[২০]পরিমল ॥
শয়নেতে নিদ্রা বাড়ে জাগনেতে কাম।
রতি-রণস্থল শয্যা অতি অনুপাম ॥
চীন দেশী ধ্বজবস্ত্র সুবর্ণের সুত।
চারি খাট পরে চারি চান্দোয়া অদ্ভুত ॥
মুকুতা প্রবাল ঝুপি[২১] চান্দোয়ার থোপে।
সুবিচিত্র পাটম্বরে[২২] নিশাকর শোভে ॥
জ্বলয় প্রদীপ চারি চারি খাট পাশ।
পূর্ণচন্দ্র সঙ্গে যেন নক্ষত্র বিলাস ॥
তিন খাটে তিন সখী রাখিল শয়নে।
নিজ খাটে চন্দ্ররানী রহিল আপনে ॥

১ প্রবেশিতে ২ রাজে ৩ কাজে ৪ ত্রৈলোক্য ৫ হর হরি ৬ তোম ৭ গ্রহ
৮ বিন্দুর; বিম্বুর ৯ জঞ্জাল; রচ (রচি) মায়া-জাল ১০ এক মনে এক দেবে ১১ লোরের সাফল্য
১২ লাগু ১৩ উখারিব ১৪ লাড়িতে ১৫ দলে দলে ১৬ সুধীরে ১৭ খচিত
১৮ এক রঙ্গ ১৯ দিলা ২০ শিলারস ২১ থুপি ২২ পাটম্বর

কুমারীর সাজ প্রায় সাজি[1] তিন সখী।
এক জন হস্তে এক উন নাহি দেখি॥
অঙ্গরাগ বসন ভূষণ সম পরি[2]।
চারি খাট পরে যেন চারি বিদ্যাধরী॥
ঝাপিয়া সকল অঙ্গ রহিলা শয়নে।
চন্দ্ররানী আদি[3] তিন সাজি অন্যে অন্যে॥
এক বর্ণ বসন ভূষণ অলঙ্কার।
একরূপা নারী যেন চারি অবতার॥
চারি খাট পরে চারি নারীর শয়ন।
চারি মধ্যে চিন নাহি শ্রেষ্ঠ কোন জন॥
কৃত্যা রূপে চারি শয্যা রচিল কুমারী।
লোরের চাতুরীপনা[4] বুঝিবারে নারী[5]॥
তবে রাজা দড়ি অবলম্বন করিয়া।
উঠিলেন্ত দড়ি কাষ্ঠে পদভর দিয়া॥
হাতে খড়্গ শোভে নেত ধড়া পরিধান।
বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান॥
কপালে দোলয় মণি কুণ্ডল শ্রবণে।
চন্দনে[6] চর্চিত তনু প্রসন্ন বদনে॥
কুমারীর অন্তস্পুরে গেলা লোরবর।
রোহিণী উদ্দেশে যেন গেলা নিশাকর॥
প্রবেশিয়া দেখে চারি খাট চারি ভিত।
মধ্যেতে[7] দাণ্ডাইল লোর রভস[8]-পণ্ডিত॥
এক বর্ণ চারি খাট পরে চারি নারী।
এক বর্ণ বসন ভূষণ ধরে চারি॥
এক রূপী[9] যেন বিদ্যাধরী চারি জন।
ঝাপিয়া মস্তক পদ খাটেতে শয়ন॥

এক বর্ণ দেখি[10] রূপ চারি চান্দোয়ার।
এক বর্ণ শোভে পাটম্বরের নিগড়[11]॥
চারি নারী শয্যা মাঝে সব সমসর।
চারি মধ্যে বড় ছোট চিনন দুষ্কর॥
কোন্ খাটে বসিম্ কোথাতে চন্দ্ররানী।
হাসিবেন্ত নারীগণে বসিলে না জানি॥
মূর্খ হেন করিবেক নারী সবে জ্ঞান।
তা হন্তে কি পুরুষের আছে অপমান॥
কৃত্যা করি নারী মোকে দিতে চাহে লাজ।
পুরুষতা করিয়া সাধিমু নিজ কাজ॥
দেব ধর্ম স্মরি বীরে মনে অনুমানে।
ভর-দৃষ্টি নেহালেন্ত জ্ঞানের নয়নে॥
খণ্ড খণ্ড শয্যা সব নিরক্ষে কুমার।
চতুর্দিকে চাহে চারি খাট চান্দোয়ার॥
নব তিন চান্দোয়ার নবীন বন্ধন।
এক চান্দোয়ার দেখে বন্ধন পুরান॥
ভাবে বীর যত[12] সব নবীন স্থাপন।
তে কারণে চান্দোয়ার নবীন বন্ধন॥
কুমারীর নিজ খাটে[13] চান্দোয়া স্থাপন।
আন জনে না করিব তাহাতে শয়ন॥
পূর্বস্থানে কুমারীর খাটের স্থাপন।
তে কারণে চান্দোয়ার পুরান বন্ধন॥
যে খাটের চান্দোয়ার পুরান বান্ধন।
সে খাটেতে বসিলেন্ত লোরক রাজন॥
ধন্য ধন্য শব্দ উঠিল অন্তস্পুরে।
কৃত্যায় রচিল শয্যা বুঝিলা কুমারে॥

১ সাজে ২ সম সরি; সম করি ৩ আর ৪ পানা ৫ পারি ৬ চন্দন
৭ মধ্যেত ৮ রভসে ৯ একরূপা; একরূপে ১০ দেখে ১১ (মুলে) নিগার
১২ খাট ১৩ কুমারী যে খাটেতে

ততেক্ষণ সখী সবে তেজি নিজ শয্যা।
খাট হস্তে লামিয়া করেন্ত পরিচর্যা ॥
রসপুরে[১] সখী সবে বেড়িয়া[২] কুমার।
গোপীগণ মধ্যে যেন গোপাল বিহার ॥
বুঝিল কুমারী লোর বসিতে ইঙ্গিত[৩]।
সকল ধীরতা[৪] শিক্ষা রসেতে[৫] পণ্ডিত ॥
বিন্তার সম্পাশে যেন বসিল সুন্দর।
দুরে গেল বদনের লজ্জার অম্বর ॥
করে ধরি কোলে করি বসায় কুমার।
প্রথম দর্শনে দোহ আনন্দ অপার ॥
দোহ উন্মত্ত[৬] দোহ রসেতে সুজন।
কাম রসে[৭] রতি শাস্ত্রে দোহান বিদ্বান ॥
কি কহিমু দোহনের মদন-তরঙ্গ।
কিছু শুনাইতে যুয়ায়[৮] যুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥
প্রথমে মদন কেলি ঘন আলিঙ্গন।
কাম-যুদ্ধে ভয় লজ্জা ধর্ম[৯] পলায়ন ॥
দন্তে দন্তে ঘরষণ বদনে বদন।
পুলকে পুরয় তনু সঘন চুম্বন ॥
পয়োধর গ্রীবা ধরি ঘন বাহু তাড়ি।
রতি যুদ্ধে যেন দুই মত্তে[১০] গড়াগড়ি ॥
দোঁহ মত্ত হই করে বিবিধ সন্ধান।
অধরে অধর দোঁহে করে মধু পান ॥
অবিশ্রাম রতি-যুদ্ধ-মদে দুই ভোর।
না জানি রৈঙ্কক নিদ্রা গেল কত দুর ॥
অঙ্গরাগ মৃগমদ তিলক চন্দন।
ভাসাইল শ্রম জলে নয়ন অঞ্জন[১১] ॥

খোকা ভেঙ্গে পুষ্পমালা চতুর্দিকে ধায়।
সুভেশ, চিকুর, তনু[১২] ভূমিতে গড়ায় ॥
বলী অবলার রতিযুদ্ধে নাহি ওর।
ক্রোধে কাম শক্তির ভেদিল রসপুর ॥
পাটেত বসিল রাজা রতিপুর জিনি।
জয় জয় বাদ্য বাজে নেপুর কিঙ্কিনী ॥
ভেদিল রসের গড় পাই পরিশ্রম।
সহজে শীতল হৈল মদন-বিক্রম ॥
শ্রমযুক্ত কুমার কুমারী কাম-রসে।
অন্যে অন্য[১৩] লক্ষ্য করে বিশ্রামের ভাষে ॥
দোহ চিত্ত শান্ত হৈল পাই রসবস্তু[১৪]।
রসময় কলাবতী সচেতন[১৫] কান্ত ॥
যে সকলে রমণ সংগ্রাম করিলেন্ত।
উচিত প্রসাদ শাস্তি কুমারে দিলেন্ত ॥
নিশি যুদ্ধে নিরস্ত হইল দুইজন।
নীল বস্ত্র টুপি পাইল প্রসাদ বন্ধন ॥
সিংহ-কটি বিক্রমে করিল রতি রণ।
প্রসাদ পাইল তার কিঙ্কিনী-রঞ্জন ॥
অধর মাধুরী দাতা রতি-যুদ্ধ-কালে।
সুগন্ধি তাম্বুল তাকে পুজিলেন্ত ভালে ॥
নয়ন যুগলে পাইল প্রসাদ অঞ্জন।
ভঙ্গ দিল চূড়া দেখি হইল বন্ধন ॥
সীতা জিনি নাসা বিনি পাইল কারণে।
লজ্জায় বান্ধিয়া তাকে রাখিল যতনে ॥
যার যে যুকত শাস্তি পাইলা প্রসাদ।
অন্যে অন্যে টুটি গেল বিরহ-বিবাদ ॥

১ রসভরে ২ ঘেরিয়া ৩ ইঙ্গিত ৪ ধারেত ৫ রসেত ৬ উনমত্ত
৭ কামরস ৮ যুজায় ৯ সর্ব ১০ মত্তে ১১ আঞ্জন ১২ চিকন তনু ; চিকুর ঘন
১৩ অঙ্গে অঙ্গ ১৪ রসমন্ত ১৫ সবতন

তিন ভাগ রাত্রি গেল কেলি সমাধানে।
কুমারী সম্ভাষি রাজা যায় নিজ স্থানে॥
প্রতিজ্ঞা করিল দুই যাবৎ জীবন।
অন্যে অন্যে প্রেমাঙ্কুর করিব পালন॥
হেন কহি রথে আরোহিয়া লোর রাজ।
নিজ পুরী পাইল গিয়া সিদ্ধি হৈল কাজ॥
চন্দ্র গোহারির সঙ্গে লোরক নৃপতি।
আদি পর্ব কহিলেক রভস-স্মুরতি॥

লস্কর যে আশরফ নায়ক সুজন।
সংসারের লোকে কহে[১] যাহার কল্যাণ॥
হয় গজ আদি দান করন্ত[২] বিস্তর।
নব রত্ন বরিখয় যেন রত্নাকর॥
সদা সুশীতল[৩] প্রেমে[৪] মিত্রে[৫] সুখী করে।
প্রতাপে অনল শত্রু-কুটিল-সংসারে॥
যাবৎ সুমেরু স্থিতি গঙ্গা মহীতলে।
সর্ব সিদ্ধি ভাল তান হৌক পুণ্য বলে॥

লোর কর্তৃক চন্দ্রানী-হরণ

আর দিন রবি যদি তিমিরে ঝাপিল।
চন্দ্রানী দর্শনে লোর চকোর চলিল॥
পুনি দড়ি লক্ষ্য করি[৬] উঠিলেন্ত লোর।
প্রবেশিল নিমেষে কুমারী অন্তস্পুর[৭]॥
সখীগণ সঙ্গে বালা আছে সমাহিতে।
দেখিলা প্রাণের নাথ হৃদয়ে[৮] ভাবিতে॥
সখীগণে কুমার আনিল আগুবাড়ি।
দুই মিলি বসিলেন্ত কুমার কুমারী॥
একের বিচ্ছেদ একে না ইচ্ছয় মর্মে।
অভিন্ন শরীর হৈতে চাহে এই ধর্মে॥
দোহ চিত্ত রসেত মজিল রতি-রঙ্গে।
চারি রাত্রি দোহে বঞ্চিলেক এক সঙ্গে॥
হেন মতে সুখে বঞ্চি লোরক রাজন।
নিরাতঙ্কে আইসে যায় চন্দ্রানী-ভবন॥

কুমার কুমারী দোহে একত্রে থাকিতে।
খর্ব-কেতু বার্তা রানী কহে আচম্বিতে॥
শুনিলুঁ বামন আজি কানন ভ্রমিয়া।
নগরে আসিব কালু মঙ্গল করিয়া॥
পুরীতে প্রবেশ যদি করয় বামন।
কি মুখে চাহিব আমি তাহার বদন॥
এ সব রহস্য যদি শুনয় আমার।
প্রথম ক্রোধেতে[৯] আমা করিব সংহার॥
তবে তোমা বধ জন্যে করিব দুর্বার।
সুরপতি বজ্র সম বামন প্রহার॥
খর্ব জানি তাকে হেলা না করিও গর্ব।
তাহা হস্তে শত গুণ দীর্ঘ তার দর্প॥
রাজবংশী রাজসুত তুমি রাজ্যেশ্বর।
মুই পরাধিনী হেতু এথ অথান্তর[১০]॥

১ চাহে ২ করন্ত ৩ সদাশীল সত্য ৪ প্রমে ৫ মিত্র ৬ বক্ষে ধরি
৭ অন্তঃপুর ৮ হৃদয় ৯ কোপেতে ১০ আথান্তর

তিল এক সুখ লাগি হারাইলুঁ কুল।
মাঠেত[1] বসিয়া মুই হারাইলুঁ মূল॥
কুমারীর বিলাপ শুনিয়া লোর-রাজ।
চিন্তাসন্ন হৈল[2] যেন আনন্দ-সমাজ॥
মন ভঙ্গ হৈল রাজা কুমারী বিলাপে।
নিজ বীর্য ভাবি বীরে কহে বীর দাপে॥
কণ্ঠেত আছয় জীব যাবৎ আমার।
কোন্ চিন্তা চন্দ্রমুখি জগতে তোমার॥
যেবা বল বামনকে ভুবন বিখ্যাত।
আমি তাকে সংহারিব তোমার সাক্ষাত॥
সখীগণ সঙ্গে তুমি থাকহ কৌতুক[3]।
পরাধিনী মত কেনে নিত্য ভাব শোক[4]॥
যুবরাজ মুখে শুনি ভরসা বচন।
উপায় করিয়া কহে লজ্জার কারণ॥
করিবা বৈরতা যুদ্ধ বামনের সঙ্গে।
পৃথিবীতে তোমা নাম রহিব কলঙ্কে॥
লোকে ঘুষিবেন্ত রাজ-সুতা দুষ্টা[5] ছলে।
নিজ কান্ত বিনাশিল উপকান্ত বলে॥
জয় পরাজয় মোর দোহ সমসর।
কোন্ মতে বসিবাম রমণী গোচর॥
জীবন[6] কি ফল যদি কলঙ্ক রহিল।
কলঙ্কের ভয়ে সীতা পাতালে লামিল॥
রাজ বীর্য বল জানি কর নিজ কাজ।
কলঙ্ক না রহে যেন রমণী সমাজ॥
যাবৎ বামন নাহি আইসে এই স্থান।
তাবতে[7] করহ মোর জীব পরিত্রাণ॥
বাপে মায় শুনিলেহ তেজিব গৌরব।
লোক দোষ শুনিলে করিব পরাভব॥
সেই ভাল তুমি আমি যাই দেশান্তর।
এড়াইমু বামন ক্রোধ কলঙ্ক দুস্তর॥
কুমারীর নিবেদন শুনিয়া রাজন।
রথ[8] সজ্জা করিলা[9] চলিতে[10] ততৈক্ষণ
বহুমূল্য দ্রব্য রত্ন লই বহুতর।
কুমার কুমারী দোহ যায় দেশান্তর॥
এক রথে আরোহিলা লোরক চন্দ্রানী।
রজনীতে চলে যেন চন্দ্রমা রোহিনী॥
সারথিকে বুঝাইয়া বলে লোর রায়।
শীঘ্রে[11] রথ চলাও[12] বিলম্ব না যুয়ায়॥
রহস্য শুনয় যদি বামন দুর্জয়।
প্রভাতে আমার লাগ লইব নিশ্চয়॥
দেখিলে আমারে পথে করিব নিরোধ।
তাহা সনে যুদ্ধ মোর কোন্ উপরোধ[13]।
জল স্থল রাজ্য বল বামনের পক্ষ।
একা রথে মাত্র আমি তাহার বিপক্ষ॥
এই উপরোধ মোর রথেতে কামিনী।
ব্যস্ত হৈব যুদ্ধে মোর দোসর পরানী॥
মিত্রকণ্ঠে বলে রাজা না কর সংশয়।
সারথি হইয়া দেব করিব[14] বিজয়॥
ইষ্টলোভে[15] দুই এক রথে চলি যায়।
সারথি বাউলা আর রথী লোর রায়॥
রাজ[16] সীমা এড়ি বীর কাননে প্রবেশ।
এক রথে চলে যেন গগনে দিনেশ॥

১ হাটেত ২ আইল ৩ কৌতুকে ৪ শোকে ৫ দুষ্টা রাজসুতা ৬ জীবনে
৭ তাবৎ ৮ রণ ৯ করিতে ১০ চলিলা ১১ শীঘ্র ১২ চালাও ১৩ কোথা ত বিরোধ
১৪ সুরথী হইয়া দেব করিবা ১৫ লাভে ১৬ রাজ্য

অথাতে ধাঁইর সনে অন্তস্পুর[১] নারী ।
উদ্দেশ না পায় কোথা গেলেক কুমারী ॥
বৃদ্ধ রাজা মহিষী পায়ন্ত বহু ক্লেশ ।
কোথাতে কুমারী গেল না পায় উদ্দেশ ॥
বন্ধুজন-শূন্য মোর পুরী অন্ধকার ।
রাজবংশে রাখিলেক কুলের খাঁকার ॥
দেশ তেজি কুমারী সে পলায় রাজার ।
ধিক ধিক রাজবংশ কলঙ্কে[২] তাহার ॥
এ বলিয়া মহাদেবী করন্ত রোদন ।
কি বলিয়া প্রবোধিব জামাতা বামন ॥
মহিষী-কান্দনে কৈল কান্দনের রোল ।
ভার্যা ভঙ্গ বার্তা শুনি বামন আকুল ॥
ক্রোধে প্রজ্বলিত বীর বামন কেশরী ।
অন্তস্পুর[৩] বিচারিল নাহি নিজ নারী ॥
এক সখী না রহিল পুরীর ভিতর ।
বামনের ভয়ে কেহ না দিল উত্তর ॥
চরে গিয়া কহিল বামন বিদ্যমান ।
অভ্যাগত রাজা সব আছে স্থানে স্থান ॥
লোর রাজা নাহি মাত্র তোমার নগর ।
হস্তী ঘোড়া উট সৈন্য আছয় সকল[৪] ॥
চর মুখে শুনিয়া লোরের বিবরণ ।
সকল তাহার কর্ম বুঝিল বামন ॥
হাতে হাত কচালয় বামন আক্রোশে ।
ভার্যা হরে লোরে, বার্তা শুনি অসন্তোষে
ওষ্ঠক কম্পয় ক্রোধে অপমান[৫] গণি ।
উদ্দেশিতে নিজ ভার্যা চলিল আপনি ॥

চন্দ্রানীর উদ্দেশে বামনের অভিযান

চলচল শব্দ হৈল সৈন্য সব সাজে ।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ অনেক বাদ্য বাজে ॥
মেঘের গর্জন যেন দুন্দুমির[৬] রোল ।
সাজয় অনেক সৈন্য অপার অতুল ॥
বজ্রবাহু সারথিকে বলয় কুমার ।
রথেত সত্বর তোল অস্ত্র পরিবার ॥
সাজউক বৃদ্ধ রাজা সাজে[৭] দলবল ।
মোর যুদ্ধে সহায় না হয় এ সকল ॥
শত্রুগণ জিনিলুম নিজ বাহু বলে ।
জিনিলুম বহু রাজা জানয় সকলে ॥
পরের পৌরুষ ধরি নাহি করি কর্ম ।
লোর সমে[৮] যুদ্ধ মোর সনাতন ধর্ম ॥

১ অন্তঃপুর ২ কালিতে ৩ অন্তঃপুর ৪ সবার ৫ অভিমান ৬ দুন্দুভির
৭ সাজু ৮ সনে

একা রথী যাব আমি অরণ্য উদ্দেশে।
মোর ভয়ে লোর না রহিব এই দেশে ॥
জল স্থল রাজ্য বন সব মোর বশ।
লোরকে[১] শরণে রাখে কাহার সাহস ॥
নারী[২]-চোরা পলাইতে বনে নাহি ঠাঁই।
চন্দ্রে সূর্যে দিব তাকে মোহকে দেখাই ॥
অবশ্য আমার হাতে তাহার নিপাত।
মরিল কীচক যেন বৃকোদর হাত ॥
নতুবা লোরের হাতে মোহর নিধন।
নির্বন্ধ খণ্ডাইতে নারী দৈবের কারণ ॥
কুমার-বচন শুনি সারথি দুর্জয়।
মহারণ্য উদ্দেশিয়া রথ সে চালায়[৩] ॥
মহারণ্যে চলি যায় একসর রথী।
রাজ সৈন্য সেনা[৪] কেহ না লৈল সঙ্গতি ॥
তিন রাত্রি পন্থ[৫] রথ চালায়ন্ত বেগে।
আর দিন অরণ্যে বিপক্ষ রথ দেখে ॥
রথের আটোপ দেখি ভাবি মনে মন।
বজ্রবাহু সম্বোধিয়া বলয় বামন ॥
কাঞ্চনের ধ্বজ[৬] দেখি রথ[৭] বিদ্যমান।
নিরাতঙ্কে যায় যেন দেবের বিমান ॥
অস্ত্র সজ্জা বহু দেখি বীরের লক্ষণ।
নারী-চোরা লোর এই বুঝিলুঁ ধরণ ॥
তাহার রথের আগে ধর রথ মোর।
শীঘ্র পন্থ নিরোধ না যায় যেন চোর ॥

বামন আরতি পাই সারথি প্রধান।
মুখামুখি ধরে রথ সমর সন্ধান ॥
বামনে দেখিল যদি লোরের বদন।
সিংহনাদ করে, যেন গর্জয় গগন ॥
আস্ফালিয়া উঠে যেন লহরী উথলে।
উচ্চস্বরে স্ত্রিরী চোরা করি ডাকি বলে ॥
শুনরে অধম[৮] মূঢ় অবোধ দুর্মতি।
পর-নারী হরে যেই মরণ[৯] দুর্গতি ॥
অবশ্য শুনিছ পাপী পুরাণে কথন।
প্রজাপতি বংশে জর্ম রাজা দশানন ॥
সুরাসুর আদি যত ত্রিভুবনে বৈসে।
দাস প্রায় খাটিলেক রাবণ আদেশে ॥
এক ছত্রে বসুমতী শাসিল রাবণে।
ঠাট পাট অন্তে[১০] গেল নারীর কারণে ॥
তুমি কোন তৃণ ছার পতঙ্গ নির্বলী।
বীরের রমণী লৈয়া তোমার[১১] ধামালী ॥
এ বলিয়া আস্ফালয় বামন দুর্বার।
বজ্রপাত ধ্বনি যেন ধনুর টঙ্কার ॥
বিপক্ষ প্রলাপ শুনি বলে নৃপ লোর।
জানিলাম সাধু তুমি নিন্দিলা তস্কর[১২] ॥
মহাসাধু গুণ কহ[১৩] ব্যাধ গুণ ধরি।
বনে বৈস পশু নাশ[১৪] ভার্যা পরিহরি ॥
গিরিসম নিজ দোষ না দেখ আপন[১৫]।
রেণুসম পর-পাপ শত মুখে গণ[১৬] ॥

১ লোরক ২ নারি ৩ চালয় ৪ কোন ৫ পন্থে ৬ ধ্বজা
৭ রথে ৮ অধর্মী ৯ চরম ১০ অন্তে ১১ তোহোর ১২ নিন্দিলা তো চোর
১৩ কর ১৪ নাশো ১৫ আপনে ১৬ গণে

খর্ব কাপুরুষ যেই[১] নপুংসক ক্রিয়া।
পুরুষ উত্তম স্থানে ভেজে[২] তার প্রিয়া ॥
পুরুষ ভ্রমরা জাতি[৩] মধু যথা পায়।
সুগন্ধি কুসুম নারী রসেতে খেলায় ॥
বনে থাক বনচারী বনপশুসম।
রমণী রমণ কেলি কোথা নরাধম ॥
আমারে বলসি চোর না বুঝি[৪] বিচার।
ভার্যা না ইচ্ছয়ে স্বামী কপাল তোমার ॥
সুরাসুর পশু নর যেথা[৫] গৃহ[৬]-ধর্ম।
সুরতি সম্ভোগ বিনু নাহি কোনো কর্ম ॥
পুরুষ চরণ যদি ভজয় সুন্দরী।
প্রাণপণ করি তারে আপদে উদ্ধারি ॥
যেবা[৭] বল[৮] চোর আমি শুনরে বামন।
স্ব-ইচ্ছায় রানী লৈল আমার চরণ[৯] ॥
সেই হস্তে চন্দ্রানীর আমি নিজ পতি।
মুখে কেন নারী নাম লও রে দুর্মতি ॥
বন-পশুগণ মারি তোর বীর দাপ।
বীর সঙ্গে যুদ্ধ হৈলে খণ্ডিব প্রতাপ ॥
মোর শর তৃপ্ত[১০] হৈব তোর রক্ত পানে।
তোর মাংস গৃধ্র কঙ্কে ভক্ষিব কাননে ॥
কাকের চঞ্চুয়[১১] তোর খসাইব নয়ন।
ফেরু-মিত্রে বেড়ি তোকে করিব রোদন ॥
তবে মোর[১২] মন শান্ত হইব বামন।
মন সুখে বনেতে বঞ্চিবা পশুগণ ॥
দুই বীরে বুলাবুলি আছিল বিস্তর।
অন্যে অন্যে রণে[১৩] দুই সন্ধানে সমর ॥
শ্রীযুক্ত আশরফ নায়ক লস্কর।
কৌতুকে পুছেন্ত দুই বীরের সমর ॥
যেন মতে লোরে কৈল বামন সংহার।
কহন্ত দৌলৎ কাজি রচিয়া পয়ার ॥

সমর-বর্ণনা

মুখামুখি দুই রথী যেন দুই মত্ত হাতী
দন্তে দন্তে যেন[১৪] পেষাপেষি।
সারথি করেন ভাতি বুঝায়ন্ত লোরপতি
দুই রথ নেহো মিশামিশি ॥
মোহর রথেতে নারী এই ছিদ্র পাই বৈরী
রথে রথ চাহে ঘনাইবার।

১ দুই ২ ভজে ৩ জান ৪ করি ৫ যথ ৬ গ্রহ ৭ কেবা
৮ বলে ৯ শরণ ১০ তৃপ্তি ১১ চুঞ্চয় ১২ তোর ১৩ বনে ১৪ ঘন

রথ কর দূরান্তর বেগে যেন যায় শর
হয় যেন শত্রুর সংহার ॥
লোরের বচন শুনি সারথি মনেত গুণি
সমর সংযোগে রথ ধরে।
তখন বামন বর চোখা চোখা মারে শর
লোর বধে বহু যত্ন করে ॥
হেনকালে বনবাসী যত দেব মুনি ঋষি
কৌতুকে দেখিতে আইলা রণ।
দুই বীর অবতার রণ করে অনিবার
অন্যে অন্যে করে নিবারণ ॥
ভার্যা দুঃখ মনে করি খর্ব দীর্ঘ অস্ত্র ধরি
লোররাজ-হৃদযেতে মারে।
শীঘ্র[১] হস্তে লোরবর নিবারয় শরে শর
লজ্জা পায় বামন কুমারে ॥
পুনি মনে রোষ করি কামানে আকর্ণ সরি[২]
লোরকে বধিতে বাণ এড়ে।
বুঝিয়া শরের গতি অর্ধপন্থে লোরপতি
সেই শর শরে কাটি পাড়ে ॥
মহাশর বৃথা[৩] দেখি আপনাকে উন লখি
অপমানে বিকল বামন।
ক্রোধে কম্পে কলেবর এড়ে অগ্নিসম শর
বিনাশিতে লোরক রাজন ॥
অনিবার বাণ এড়ে পরস্পর না বিচারে
খর্ব বাণ বজ্রের সমান।
তিন[৪] বাণে লোরবর মর্ম হৈল জর জর
সারথিকে হানে চারি[৫] বাণ ॥
সারথি বলয় লোর খর্ব বড় রণে শূর
ধৈর্য ধরি মারহ তৎ[৬] কাল।

১ ক্ষিপ্র ২ ধার ৩ ব্যর্থ ৪ তান ৫ আর ৬ এই

বাণ ফুটে তোমা গায় কুমারী সঙ্কোচ পায়
বিলম্বে না দেখি যুদ্ধ ভাল ॥
সারথির কথা শুনি লোররাজ মনে গুণি
সারি সারি বাণ মেলি মারে।
বিষম বিঘাত ঘাত যেন অগ্নি উল্‌কাপাত
বামনে আপনা লইয়া সারে[১] ॥
লোর রাজ বলে খর্ব কোথা তোর বীর দর্প
কোথা তোর চোরের বিচার।
না সহি চোরের ঘাও আপনা সারিয়া[২] ধাও
ক্ষেত্রি কুলে রাখিলা খাঁকার ॥
তবেহ তোমাকে ক্ষেমি সমর উপেখি আমি
চল তুমি কুশলে ভবনে।
ইষ্ট মিত্র গিয়া দেখ আপনা জীবন রাখ
পশু প্রায় কেনে মর বনে ॥
যে কিছু লোরের বোল বামনের কর্ণশূল
অনলেতে যেন ঘৃত পড়ে।
ক্রোধে রক্তবর্ণ খর্ব না ছাড়ে আপনা গর্ব
শরজালে লোরকে আবরে ॥
লোর যত বাণ এড়ে কাটয় বামন শূরে
অন্যে অন্যে বরিষেন্ত শর।
দোহ শিক্ষাবন্ত গুরু বাণে ছাইল বনতরু
দিবসে না দেখে দিবাকর ॥
যত দেব ঋষিগণ কৌতুকে দেখন্ত রণ
কারো নহে জয় পরাজয়।
তেজময় তীক্ষ্ণ বাণে বামন লোরকে হানে
মর্ম[৩] ভেদি প্রবেশে হৃদয় ॥
বামনের তীক্ষ্ণ বাণে লোররাজ[৪]-মর্মস্থানে
রক্তে[৫] বহে চারু কলেবর।

১ ছাড়ে ২ লইয়া ৩ বর্ম ৪ লোরের বে ৫ রক্ত

ব্যথা পাই লোরবর হস্তের খসিল শর
মোহস্চিত পড়য় সত্বর ॥
ছিদ্র পাই সে বামন বাণ এড়ে ঘনে ঘন
লোরের সারথি বধিবারে।
বিপক্ষ বিশিখ চণ্ড কম্পমান মিত্রকণ্ঠ
ধনু ধরি বামন নিবারে ॥
কুমারী কাতর-মতি[১] রথ হইল বক্রগতি
মিত্রকণ্ঠে ভাবয় সংশয়।
কুমারী কি সান্তাইমু বিপক্ষ কি নিবারিমু
রথের কি করিমু সহায় ॥
সংজ্ঞাহীন লোরবর মুই হৈলুঁ একসর
বলে শত্রু জিনিতে না পারি।
হেন নীতি আছে রণে কহিলেন্ত গুরুজনে
উপায় চিন্তিয়া শত্রু মারি ॥
উপায় চিন্তিলা[২] বীর কুমারী অঙ্গের চীর
শর অগ্রে বান্ধিয়া সত্বরে।
মিত্রকণ্ঠে শর এড়ে বজ্র সম বাণ পড়ে
খর্বকেতু-রথের উপরে ॥
চিনিয়া কুমারী-চীর বিস্ময়ে[৩] বামন বীর
পুনি পুনি নিরক্ষে বসন।
স্মরি প্রেম পূর্ব প্রীতি কৃপাকুল মহামতি
ভাবিলেন্ত পুনি মনে মন ॥
শরে যদি মৈল নারী কোন্ কর্মে যুদ্ধ করি
এ বলিয়া এড়ে শরাসন।
এই ছিদ্র পাই রণে মিত্রকণ্ঠে ততক্ষণে
লোরেন্দ্রকে করায় চেতন ॥
লোরেহ চেতন পাইল রণে[৪] সিংহ জাগাইল
মিত্রকণ্ঠে বলে পরস্পরে।

১ অঁতি ২ চিন্তিয়া ৩ বিস্ময় ৪ বনেঁ

আপনা পাসর কেনে বলবন্ত শত্রু সনে
দুর্জয় বামন ধনুর্ধর ॥
কুমার শিথিল[২] দেখি ভয়ভীত চন্দ্রমুখী
লঘু লঘু গঞ্জিলা বুঝাই।
তোমার যতেক দর্প খর্বে চূর্ণ কৈল সর্ব
কোথা লোর তোমার বড়াই ॥
শত্রুর বিক্রম শুনি অতি পরাভব গুণি
জীবন উপেক্ষি করে রণ।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে লোর যেন অগ্নিসম শর
ব্যস্ত হৈল কুমার বামন ॥
চোখা চোখা হানে শর জর্জরিত কলেবর
না পারে বামনে সহিবারে।
শিথিল[২] বামন মতি বুঝিয়া যে সে সারথি
রথ তারি[৩] রাখে তরু আড়ে ॥
বামনের পরাভব দেখিয়া হাঁসেন্ত সব
মুনি ঋষি বনবাসিগণ।
লজ্জা পাইল খর্বকেতু লোরের নিধন হেতু
উপায় চিন্তিল[৪] মনে মন ॥
অরির সন্ধান করি বামনে বিশিখ জুড়ি
লোরের কাটয় শরাসন।
শীঘ্র আর ধনু ধরে লোরবীর ধনুর্ধরে[৫]
সেই ধনু কাটয় বামন ॥
যেই ধনু ধরে লোরে কাটয় বামন শূরে
হস্তেত ধনুক নহে স্থির।
লাজ পায়[৬] লোর নাথে ধনু স্থির নহে হাতে
উচ্চস্বরে হাসে খর্ব বীর[৭] ॥
সংশয় ভাবয় লোর জিনিতে বামন শূর
ব্রহ্ম অস্ত্র সন্ধানে সত্বরে।

২ শীতল ৩ হাড়ি ৪ চিন্তিয়া ৫ ধনুঃশরে ৬ পাই ৭ অরি বীর

যত কৈলা জন্মান্তরে সে সকল পুণ্য ফলে
বিজয় লভৌক এই শরে ॥
এ বলিয়া মহাশর এড়ে লোর ধনুর্ধর
বামনের নিধন কারণ।
চর্ম মর্ম[১] ভেদি শর প্রবেশিল কলেবর
সংজ্ঞাহীন পড়িল বামন ॥
যখনে পড়িল শর কহিল বামন বর
ধন্য ধন্য লোর মহাবীর।
তোমার বিশিখ ঘাতে গরল সঞ্চিত তাতে
যেন বিষে বেড়ায় শরীর ॥
করিলুম বহু রণ জিনিলুঁ বিপক্ষ গণ[২]
অখিল পৃথিবী কৈলুঁ বশ।
মোহর আদেশ পত্র রাজা সব শিরে ছত্র
করি[৩] ঘোষে মোর কীর্তি যশ ॥
হেন বীর অবতার না দেখয় এ সংসার
মোহর গোচরে ধনু ধরে।
আমাকে রণেতে জিনি লই যাও চন্দ্ররানী
কে সহিব তোমার[৪] সমরে ॥
চন্দ্রানীহ ভাগ্যবতী পাইল লোরেন্দ্র পতি
লোরেন্দ্রেরে সে নারী যুয়ায়।
রাজার কুমারী লৈয়া সুখে রাজ্য কর গিয়া
শ্বশুরের করিও সহায় ॥
আমি যাই স্বর্গপুর নিশ্চয় শুনহ লোর
কার ভয়ে[৫] যাও নরপতি।
এ বলি বামন বীরে অনিত্য সংসার ছাড়ে,
রথ লই চলিল সারথি ॥
পড়িল বামন শূর জয়শঙ্খ বায়ে লোর
মিত্রকণ্ঠ আনন্দ অপার।
প্রশংসিল মুনিগণ করিলেন্ত ধর্মরণ
স্বর্গে গেল খর্ব অবতার ॥

১ চম-মর্ম ২ জন ৩ করী ৪ তোমার ৫ কমি জয়

চন্দ্রানীকে সর্প-দংশন

যাইতে বনের পথে পরিশ্রম পাই রথে
কুমারী নিবেদে লোর ঠাম।
মুই নিদ্রাতৃষ্ণাতুর অস্থির শরীর মোর
রথ রাখ করিব বিশ্রাম॥
নিদ্রাবশ নারী দেখি রথ তরুতলে রাখি
তিন জন নামিলা ভূমিত।
ভ্রমিয়া দেখিলা[১] লোর পাইলা এক সরোবর
নির্মল সুস্থান নিরভিত॥
স্নান পান করি নীর বসি সরোবর তীর
সবে মিলি ভোজন করিয়া।
মিত্রকণ্ঠ মহাবল অশ্বকে পিয়াইল জল
বনছায়াশ্রয়ে বসে গিয়া॥
কুমারের উরুপরি শির স্থান[২] দিয়া নারী
পন্থ শ্রমে ঘোর নিদ্রা যায়।
মূলে ঠেকা দিয়ে বীরে বসিলেন্ত নৃপ লোরে
কিছু আঁখি ঘূর্ণিত তন্দ্রায়॥
হেন কালে দুর্বিপাকে কোথা হন্তে এক নাগে
দংশিল নিদ্রাতে চন্দ্ররানী।
চকিতে চন্দ্রানী বলে কি কর কি কর লোরে
দেখ নাগে হরে মোর প্রাণী॥
নিমিষে সুন্দর গায়ে গরল বাড়িয়া[৩] যায়ে
তা দেখি মূশ্চিত[৪] লোর রাজ।
ব্যস্ত হৈল মিত্রকণ্ঠ কুমার[৫] দেখিয়া ধন্দ
উপদেশ বুঝায়ন্ত কাজ॥

১ দেখিয়া ২ শিরস্ত্রাণ ৩ বেড়িয়া ৪ মূর্চ্ছিত ৫ কুমারে

ভার্যা ভাবে[১] লোর পতি কেনে হও ছন্ন মতি[২]
কাপুরুষ কাতর লক্ষণ।
ভার্যা পাশ রহ তুমি বনৌষধি আনি আমি
যদি বিধি করায় ঘটন ॥
মিত্রকণ্ঠ গেল দূর একসর ভেল লোর
কুমারীকে দেখে পুনি পুনি।
না পাইয়া শ্বাস, বাণী, লোরে বুঝে অনুমানি
মৈল মোর দোসর পরাণী ॥
গেল যদি প্রিয়া-প্রাণ, জীবনে কি ফল আন
অনিত্য সংসারে নাহি কাজ।
মরিলেক চন্দ্ররানী তেজিমু আপন প্রাণী
এ বলি বিলাপে লোর-রাজ ॥
শ্রীযুত আশরফ খান[৩] সর্ব কলা রস জ্ঞান[৪]
সুধীর ধার্মিক বীর্যশালী।
চন্দ্রানী লোরের কেলি শুনি মন কুতূহলী
করাইলেন্ত রসের পাঁচালী ॥

লোরের বিলাপ

কালরূপ নাগেতে দংশিল চন্দ্ররানী।
রাজার কুমারী বালা মোহর পরানী ॥
ধুয়া

কোন্ মতে ধরাইমু জীবন মোহর।
মোহর হৃদের শশী বিষে দিল কোর[৫] ॥
গৌর[৬] কাঞ্চন তনু বিষে আচ্ছাদিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন করটে[৭] ঝাপিল ॥

কোমল নাসিকা হন্তে বহয় রুধির।
বিষ-জ্বালা না সহয় অবলা-শরীর ॥
সঘন চমকে কেনে নয়ন চকোর[৮]।
চকিত ভ্রমরা যেন ভুজঙ্গিনী কোর[৯] ॥

১ ভাবি ২ অনুমতি ৩ খানে ৪ জানে ৫ বিষে হল ভোর; বিষে নীল ঘোর
৬ গৌরব ৭ করটী ৮ চপল ৯ কোড়, কোল

উঠ উঠ চন্দ্রমুখী কত নিদ্রা যাও।
মাধুরী সাদরে[১] কেনে আমা না বোলাও ॥
কমল[২] বদনে নাহি রসময় হাসি।
মধু বিনে মধুকর রহিল উপাসি ॥
রাজসুখ ত্যজি সুন্দরী ময়নাবতী।
বন উপবন ভ্রমি তোমার পীরিতি ॥
নৃপ হই দেবী স্থানে যোগি-রূপ ধরি।
তোমার দর্শন হেতু আরাধিলুঁ গৌরী ॥
পাইলুঁ দর্শন তোর জুড়াইল নয়ন।
আনন্দ জীবন[৩] মোর তোমার মিলন ॥
কত নিশি তোমা সঙ্গে আছিলুঁ কৌতুকে।
তাহাতে লাগিল বৈরী খর্বকেতু মোকে ॥
তুষিলুঁ[৪] সুন্দরী রণে জিনি খর্ব শূর[৫]।
ভয় ভীতি সংশয়[৬] সকল কৈলুঁ দূর ॥
তোমা সঙ্গে নিশ্চিন্তে[৭] ভুঞ্জিমু রাজধানী[৮]।
হেন আশা মধ্যে মোর কে দিল আগুনী ॥
ইষ্ট মিত্র হীন মুই নির্জন কাননে।
কে দিব উপায় যাইমু কাহার শরণে[৯]।
কোথা গেল মিত্রকণ্ঠ প্রাণের দোসর।
চন্দ্রানী বিহনে মুই হৈলুঁ একসর ॥
সুগন্ধি কুসুম শয্যা যাহার শয়না।
ভূমিগত নিদ্রা যায় বিধির ঘটনা ॥
সুবিচিত্র চন্দ্রাতপে যার আচ্ছাদন।
তরুতলে সে সুন্দরী তেজয় জীবন ॥
চন্দ্রমুখী সবে যার সেবয় চরণ।
তাকে বেড়ি আছে বনে গৃধ্র কঙ্কগণ ॥
প্রবোধ না পায় চিত্তে বিলাপে রাজন।
নিশ্চয় সুন্দরী মোর তেজিল জীবন।
মিত্রকণ্ঠে বনৌষধি অন্বেষি না পাইল।
কুমারী মরণ-দশা নিশ্চয় জানিল ॥
মিত্রকণ্ঠ সারথিহ[১০] ভাবে মনে মনে।
অবশ্য মরিব লোর কুমারী কারণে ॥
লোররাজ বিনু আমি ত্যজিব জীবন।
দৈববলে এক বিষে তিনের নিধন ॥
কি মুখে ঔষধ বিনে যাইমু লোর পাশে।
পন্থ নিরখিছে মোর ঔষধের আশে ॥
বৃথা মোর তন্ত্র মন্ত্র যোগ ধর্ম গতি[১১]।
সর্প বিষ নিবারিতে না হৈল শকতি ॥
এহি ভাল দেখি সর শুচি-রুচি-নীর।
এহাতে মজিয়া আমি তেজিব শরীর ॥
এত ভাবি জলেতে নামিল যোগিবর।
পূর্বমুখী হৈয়া জলে স্মরয় শঙ্কর ॥
তুমি রুদ্র দেবরূপী[১২] রৌদ্র দিবাকর।
তোমার একাংশে শুচি স্থল সরোবর ॥
উজ্জ্বল প্রদীপ তুমি জগ কর ভোগ[১৩]।
তুমি সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর কলিযুগ[১৪] ॥
মনোবাঞ্ছা পুর তুমি সার কল্পতরু।
তোমার প্রতাপে দীপ্তি ধরয় সুমেরু ॥
অষ্টদিক পাল তুমি পৃথিবী রক্ষক।
পাতালে তোমার জ্যোতি ধরয় তৈক্ষক ॥
মৃত্তিকার ভাণ্ড দেহা করহ খণ্ডন।
দিব্য জ্যোতি দিয়া চিত্ত করহ মণ্ডন ॥

১ মধুর আদরে ২ কোমল ৩ জীবনে ৪ লভিলুঁ ৫ খর্বাসুর ৬ ভয়-ভীত-সংশয়
৭ নিঃশঙ্কে, নিঃসন্দে ৮ রাজ্য পুনি ৯ চরণে ১০ সারথিয় ১১ ধর্মে মতি
১২ দেবরূপে ১৩ আল ১৪ কাল

সূর্য জ্যোতি মণ্ডলী যোগীর ছিল[১] চিত।
অনিমিখ আঁখি হেরে জ্যোতিয় নিশ্চিত॥
ভবসিন্ধু গহনে মন মজিল আনন্দিত।
জল বিম্ব[২] দেহ যেন জলে উপস্থিত॥
আপনা পাসরি[৩] বীর সূর্য সমাধিত।
আচম্বিতে দেখে এক তপস্বী বিদিত॥
মহাতেজোময় কান্তি কলেবর জলে।
নক্ষত্র প্রকাশে[৪] যেন শ্রবণ-কুণ্ডলে॥
চক্ষু প্রকাশিলে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ।
অনলের বর্ণ প্রায় জলে তার অঙ্গ॥
বদন অরুণ জ্যোতি ললাট চন্দ্রমা।
বিশ্বরূপ ধরে সেই বিষ্ণুর মহিমা॥
দক্ষিণ করেত শঙ্খ চক্র বাম করে।
যোগীর কর্ণেতে শঙ্খ[৫] পুরয় সুস্বরে॥
স্থিরমতি হৈল মিত্রকণ্ঠ মহাজ্ঞানী।
জল হস্তে তপস্বী বসাইলা কুলে আনি॥
তপস্বী পুছন্ত মিত্রকণ্ঠ মন-ভাব।
কেনে দুঃখমতি তুমি কহ নিজ তাপ॥
তোমাকে[৬] প্রসন্ন হৈল রুদ্র বনস্পতি[৭]।
জলে তনু বিসর্জসি কি তোর আরতি॥
তপস্বী-বচন শুনি যোগী মহামতি।
আপনা বৃত্তান্ত কহে যোগীর[৮] ভারতী॥
যেন মতে সর্প-বিষে মরিল চন্দ্রানী।
কহিলেন্ত মিত্রকণ্ঠে সে সব কাহিনী॥
তপস্বী বলয় যদি এই সে কারণ।
সেই দুই কোথা মোরে করাও মিলন॥

মৃত[৯]-সঞ্জীবনী মাত্র[১০] আছয় আমার।
মৈল যদি জীব আমি করিব সঞ্চার॥
তপস্বী-বচনে যোগী হইল[১১] পুলক।
নব নীর পানে যেন আনন্দ চাতক॥
তবে যোগী মহাতপশালী সঙ্গে করি।
চলি গেলা আছে যথা কুমার কুমারী॥
মৃত কোলে করি রাজা ধুলায় ধূসর।
বসি আছে বনে যেন তরু একসর॥
যোগী দেখি লোর বলে গদগদ বাণী।
হৃদে অগ্নি মুখে ধর্ম[১২] আঁখি ঝরে পানি[১৩]॥
কেন দুঃখ পাও মিত্র খুঁজি মহৌষধি।
বৃথা তোর মহৌষধি প্রাণ গেল যদি॥
তোমার অপেক্ষা মাত্র ধরহোঁ জীবন।
আমিহ কুমারী সঙ্গে মরিব এখন॥
মিত্রকণ্ঠ বলে রাজা ধৈর্য কর[১৪] মন।
কাতরতা কাপুরুষ জনের লক্ষণ॥
মহাভাগ্য তোমার মিলিলা ঋষিবর।
তান পদে এখনে সেবহ লোরেশ্বর॥
সাক্ষাতে করহ মহাতপস্বীর সেবা।
তাঁহারে পূজিলে, পূজিলা ত্রিয়[১৫] দেবা॥[১৬]
কায়াচিত্তে পূজা তাঁর কর নরপতি।
পুরিব মনের বাঞ্ছা জীবেক যুবতী॥
পূর্বে শুনিয়াছি এক রাজা স্বর্ণষ্ঠীব।
মৃত্যু হৈয়া মুনি-মন্ত্রে পুনি পাইল জীব॥
তুমিহ পূজিবা মহামুনির চরণ।
মুনির প্রসাদে পাইব চন্দ্রানী জীবন॥

১ স্থির ২ বিম্বু ৩ পাসরে ৪ নক্ষত্র প্রকাশ ৫ শব্দ তোমাতে ৭ ত্রিবাম্পতি
৮ সুধীর ৯ (মূলে) মৃত্যু ১০ পাত্র ১১ যোগীর হৈল ১২ ধূম্র ১৩ প্রাণী
১৪ ধর ১৫ ত্রিও ১৬ তাঁহারে পূজিলে:তুমি পূজিলা ত্রিদেবা

তা শুনিয়া লোর রাজ মিত্রকে পুছেন্ত।
কহ কহ মিত্রকণ্ঠ এহার বৃত্তান্ত॥
কোন্ মতে রাজপুত্র নিধন হৈল।
কোন্ মতে মুনি-মন্ত্রে পুনি জীব পাইল॥
কহ মিত্রকণ্ঠ শুনি সে সব বারতা।
তবে সে মোহর মন[১] হৈব প্রসন্নতা॥
মিত্রকণ্ঠে বলে রাজা কর অবধান
যেন মতে পুনি পাইল রাজপুত্র প্রাণ॥

সৃঞ্জয় রাজার পুত্রের পুনর্জীবন প্রাপ্তির কথা

সত্য যুগে রাজা ছিল সৃঞ্জয় নাম।
ধর্মে কর্মে বিশারদ দোসর শ্রীরাম॥
বলবন্ত বীর্যশালী বিক্রম[২] বিশাল।
তার সম না আছিল ভুবনে ভূপাল॥
যত দূর প্রকাশয় দিবাকর জ্যোতি।
তত দূর প্রতাপে পালিল বসুমতী॥
অরিহীন মহারাজা জগৎ পূজিত।
পুত্রতুল্য প্রজাগণে পালে পৃথিবীত॥
এই সৃঞ্জয়ের সুত স্বর্ণষ্ঠীবী নাম।
সর্ব-গুণ-যুত রূপে অভিনব কাম॥
স্বর্ণষ্ঠীবী নাম তার হৈল যে কারণ।
কহি শুন লোররাজ সে সব কথন॥
কেহ যদি তাঁহারে মারয় কদাচন।
পুঞ্জে পুঞ্জে সুবর্ণ বর্ষয় ততক্ষণ॥
মুষ্ঠ কি চাপড় কেহ মারিলে তাহাকে।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্বর্ণ বর্ষে দৈব পরিপাকে[৩]॥
ইন্দ্রসম পৃথিবীতে সৃঞ্জয়ের দর্প।
তাঁর পুত্রে স্বর্ণ বর্ষে শুনিতে অপূর্ব॥
সৃষ্টি করে বিধাতায় নানান প্রকারে।
কাহার শকতি নাহি বুঝিতে তাহারে॥
সভা করি সেই রাজা বসিয়া থাকিতে।
আইল অঙ্গিরা[৪] মুনি রাজা বোলাইতে॥
মুনিকে দেখিয়া সৃঞ্জয় মহারাজা।
সম্পূর্ণ[৫] আসন দিয়া করিলেক পূজা॥
কতক্ষণে নারদ আইলা তার শেষে।
রত্নের আসন দিয়া বসাইল বিশেষে॥
অঙ্গিরা নারদ দুই মুনির চরণে।
সবান্ধবে মহারাজা পূজে এক মনে॥
রাজার কুমারী এক আছে নবশশী।
পরিচর্যা করে মুনি-চরণে[৬] পরশি॥
ভুবন বিজয়ী কন্যা প্রথম যৌবন।
লাবণ্য লীলায় মুনি-মানস মোহন॥
মহামুনি অঙ্গিরায় দেখিয়া কুমারী।
বনের তপস্বী রহে আপনা পাসরি॥
রূপ দেখি কল্লয় অঙ্গিরা বনবাসী।
পত্ররস চর্বে যেন দরিদ্র উপাসি॥

১ মনে ২ বিক্রমে ৩ দৈবের বিপাকে ৪ (মূলে) অঙ্গিনা (–পর্বত) [দ্রঃ পৃঃ ৩১, পা. টী. ৬]
৫ সুবর্ণ ৬ মুনি-চরণ

রাজা হস্তে লৈমু আমি এই কন্যা দান।
তবে সে এড়াইমু মদনের অপমান ॥
যাবৎ অঙ্গিরা মনে কল্পি সার করে।
নারদে মাগিলা কন্যা রাজাত সত্বরে ॥
নারদে বলিলা শুন ধার্মিক নৃপতি।
সংসারে ব্যাপিত হৈল তোমার সুকীর্তি ॥
তোমার সুশীলা কন্যা জগৎ-মোহিনী।
দান দিয়া শান্ত কর মোহর পরানী ॥
তা শুনিয়া মহারাজ হরষিত মনে।
নারদ মুনিকে কন্যা দিলা ততক্ষণে ॥
মহারাজ কন্যা দান দিয়া নারদেরে।
হরষিতে ভক্তিভাবে বলে উচ্চস্বরে ॥
ধন্য মোর সুশীলা দুহিতা ভাগ্যবতী।
ত্রিদশ ঈশ্বর ঋষি হৈল নিজ পতি ॥
তা শুনিয়া রোষে বলে অঙ্গিরাহ মুনি।
না বুঝিয়া কন্যা কেনে দাও নৃপমণি ॥
অবিচারে কন্যা দান নাহি পুণ্য সার।
শাস্ত্র বহির্ভূত দান নাহি ব্যবহার ॥
যাকে যে প্রথমে ইচ্ছে সেই হয় পতি।
বেদের প্রমাণ হেন আছে শাস্ত্র-নীতি ॥
প্রথমে কন্যাকে দেখি কল্পিয়াছি আমি।
আমাকে না দিয়া তাকে দাও আন স্বামী ॥
অঙ্গিরা-বচন শুনি বলিলা নৃপতি।
বহু অনুবন্ধ করি পরম ভকতি ॥
সর্বজ্ঞাতা দৈবজ্ঞ মহাত্মা তুমি মুনি।
মনকল্প তোমার কি মতে আমি জানি ॥
নারদ মুনিয় মাগিলেক কন্যা দান।
তেকারণে নিজসুতা দিলুঁ তান স্থান ॥
প্রকাশি মাগিল কন্যা সভা বিদ্যমানে।
তা হেতু সুশীলা কন্যা দিলুঁ তান স্থানে ॥
ক্ষেম ক্ষেম অপরাধ মহা ঋষিবর।
মনে না করিবা কোপ মোহর উপর ॥
এত বলি মহারাজা মঙ্গল বিধানে।
কন্যাকে সঁপিয়া দিল নারদের স্থানে ॥
পত্নী সমে[১] নারদ হইল অন্তর্ধান।
তার পাছে অঙ্গিরাহ গেল নিজ স্থান ॥
কন্যা দান করিয়া নৃপতি সৃঞ্জয়।
বহুল করিলা দান ধর্ম অতিশয় ॥
নিত্য সুচরিত[২] অতি মহা ধনুর্ধর।
পৃথিবীতে রাজা নাহি তার সমসর ॥
তাহান তনয় স্বর্ণষ্ঠীবী সুকুমার।
নানা দিক ভ্রমি করে কৌতুক বিহার ॥
স্বর্ণষ্ঠীবে স্বর্ণ বর্ষে শুনি চোরাগণে।
ধনলোভে ধর্ম-ভয় বিস্মরিল মনে ॥
চোর গণে এক যুক্তি কৈল এক স্থানে।
যুক্তি সার করি গেলা রাজার ভবনে ॥
প্রবেশিল রাজ-গৃহে মন্ত্রের প্রভাবে।
নিদ্রাসূত্রে বন্ধ[৩] হৈয়া ছিল লোক সবে ॥
তবে চোরাগণে হরি আনিল কুমার।
রাখিলেন্ত রাজপুত্রে বিপিন মাঝার ॥
মহারণ্য মাঝে রাজপুত্রকে মারেন্ত।
মারনের চোটে স্বর্ণ কুমারে বর্ষন্ত ॥
ধনলোভে চোরাগণে ধর্ম না বিচারে।
সুবর্ণের আশে বেড়ি রাজপুত্রে মারে ॥
যত মারে তত স্বর্ণ বর্ষয়ে কুমার।
মারনেত রাজপুত্র হইল সংহার ॥

১ সনে ২ শুচিরীত ৩ বন্দী

দেখিয়া কুমার[১] মৃত যত চোরাগণ।
ধন প্রাণ লই ধায় ভয় পাই মন ॥
অথাতে মহিষী রাজা সন্তাপিত মনে।
সৈন্য সব নিযুজিলা[২] পুত্র অন্বেষণে ॥
এক পুত্র নৃপতির দোহ চক্ষু জ্যোতি।
না দেখিলে অন্ধ সম মহিষী, নৃপতি ॥
দোসর নাহিক তার, দেখি হৈত শান্ত।
বাপের মায়ের মনে সেই কুলকান্ত ॥
নিরাকুল নৃপতি বিকল মহেশ্বরী[৩]।
প্রজা সব কুমার অনুশোচে মহী ভরি ॥
কুমারের অন্বেষণে ভ্রমে সর্ব সৈন্যে[৪]।
মৃতদেহ পাইলেক নির্জন অরণ্যে[৫] ॥
মৃত যদি[৬] রাজার অগ্রেতে লই আইলা।
শুনি মাত্র মহদেবী চেতন হারাইলা ॥
পুত্রের নিধনে দেবী করয় বিলাপ।
কেমতে সহিমু মুই পুত্র-শোক-তাপ ॥
হাহা পুত্র করি দেবী যায় গড়াশড়ি।
দীর্ঘশ্বাস অনল সহিবে[৭] মৌন ধরি ॥
রাজার আকুলে সব প্রজার বিকল।
পৃথিবী কম্পিত যেন কম্পে চলাচল ॥
শ্রাবণের মেঘে যেন স্রবে নীর ঘন।
পরিজন নারী সবে করয় রোদন ॥
মহাদেবী নরপতি ধর্ম অবতার।
রাজার উন্মত্তে সব[৮] লোক হাহাকার ॥
এথ[৯] এ বিকার যদি নারদে শুনিল।
গগন[১০] গমনে রাজ সভাতে মিলিল ॥

মহামুনি দেখন্ত নৃপতি বিমোহিত।
মহিষীকে দেখিলেন্ত অচেতন চিত ॥
পাত্র মিত্র বন্ধুজন সব উৎসাহীন[১১]।
আনন্দ ছাড়িয়া হৈল শোকের অধীন ॥
মুক্ত কেশ মুণ্ডে হস্ত নিজ কার্য এড়ি।
অধোমুখী বসিছেন্ত শোকে ভূমি হেরি ॥
এতেক উন্মত্ত মুনি দেখিলেন্ত যদি।
হিত তত্ত্ব বুঝায়েন্ত রাজাকে সম্বোধি ॥
পুত্র স্নেহ হেতু কেনে পাসর আপনে।
না মরিব হেন আছে কোন্ মহাজনে ॥
বৃথা অস্ত্র-শস্ত্র, বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, ধন।
কারো কেহ না পারিব রাখিতে জীবন ॥
কোন্ কার্য বীর্য, বল, দর্প, রাজপাট।
মৃত্যুদ্বারে নারে কেহ দিবারে কপাট ॥
যাবৎ জীবন বিধি রাখে পরমায়ু।
নিবন্ধ[১২] টুটিলে প্রাণ যেন চলে বায়ু ॥
বড় বড় রাজা সব পৃথিবী-পূজিত।
আসন ভূষণ তেজি শয়ন ভূমিত ॥
তোমা হস্তে আছিল বহুল বড়াবড়ি।
এই ভূমি উদরে গেলেন্ত সব মরি[১৩] ॥
চন্দ্র-সূর্য-বংশী সপ্ত দিক অধিকার।
পৃথিবীত সে সকল করিল সংহার ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জিনিল যে সকলে।
নিমিষে বিনাশ পাইল এই মহীতলে ॥
বাহু-বলে ইন্দ্র সম শাসিল[১৪] যে সবে।
হেন রাজা স্বর্গে চলে ভূমি পরাভবে ॥

১ কুমারে ২ (মূলে) নিজুলিয়া : নিযুতিলা ৩ রাজেশ্বরী ৪ সৈন্য ৫ অরণ্য ৬ দেহ
৭ (মূলে) দীর্ঘশ্বাস অনুপ্রাস হবে ৮ উন্মত্ত শোকে এথা ১০ পবন
১১ উৎসাহ হীন ; (?) উৎসহীন ১২ নির্বন্ধ ১৩ গরি ১৪ ইন্দ্রাসনে বসিল

ভূমি লোভে কাটাকাটি করিলেন্ত রঙ্গে।
কার পিতৃ পুত্রবর গেল ভূমি সঙ্গে ॥
এক যদি চলি যায় আর পুনি আইসে।
দিন চারি সুখে সেই রাজ-পাটে বৈসে ॥
যত শক্তি করে যেই[1] যতেক বিক্রম।
আসিতে বীরের মত যাইতে অন্ধ সম ॥
এ ভব সংসার মায়া যেন ইন্দ্রজাল।
ইষ্ট মিত্র প্রজা পুত্র কেহ নহে ভাল[2] ॥
যাবৎ সঙ্গতি তোমা শ্মশানের দ্বার।
কার[3] পুত্র পরিজন কেহ নহে কার ॥
ভস্মছালী করি সবে অগ্নিতে দাহন্ত।
প্রীতি, বৈরি দহি যেন গৃহে নির্বাহন্ত[4] ॥
সে সব থাকুক, নিজ আঁখি, পদ, কর।
একে একে ভিন্ন হই রৈব সে অন্তর ॥
আপনা শরীর যদি না হয় আপনা।
পৃথিবীতে আপ্ত আর হৈব কোন জনা ॥
পত্নী, পুত্র, ইষ্ট মিত্র, যত ভাই, বন্ধু।
তা সভান তত্ত্ব ধরি তুমি জল-বিন্দু ॥
জীবন যৌবন রূপ এ সুখ শরীর।
বিচারিয়া দেখ ভাবি এক নহে স্থির ॥
এথ জানি বুদ্ধিজনে পরিহরে শোক।
সুখ ভোগো[5] সে যবে পাইল পরলোক ॥
পশু প্রায় মানব বান্ধিয়া মায়া ফাঁসে।
ছিদ্র পাই ব্যাঘ্রে ধরি সমূলে বিনাশে ॥
মহামায়া[6]-মোহমগ্ন[7] হই নরলোক।
মোর গৃহ, মোর পুত্র করি ভাবে শোক ॥
মরমের মধ্যে লোক জানে অতি ভিন্ন।
মরমের মধ্যেত তত্ত্বের[8] মাত্র চিহ্ন ॥
মোর করি লোক সবে করয় কান্দন।
না গুণে সে মৃত্যু মোর হইব কোন্ ক্ষণ ॥
বুদ্ধি জনে[9] মরণেত না করিব শোক।
মন-ভ্রম ভাঙ্গিয়া চিনিব পরলোক ॥
মরণে অমর পদ জানহ রাজন।
মহাজন পুরুষের নাহিক মরণ ॥
মহাজন মৃত্যু যেন স্থানান্তরে যায়।
মহাসেতু লঙ্ঘিয়া কাঞ্চন পুরী পায় ॥
এ সব জানিয়া রাজা স্থির কর মতি।
আছি এ তোমার আমি সহায় সম্প্রতি ॥
মায়া, মোহ, পুত্র-শোক বিসর্জ বিলাপ।
দূর কর এ সকল মনের সন্তাপ ॥
আমার শ্যালক বটে তোমার তনয়।
তোমা হৈতে স্নেহ মোর অধিক আছয় ॥
তাহান জীবন হেতু করিমু কারণ।
এ বলিয়া মহামুনি পাতিল আসন ॥
তপ জপ[10] মুনিবর করিলেন্ত ধ্যান।
মৃত স্বর্ণষ্ঠীবে পুনি পাইল পরাণ ॥
এতেক সে বলি তুমি ধৈর্য ধর মনে।
কায় মনে সেব এহি ঋষির চরণে ॥
পূরিব সকল বাঞ্ছা মনের আরতি।
ঋষির প্রভাবে পুনি জীব কলাবতী ॥

১ সেই ২ কার ৩ দার ৪ প্রীতি, বৈরি দহি তবে অগ্নি নির্বাপন্ত ; ......গৃহে নিবর্তন্ত
৫ শোক ভোলো ৬ মহামায়ার ৭ মায়া-মগ্ন ৮ মরমের মধ্যে কোথা ত্বকের ৯ বুদ্ধিমানে
১০ জপে

চন্দ্রানীর পুনর্জীবন লাভ

এ সকল বচন শুনিয়া লোর রাজ ।
ঋষির চরণ ধরি কহে নিজ কাজ ॥
তপস্বী-বচন শুনি লোরক নৃপতি ।
অষ্টাঙ্গে প্রণতি করি করয় ভকতি ॥
বহু স্তুতি প্রণতিয়ে মাগে এই বর ।
জিয়াও সত্বরে মোর প্রাণের দোসর ॥
চাটু পাঠ[১] নৃপতির শুনি অতিশয় ।
উত্তর দিলেন্ত ঋষি সদয় হৃদয় ॥
যদি চাহ লোর সে কুমারী জিয়াইবারে ।
সত্য করো কি দক্ষিণা দিবা সে আমারে ॥
ঋষির বচন শুনি হরষিত লোর ।
নব মেহু নাদে যেন আনন্দ ময়ুর ॥
রাজা বলে তুমি মোর গুরু দেবঋষি ।
বিষ্ণুর আকার তুমি মহাত্মা তপস্বী ॥
প্রতিজ্ঞা করিলুঁ মুই তোমার গোচর ।
জল স্থল সাক্ষী মোর চন্দ্র দিবাকর ॥
চক্ষের পোতলী দিমু কোটি মূল্য মণি ।
অভিষেক হও দিমু পিতৃ-রাজধানী ॥
যেই মাগ সেই দিমু ত্রিলোক[২] ঈশ্বর ।
প্রাণের পোতলী মোর জিয়াও সত্বর ॥
তপস্বী বোলয় রাজা শুন মোর বাণী ।
বনবাসী কি করিব[৩] রত্ন রাজধানী ॥
রাজ-সুখ তপস্বীর লহরী[৪] সমান ।
যেবা বল রত্ন-মণি বনের পাষাণ ॥
যদি জীয়ে ভার্যা তোর হেন সত্য কর ।
পতি ভার্যা দাস হৈব দ্বাদশ বৎসর ॥
হরিষ বচনে রাজা প্রতিজ্ঞা করিলা ।
দাস হই রৈতে পঞ্চ বরষ[৫] ইচ্ছিলা ॥
লোরের প্রতিজ্ঞা শুনি তপস্বী আনন্দ ।
চন্দ্রানীকে জিয়াইতে করে অনুবন্ধ ॥
সমাধি যুড়িয়া ঋষি করে অধিরোপ ।
তৃণ ভূমি বশ রহে[৬] মন্ত্রের আটোপ ॥
কম্পিত লজ্জিত পাতালের নাগগণ ।
কীটরূপ ধরি আইল তক্ষক আপন ॥
সহস্রের সঙ্গে স্তুতি করে নাগপতি ।
ক্রোধ সম্বরহ নাথ হও কৃপামতি ॥
কোন্ আজ্ঞা কর প্রভু কি কার্য করিব ।
কোন্ কার্য পৃথিবীতে দুর্লভ সাধিব ॥
অনুমতি দেও[৭] মোকে সেবক-বৎসল ।
সেবক জনেরে দুঃখ দিয়া কোন্ ফল ॥
নাগেন্দ্র ভক্তিয়ে তুষ্ট ভেল ঋষিবর ।
ক্রোধ সম্বরিয়া ঋষি দিলেন্ত উত্তর ॥
মোর দাস লোরের রমণী চন্দ্ররানী ।
আনি দেও কোন্ নাগে হরিছ পরানী ॥
ঋষির বচনে কম্পে তক্ষক-রাজন ।
কায়াচিত্তে সেবে নাগে মুনির চরণ ॥
নাগের মহিমে[৮] জীব পাইল চন্দ্রানী ।
ঋষিহ[৯] হুঙ্কারি দিল মৃতসঞ্জীবনী ॥

১ পাট ২ ত্রৈলোক্য ৩ করিমু ৪ সকলি ৫ দ্বাদশবর্ষ ৬ তৃণভূমি রস লহে
৭ দাও ৮ মহিমা ৯ ঋষির ; ঋষিরে

চৈতন্য পাইল রামা বিষ গেল দূর।
যেন ঘন পরিভঙ্গে[১] উগিলেন্ত সূর॥
শ্যামবর্ণ বিষজাল সব হৈল ক্ষয়।
উজ্জ্বল শরীর পুনি হৈল জুতির্ময়[২]॥
বদনের জ্যোতি হৈল আকাশ প্রকাশ।
চন্দ্রের উদয়ে যেন কুমুদ বিকাশ॥
হরিষ লোরেন্দ্র, জীব পাইলা চন্দ্রানী।
শিশিরের পদ্ম যেন জীব পায় পুনি॥
উঠিয়া দেখিল রামা নিজপতি মুখ।
স্বপ্নে যেন আছিল সর্পের বিষ দুঃখ॥

বিষ দুঃখ, রণ, বন, পন্থের প্রমাদ।
দূরে গেল চন্দ্রানীর সে সব বিষাদ॥
মনোরম কান্ত[৩] পাইল মাধুরী[৪] জীবন।
গোপী-রসানন্দ যেন পাইল রাজন॥
শ্রীযুত আশরফ লস্কর উজির।
সকল ভারতী-শিক্ষা-বলেত[৫] সুধীর॥
সদাই সরস চিত্ত[৬] সদা সচেতন।
নীতিশাস্ত্র উপদেশ সঘন শ্রবণ॥
সুনির্মল বহু যশ, সুনির্ভর মান[৭]।
যাহার পুরিত যশ[৮] দিক পরিমাণ॥

মিলন

উল্লসিত মিত্রকণ্ঠ আনন্দে ভুলিল।
ঋষির প্রসাদে মনোরথ সিদ্ধি হৈল॥
কুমার কুমারী দোহে হৈল এক মতি।
ঋষিকে না দেখে পুনঃ করিতে প্রণতি॥
ভার্যাভিত্তে লোরেন্দ্র যখন কৈল মন।
অন্তর্ধান হৈল সেই ঋষি ততক্ষণ॥
অনুশোচ ঋষিকে না দেখি লোরপতি।
খুঁজিতে না পাইলুম মনের আরতি॥
চন্দ্রানী বলয় রাজা কেনে অন্যমন।
আমি সঙ্গে থাকিতে বিস্ময় কি কারণ॥
তবে নৃপে কহেন্ত মুনির বিবরণ।
যেন মতে চন্দ্ররানী পাইল জীবন॥

প্রত্যক্ষে আছিল ঋষি হৈল অন্তর্ধান।
মনোবাঞ্ছা খুঁজিতে না পাই মুই আন॥
এই খেদ রৈল মনে যাবৎ পরাণ।
কহিলুঁ চন্দ্রানী মোর বিস্ময় কারণ॥
কুমারী বলয় রাজা না হৈও বিকল।
ঋষির প্রসাদে হৈব সর্বত্র কুশল॥
হেন মতে কুমার কুমারী দুইজন।
ইষ্ট লোভে বিশ্রামেন্ত নির্জন কানন॥
কুমার কুমারী বার্তা পাইল নরপতি।
পন্থেত কহিল খর্বকেতুর সারথি॥
যেন মতে দুই বীরে করিলেন্ত রণ।
ভাগ্য-ফলে জয় পাইল লোরক রাজন॥

১ ঘনোপরি রঙ্গে ২ জ্যোতির্ময় ৩ কান্তি ৪ মধুর ৫ সকল ভারতী-শিক্ষা বলিতে
৬ সদা যশ, রস-চিত্ত ৭ শুনি ভরে কান ৮ দশ

বামন পড়িল যদি সমর ভূমিতে।
রথ বাহুড়াই আইলুঁ কান্দিতে কান্দিতে॥
শরশয্যায় বামনে কহিল এই বাণী।
যুক্ত[১] স্বামী পাইল কুমারী চন্দ্ররানী॥
কলি যুগে[২] লোরবর বীর অবতার।
লোর যুদ্ধ সহে হেন বীর নাহি আর॥
লোরের বুকেত মুই দেখিলুঁ কুমারী।
কায়া দুই, প্রাণী এক, যেন হরগৌরী॥
বৃদ্ধরাজ না করহ যুদ্ধ হাবিলাস।
বিজয় সংশয় হৈব সেনা হৈব নাশ॥
কুমার কুমারী দোহ প্রায় এক প্রাণ।
তাহাতে কি কর তুমি যুদ্ধের সন্ধান॥
এ সব শুনিয়া রাজা করি সমবায়।
কুমার কুমারী যথা তথা চলি যায়॥
সসৈন্য সমস্তে রাজা প্রবেশিল বনে।
সৈন্য পদধূলি উঠি ঢাকিল গগনে॥
দুমদুমি বাজনা শুনি লোরক রাজন।
মিত্রকণ্ঠ সম্বোধিয়া পুছয় বচন॥
সৈন্য সব আইল বহু, বাদ্য ধ্বনি শুনি।
না জানি কি রাজ-সৈন্য সাজি আইল পুনি॥
জামাতা নিধন শুনি নৃপতি আপনে।
আইসেন্ত করিতে যুদ্ধ বুঝি এ ধরণে॥
মহাযুদ্ধ বহু সৈন্য রথী বহুতর।
বহু শত্রু মধ্যে রণে মুই একসর॥
তুমি এক মিত্র মাত্র মোর নাহি আন।
বনে রণে সংশয়ত[৩] সহায়তা প্রধান॥
সমাহিতে[৪] সারথি হইবা মিত্রবর।
একা রথী মুই, শত্রু-বল বহুতর॥
এই বাক্য তোমারে বোলম পুনি পুনি।
কিন্তু উপরোধ মোর রথেত কামিনী॥
লোরের বচন শুনি বলে[৫] মিত্রকণ্ঠ।
ঋষির প্রসাদে সব এড়াইবা পাষণ্ড[৬]॥
বিষ্ণু অবতার ঋষি দেখিলা নয়ানে।
রণে বনে তোমার বিজয় সর্ব স্থানে॥
জিনিলা বিখ্যাত বীর দুর্জয় বামন।
কার শক্তি তোমা সঙ্গে করে আর রণ॥
যদি বল শত্রু মধ্যে তুমি একা বল।
তুমি রহ আমি শত্রু বধিব সকল॥
ইঙ্গিতে হাঁসিয়া বলে লোর মহাশয়।
সুরাসুর সংগ্রামেত কেবা বাসে[৭] ভয়॥
এইমাত্র লজ্জা এক কহিমু তোমাকে।
রথেত সুন্দরী মোর দেখিবেক লোকে॥
তবে মিত্রকণ্ঠ রথ করি দিল সাজ।
ভার্যা সঙ্গে রথে আরোহিলা লোর-রাজ॥
বিমানে সারথি সে[৮] মিত্রকণ্ঠ হৈল।
জন্ম[৯]-ফলে ছায়া হস্তে রথ আর হৈল॥
হেন কালে দেখে এক বৃদ্ধ দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া বার্তা পুছে লোরেশ্বর॥
সত্য কহ দ্বিজবর কোথাতে গমন।
কিবাভিষ্ট[১০] নির্জন কি গমন কারণ॥
দ্বিজে বলে মোকে যত্নে মোহরা রাজন।
পাঠাইল তোমাতে করিতে নিবেদন॥
কুলের চন্দ্রিমা মোর কুমারী চন্দ্রানী।
সেই ভাল হৈল, হৈছে তোমার রমণী॥
বিশেষতঃ যোগ্য যুক্ত[১১] নৃপতি লোরক।
তুমি বিনে নাহি মোর রাজ্যের পালক॥

১ যোগ্য ২ যোগে ৩ সংসারেত ৪ সমহিতে ৫ কহে ৬ দণ্ড ৭ ভাবে
৮ সু- ৯ পুণ্য ১০ কি অভিষ্ট ১১ ব্যক্তি

বামনে শাসিল রাজ্যে[১] শক্র সব মারি।
বৃদ্ধরাজ আছিল নৃপতি নামধারী ॥
অরি ভাবে বামনকে করিলা নিপাত।
কেবা ধরে শক্তি, হৈতে তোমার সাক্ষাৎ ॥
এতেক আপনা বীর্য জানি মহাশয়।
বৃদ্ধকালে শ্বশুরের করহ সহায় ॥
রাজ্যের কুশল কর লোক পরিত্রাণ।
ইষ্টজন সুহৃদের করহ কল্যাণ ॥
শ্বশুর জামাতা যুদ্ধ না হয় উচিত।
বৃদ্ধরাজে এহি নিবেদিলেন্ত নিশ্চিত ॥
মহিষীহ কুমারীকে কহিল বিস্তর।
মাতা পিতা বর্জি কিসে যাও দেশান্তর ॥
মনোরথ পুরিল পাইয়া যোগ্যপতি।
রাজকুলে পৃথিবীত তুমি ভাগ্যবতী ॥
অখনে জুয়ায় তোমা গুরুসেবা ভক্তি।
প্রতিষ্ঠা রহোক যেন[২] সংসারে উন্নতি ॥
তাহাতে কুমতি কেন হেন তোমা মনে।
শোকেত মজাও মাতা পিতা কি কারণে ॥
এই বাক্য মহিষী কহিল পুনি পুনি।
যেই যুক্ত সেই কর তুমি মনে গুণি ॥
মুই বৃদ্ধ দ্বিজের বচন শুন বালা।
গুরু হিত উপদেশ না করিও হেলা ॥
গুরুজন বচন কুলিশ[৩] হেন জান।
মাতৃ পিতৃ আজ্ঞা হৈলে[৪] সর্বত্রে কল্যাণ ॥
যে জন না লয় মাতৃপিতৃ অনুমতি।
অবশ্য তাহার ফল লভয় দুর্গতি ॥
দ্বিজের বচনে বালা মাতৃ পিতৃ স্মরি।
স্বামীর চরণে ধরি নিবেদে সুন্দরী ॥

কুল রক্ষা কর নাথ বংশের উদয়।
বৃদ্ধ বাপ মায়ে মোর করহ সহায় ॥
মুই বড় পরাধিনী[৫] দুর্মতি পাপিনী।
মোর হেতু আকুলতা জনক জননী ॥
সব তেজি তোমাকে ভজিলুঁ নিজ পতি।
পতি বিনে নারীর নাহিক আন গতি ॥
খর্বকেতু শঙ্কা মোর আছিল প্রমাদ।
সে সকল দূরে গেল তোমার প্রসাদ ॥
এখনে কাহার শঙ্কা বলহ রাজন।
মোর পিতৃ-রাজ্যে কেনে না কর গমন ॥
নিজ রাজ্য জানি মনে করহ পালন।
পিতৃ মাতৃ পূজা যেন করি সর্বক্ষণ ॥
কর নাথ শুদ্ধ যেন হয় পরিণাম।
কলঙ্ক দুর্নাম কুতি হউক নির্নাম ॥
হেন মতে কুমারী করিতে নিবেদন।
সসৈন্য সম্পাশে আইল মোহরা রাজন ॥
বৃদ্ধ রাজ মুখ দেখি কুমারী কুমার।
রথ হস্তে নামিয়া করিলা নমস্কার ॥
জামাতা ভক্তিয় তুষ্ট হৈলেন্ত শ্বশুর।
চিন্তা, ক্লেশ, মন-দুঃখ সব হৈল দূর ॥
জামাতা কন্যার দেখি বহু প্রেম প্রীত।[৬]
নয়ন সাফল্য হৈল চিত্ত হরষিত ॥
বহুল বিনয়ভাবে মোহরা রাজনে।
জামাতাকে বুঝায়ন্ত মধুর বচনে ॥
জামাতা মোহর তুমি বিদিত ভুবন।
কার ভয়ে ভার্যা সমে রহিয়াছ বন ॥
বৃদ্ধকাল ক্ষয়ায়[৭] পীড়িত মুই জীর্ণ।
বিক্রমে শার্দুল নামে দন্ত নখ হীন ॥

১ রাজ্য ২ জান ৩ আদেশ ৪ হৈতে ৫ অপরাধিনী
৬ জামাতা-কন্যারে দেখি বহু প্রেমপ্লুত ৭ বৃদ্ধকালে জরায়

নাহি পুত্র, পৌত্র মোর অনুজ দোসর।
বনতরু প্রায় আমি রাজ্যে একসর॥
মোকে জীর্ণ দেখি বল পাইবেক সবে।
পাখা-হীন সাচনকে কাকে পরাভবে॥
জগতে সহায় মোর নাহি তোমা সমা।
সঁপিলুম তোমা স্থানে কুলের চন্দ্রমা॥
তেকারণে মোর আশা তোমাতে বিশেষ।
কালে রক্ষা করিবা পালিবা লোক দেশ॥
মোর যত রাজ্য দেশ সমস্ত কটকে[১]।
তোমার আদেশ মান্য[২] ধরিব মস্তকে॥
এত জানি মোর প্রতি না হও বিমন।
নিজ দেশ জানি কর সত্বরে পালন॥
বৃদ্ধের বিনয় বাক্য শুনি লোরেশ্বর।
ভার্যা সমে চলিলেন্ত মোহরা নগর॥
চারিভিতে যুবাজন মধ্যে যুবরাজ।
কাঞ্চন কেসর যেন পদ্মবন মাঝ॥
পাছে পাছে বৃদ্ধ রাজ পাত্র দল বল।
নিজ রাজ্য পাইল গিয়া মন কুতূহল॥
শুনি চন্দ্রানীর বার্তা হরিষ মহিষী।
আনন্দ উল্লাস হৈল অন্তঃপুর বাসী॥
মহাদেবী আজ্ঞা কৈল নগরে নগর।
মঙ্গল করুক সর্বে প্রতি ঘরে ঘর॥
দীপ ঘট আম্রযুত করি সারি সারি।
কৌতুকে দেখন্ত আসি কুমার কুমারী॥
গাহন্ত মঙ্গল সবে চাতরে চাতর।
(?) বিভুপতি[৩] আইল যেন গোহারি নগর॥
মহিষী সঙ্গতি করি যত নরনারী।
বাড়িয়া আনিল সবে কুমার কুমারী॥

কুমারকে অভিষেক করি নিজ দেশ।
আপনে রহিলা বৃদ্ধ রাজ গুরু-ভেশ॥
রাজ্য, ভার্যা, পাই লোর বামনকে জিনি।
এড়ি গেল সৈন্য সেনা পাইলেক পুনি॥
পৃথিবী সঞ্চারে লোর-যশ-কীর্তি[৪]-ধ্বনি।
চরণে ভজয় শত্রুগণ রণে জিনি॥
হেন মতে পৃথিবী পালয় লোরপতি।
কতকালে বৃদ্ধ রাজ পাইল স্বর্গ গতি॥
বৃদ্ধের মরণে হয় যুবকের আশ।
হেমন্ত অন্তরে যেন বসন্ত উল্লাস॥
কপট সংসার মায়া বুঝিতে কি পারি।
পিতৃকে মারিয়া পুত্রে করে[৫] অধিকারী॥
চারি যুগ বৃদ্ধ সতী[৬] যুবতী[৭] আকার।
প্রতিদিন এক স্বামী করয় সংহার॥
তাহাকে গ্রাসিয়া পুনি আন স্বামী বরে।
পাপিনী খাকিনী কাকে দয়া নাহি করে॥
দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যায় আন আইসে কেহ নহে সার॥
এ সব জানিয়া মতিমন্ত বুধজন।
দানে ধর্মে যায় চারি[৮] দিবস জীবন[৯]॥
শ্রীআশরফ চিত্ত বিনোদের স্থলী।
শুনিয়া পুছেন্ত কথা মন কুতূহলী॥
চন্দ্রানীর দেশে যদি গেল লোর পতি।
কোন্ কর্ম করিলা এথাতে ময়নাবতী॥
ময়নাবতী রাজ্যে কি লোরেন্দ্র আইল পুনি।
তবে কোন্ উপায় করিলেক[১০] চন্দ্ররানী॥
কোন্ মতে এ তিন মিলিয়ে তার সঙ্গ।
কোন্ মতে ময়না সঙ্গে ছাতন প্রসঙ্গ॥

১ (মূলে) কণ্ঠকে ২ মানি ৩ ঋতুপতি, রতিপতি ৪ কৃতি ৫ হয়ে ৬ পতি
৭ যুবক ৮ করি ৯ যাপন ১০ করিলা

কোন্ মতে আছিলা বিরহে মন ভঙ্গ।
কাজি দৌলতে রচে সে সব প্রসঙ্গ॥
মনে ইচ্ছা হইল সে সব শুনিবার।
কহেন্ত দৌলৎ কাজি রচিয়া পয়ার॥

যেন মতে মালিনীয়ে দূতীপনা[1] কৈল।
ময়না সঙ্গে ছাতনকে মিলাইতে নারিল॥
লোর, ময়না, চন্দ্রানীর হৈল এক স্থান।
সে সকল কহে শুন আশরফ খান॥

১ (মূলে) দূতীপানা।

দ্বিতীয় খণ্ড

ময়নার বিলাপ

ময়না, মিল না রে।
ছাতনের সঙ্গে, ময়না, মিল না রে ॥ ধুয়া ॥

অথাতে চন্দ্রানী সঙ্গে রহিলা লোরক রঙ্গে
গোহারিতে হই মহীপাল।
নিজ রাজ্যে ময়নাবতী দেব ধর্ম পূজে[১] নিতি
স্বামি-বর মাগে সর্ব কাল ॥
সে কাহিনী[২] অন্তঃপুরে, রম্ভাসরোবর তীরে
শুচি-রুচি কুসুম-উত্থানে[৩]।
তথাতে নির্জনে নারী, আরাধে শঙ্কর গৌরী,
সর্বহিতে[৪] স্বামীর কল্যাণে[৫] ॥
চাহন্ত রাজ্যের ভাল, টুটউক জঞ্জাল,
দ্বিজ গুরুজন হোক শান্ত।
এই বর মাগে নারী গৌরীপদ অনুস্মরি
সত্বরে মিলউক[৬] নিজ কান্ত ॥
দরিদ্র দুঃখিত জন, ধন দিয়া তোষে মন,
তৎপরে পুজে অভ্যাগত।
ভাগ্যবতী ময়নারানী, সত্যের[৭] প্রতিষ্ঠা[৮] শুনি
প্রশংসেন্ত সকল জগত ॥
নরেন্দ্র নৃপতি সুত, কপট লক্ষণ যুত
নাম তার ছাতন কুমার।
ময়নার নিজ দেশে বৈসেন্ত-বণিজ বেশে[৯]
কুটিল কুলটা বুদ্ধি তার ॥

১ দেব ধর্ম্ম, পুজা ২ কামিনী ৩ উদ্যান ৪ সর্বহিত ৫ কল্যাণ ৬ মিলাউক
৭ সৈত্যের ৮ প্রদিষ্টা ৯ বাণিজ্য আশে

বহু-ধন-রত্ন-পতি, সৎকর্মে নহে মতি,
মদে মত্ত[১] হৈল ময়না-লোভে।
শুনিয়া কুমারী রূপ কাম ক্রোধে পাই লোভ[২]
মধুতে মক্ষিকা যেন ডুবে॥
ময়নার সুরতি আশে ছাতন মদন গ্রাসে[৩]
নিত্য ভাবে সে রূপ কাহিনী[৪]।
রচিয়া কপট বুদ্ধি কার্যে যেন হয় সিদ্ধি
আনাইল রতনা মালিনী॥
মালিনীর লাস ভেশ কি কহিমু সবিশেষ
কুলটা বিখ্যাত প্রবঞ্চক।
মধুরস স্থল তুণ্ড হৃদয় গরল কুণ্ড
কপট মন্ত্রণা দমনক॥
দুই মধ্যে প্রীতি কলা বাড়াইতে জানে ভালা
প্রীতি-ভঙ্গ সেহ ভাল জানে।
সুহৃদ্‌-ভেদ মিত্রলাভ জানে দুই প্রীতি ভাব
বেশ্যা-গুরু কুটনী প্রধান॥
কুমারে প্রসাদ দিয়া মালিনীকে সন্তোষিয়া
কাজ[৫] কহে আপনা ভারতী।
যথ চাহ দিমু ধন শান্ত কর মোর মন
মিলাইয়া দেও ময়নাবতী॥
ছাতন-বচন শুনি মালিনী বলয় পুনি
যথ কর্ম সব মোর ভার।
রতি শাস্ত্র উপদেশে ময়নাকে ভুলাইমু রসে
পুরাইমু আরতি তোমার॥
পরিয়া মোহন শাড়ী কৃত্যারূপ আশু ধরি
চলি গেল যথা ময়নাবতী।
সুগন্ধি তাম্বুল ভালা চম্পক চৌছরা মালা
ভেট দিয়া করিলা মিনতি॥

১ উন্মত্ত ২ কামে বুদ্ধি পাই লোপ ৩ ত্রাসে ৪ কামিনী ৫ কানে

মন্দিরেত সে মালিনী প্রবেশ করিল জানি
সিংহাসনে[১] বসিলা কুমারী।
হাস্য মুখে পুছে রানী সত্য কও ও মালিনী
কোথা হন্তে (আ-) গমন তোমারি ॥
নিবেদয় সে রতনা, কি পুছ মা সতী ময়না,
মুই হতভাগী কাল-শোকে।
তোমার জনকবরে ধাঁই করি দিল মোরে
শিশু কালে দুগ্ধ দিলুঁ তোকে ॥
বুদ্ধি স্থির কালে তোর কুগ্রহ লাগিল মোর
তোমা তেজি গেলুঁ আন পাশ।
সুহৃৎ[২] সম্পদ তেজি ভাল্লুকী চরণ ভজি
আপনা করিলুঁ সর্বনাশ ॥
না রহে[৩] দারুণ মন চিত্ত দহে অনুক্ষণ
কৃপামাত্র স্মরিতে তোমার।
দেখিলুঁ বদন-চান্দ, ঘুচিল মনের ধান্দ,
এত জানি আইলুঁ দেখিবার ॥
দিয়া উপহার শুচি, বসন বিচিত্র-রুচি[৪]
বহুল সাদরে পৈরাইলা।
বিশেষ প্রসাদ পাই ময়নার আদেশ লৈ
মন্দিরেত উঠিয়া বসিলা ॥
কুটনী-বচন শুনি ধাই হেন সত্য জানি[৫]
নাপিত বোলাই ততক্ষণে।
সুগন্ধি কুসুম রঙ্গে, মার্জন করাইল অঙ্গে,
স্নান করাইলা সখীগণে ॥
মনে ভাবে সে মালিনী, মোর বুদ্ধি হন্তে রানী,
এবে সে যাইব কোন্ স্থান।
উপকথা নানা বর্ণে ভোলাই কাহমু কর্ণে
হৃদে যেন জাগে পঞ্চবাণ ॥

১ স্বর্ণাসনে ২ সুগতি; সুমতি ৩ সহে ৪ বিচিত্র বরণ রুচি ৫ মানি

হেন মতে ময়নারানী, যৌবনেতে স্বামী-বিনি
অনুতাপে সময় গোঁয়ায় ।
স্মরিতে স্বামীর গুণ শরীরে ভেদিল ঘুণ
শোকে ক্লেশে রজনী পোহায় ॥
স্বামীর বিচ্ছেদে রামা, ত্রাসিত হরিণী[১] সমা
নিশি দিশি বহে ঘন শ্বাস ।
ত্যজিয়া ভূষণ হার, অঞ্জন চন্দন আর
উপভোগ সুখ পরিহাস ॥
তাহাতে দুর্মতি দূতী রচিয়া কপট উক্তি[২]
সদায় না তেজে ময়না পাশ[৩] ।
যেন শুক বধ আশে, মার্জার খোপেতে বৈসে,
শিবা যেন মৃগের বিনাশ[৪] ॥
বিধি রক্ষা করে যারে, বঙ্ক নহে কেশ অগ্রে,
তার ছায়া না লঙ্ঘে সংসারে ।
বিপরীত বায়ু বলে সত্য ঘট নাহি টলে
সতীত্বকে টলাইতে নারে ॥
লস্কর নায়ক মণি, জগতে প্রতিষ্ঠা-ধ্বনি,
মাধুরী স্রবয় পদে পদে ।
দানে পুণ্যে অনুপম, সুগন্ধ লহরী[৫] সম
যশস্য লহরী মৃগমদে ॥

মালিনীর দৌত্য

তবেহ ময়নার সঙ্গ না তেজে মালিনী ।
কপট প্রবন্ধে কহে নানান কাহিনী ॥
কৃত্যা-সূতে পুষ্প-বাক্য গুথিয়া কপটী ।
গরল পিলায় যেন অমৃত লেপটি ॥

তুমি[৬] সম নাহি বালা, কহে বহু মিষ্ট ।
মুঞি ধাই বিনে তোর কেবা আছে ইষ্ট ॥
বুক মোর ফাটয় তোমার দুঃখ দেখি ।
পলকে পলকে যেন অগ্নি পোড়ে আঁখি ॥

১ রোহিণী ২ যুক্তি ৩ পাশে ৪ বিনাশে ৫ মৃগন্ধবহেরি ৬ তোমা

জোয়ারের পানি যে নারীর বয়স।
যাবৎ না পড়ে ভাটি ভুঞ্জ-রতি রস ॥
হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাইবা শোক।
পুরুষ মিলাই দেম[১] ভুঞ্জ সুখ-ভোগ ॥
এত শুনি ময়নাবতী ভাবয় বিশেষ।
ধাঁই হই কহে মোকে পাপ উপদেশ ॥
তবে ময়না নিরখয় ধাঁইর লক্ষণ।
ব্যাধে যেন শর ছান্দি প্রবেশিছে বন ॥
এক তিল সুখ লাগি জন্মান্তরে পাপ।
তেকারণে কে বিনাশে জাতি কুল আপ ॥
তুই ধাই পাপী মোকে শুনাওসি পাপ।
এ বলিয়া ময়নাবতী করে অনুতাপ ॥
তবে রোষে বলে রত্না করি অতি কোপ।
হিতাহিত না বুঝসি বুদ্ধি পাইল লোপ ॥
প্রতি নারী রতি রঙ্গে বিলাসে অপার।
তোর লাগি ময়নাবতী সহস্র বিচার ॥
মলিন চিকুর তোর মলিন অম্বর।
মলিন দেখয় তোর চারু কলেবর ॥
নয়নে অঞ্জন নাহি সীসেত সিন্দুর।
ত্রিভঙ্গ খোপার লাস না দেখি তোহোর ॥
অঙ্গেতে চন্দন নাহি বদন ধূসর।
তাম্বুল বিহনে দেখি নীরস অধর ॥
কোন্ দুঃখে সুখ ভোগ তেজ ময়নাবতী।
আজুহ জনক তোর আছে ছত্র-পতি ॥
উত্তর দিলেক ময়না ধর্ম অনুস্মরি।
মোর কোন্ কার্য বল পিতা ছত্রধারী ॥
যে দুঃখ মোহর পরে পড়িয়াছে ধাই।
সে দুঃখ পড়োক গিয়া সতিনীর ঠাঁই ॥

মোহরা নন্দিনী চান্দ গোহারি সুন্দরী।
সীসের সিন্দুর মোর সেই নিছে হরি ॥
কাকে চাহি করিমু বিলাস ভেশ রঙ্গ।
রসপতি কান্ত মোর এড়ি গেল সঙ্গ ॥
এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ।
জগতে দোসর নাম না লইমু আন ॥
ফাটউক সে নারীর হৃদয় দারুণ।
এক ছাড়ি ভাবয় যে দোসরক গুণ ॥
মোহর ভ্রমরা স্বামী জগৎ পূজিত।
গোময়ের কীট কোথা ভ্রমরা তুলিত ॥
শত্রুহ না করে হেন[২] যে করিল লোরে।
বয়সে বিরহ-দুঃখ দিয়া গেল মোরে ॥
দীন ভাগ্য ফিরিলে সুহৃদ হয় বৈরী।
বিধি বক্র হৈলে কার শক্তিয় নিবারি ॥
যে পালয় প্রেমাঙ্কুর যাবৎ জীবন।
তার সঙ্গে প্রীতি-সূত্র বাড়ায় সুজন ॥
কাঁচা সুতা প্রায় ছিণ্ডে প্রেমাঙ্কুর যার।
কহন্ত দৌলত কাজি সে কি প্রেম সার[৩] ॥
ময়নার বচন যেন কুলিশের ধার।
দূতীর শ্রবণে যেন বজ্রের প্রহার ॥
সতীর সতীত্ববাণী শুনিয়া মালিনী।
উপায় বোলয় চিন্তি কপট ভাবিনী[৪] ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি ছাতনের ঠাঁই।
ময়না সঙ্গে ছাতনকে দিবারে মিলাই ॥
কোন্ ছলে করিমু ময়নার সত্য ভঙ্গ।
কোন্ বুদ্ধি মিলাইমু ছাতনের সঙ্গ ॥
ধনে তুষ্ট করিতে না পারি রাজসুতা।
বচনে না হয় বশ লোরের বনিতা ॥

১ দিমু ২ যেন ৩ সে প্রেম অসার ৪ ভামিনী, কামিনী

সতী কর্ণে দূতী উপদেশ না প্রবেশে।
পুণ্যের শরীরে কভু পাপ না পরশে॥
ঋতুমাস পরবেশ উপহাস্য ছলে।
কহিমু সুন্দরী যেন শুনে কুতূহলে॥
এথ ভাবি উপকথা কহে নানা রসে।
অনঙ্গ জাগয় যেন কুমারী-মানসে॥
খেদ পরে খেদ করি বলয় মালিনী।
সময় গঁইতে আছে কি কর কামিনী॥
অমূল্য রতন আয়ু শ্বাসে আইসে যায়।
রাখিতে না পারে বল, বিক্রম, উপায়॥
জীবন যৌবন রূপ চলয় নিমেষে।
নারী বৃদ্ধ হৈলে তারে না পুছে পুরুষে॥
যৌবন চলিয়া গেলে বিফল জীবন।
সংসার নরক[১] যার নাহিক যৌবন॥
দুর্লভ যৌবন জান লোকের কুশল।
যদি গেল কুশল কোথাতে কুতূহল॥

ধন নষ্ট হৈলে পুনি উপার্জনে পায়।
অগ্নি শেষ হৈলে পুনি পাথরে জন্মায়॥
চন্দ্র সূর্য অস্তংগতে[২] পুনি উগি যায়।
যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পায়॥
কৃপণের ধন যেন মূর্খের যৌবন।
কালে না খাইলে হয়[৩] শোকের ভাজন॥
বৎসর পরব[৪] দিনে পুনি হয় নব।
এত জানি নব রঙ্গ পুজে লোক সব॥
যার স্বামী ঘরে আছে করে রঙ্গ কেলি।
পরাধিনী মত কেন বঞ্চ শোকাকুলী॥
বল বুদ্ধি সিদ্ধি[৫] করি না পাও যাহাকে।
বৃথা অনুশোচ কর কুবুদ্ধি বিপাকে॥
ভার্যা হেন তোমাকে না পুছে লোর পতি।
অবধি গমিয়া গেল না আইল সম্প্রতি[৬]॥
তাহার কারণে তুমি এত দুঃখ সহ।
আপনা যৌবন সুখ সম্ভোগ না চাহ॥

বারমাস্যা

তোর দুঃখ দেখি ময়না মোর প্রাণী দহে।
রাজার নন্দিনী বালা এত দুঃখ সহে॥
প্রাণী মোর দহে দহে॥ ধুয়া॥

প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশে আষাঢ়।
বিরহিনী বিরহ বাড়য় অতি গাঢ়॥
মদন ঐষিক[৭] জিনি নিরখিলা[৮] ঘন।
শিখরে নাচয় শিখী ধরিয়া পেখন॥

নব নীর পানে মত্ত চাতক চপল[৯]।
পিউ পিউ উচ্চস্বরে ফুকারে মঙ্গল॥
কেহ নাচে কেহ গাহে সরস[১০] বিহঙ্গ।
দোলয় দম্পতি সব[১১] মদন তরঙ্গ॥

১ সংসারে না রৌক ২ অস্ত গেলে ৩ শেষে ৪ প্রথম ৫ সন্ধি ৬ সম্প্রীতি,
৭ অসিক; বিশিখ ৮ নীরকলা ৯ যুগল ১০ সারস ১১ সবে

আইসয় পন্থিক জন বধূ প্রেম গণি।
নির্জন সঙ্কেত[1] সুখ বরিষা রজনী॥
নিজ গৃহ অনুস্মরি আইসে বণিজার।
বরিষা নিকটে, কান্ত না দেখি ময়নার॥
যার ঘরে নিজ পতি করয় বিলাস।
কামাকুলী[2] কামিনী না ছাড়ে কান্ত পাশ॥
তুই[3] ময়নার দুঃখ দেখি বিরহে তাপিনী।
এ বলিয়া ভূমি পড়ি বিলাপে মালিনী॥

মালিনীর মিনতি

তোর দুঃখ দেখি মুই মরি যাম
বোলোঁ সহৃদয় বাণী।[4]
মালতী ভ্রমর[5] যেন সমাগম
চারু ছৈলা দেম আনি॥
দেখ ময়নাবতী প্রবেশ[6] আষাঢ়
চৌদিকে সাজয়[7] গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিয়া[8] পন্থিক
আইসয় নিজ মন্দির॥
যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পূরে মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী[9] রজনী
নির্জন সঙ্কেত-ঠাম॥
দারুণী[10] ডাউক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধ্বনি শুনিতে শ্রবণ বিদরে[11]
না সহয়[12] মনে মদন॥
যাবৎ বয়স কেলি কলা রস
পূরয় মনোরথ জানি।
হঠ পরিপাটি[13] মান উপরোধ
চাতুরি তেজ কামিনী॥

১ শঙ্কিত ২ কামাকুলী ৩ মুই ৪ বোলেঁ ছুরি দেও রানী, বোল ছাড়ি দাও রানী। ৫ ভোমরা
৬ প্রথম ৭ সাজে ৮ ভাবিতে ৯ তমসী ১০ দারুণ ১১ শ্রবণে বিরহিনী
১২ ছোহএ ১৩ পরিপট

বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী
ফিরি তাকে না পুছারি।
যাইব যৌবন নিশির স্বপন
জীবন দিবস চারি॥
হরি মধুপতি, আনম্[১] রসবতি
মতি ভোর তেরা[২] সাঁই।
অবধি অন্তরে ফিরি না পুছারে
আর কি তোর বড়াই॥
শুনহ উকতি করহু[৩] ভকতি
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেম
(যেন) রাধার কোলে কানাই॥
কহন্ত দৌলতে[৪] সতী সৎপন্থে[৫]
না তেজে যাবৎ প্রাণ।
লস্কর নায়ক রস বণিজ্জার[৬]
শ্রীযুত আশরফ খান॥

ময়নার উত্তর

আএ[৭] ধাই কুজনি[৮] কি মোকে[৯] শুনাওসি
বেদ উক্তি[১০] নহে পাটং[১১]।
লাখ উপায়ে মিটাতে কে[১২] পারয়ে[১৩]
যো[১৪] বিধি লিখিছে[১৫] ললাটং॥
আরে মালিনী, না বল না বল,
ধাই, অনুচিত বাণী।

১ মানো ২ তোর ৩ করহু ৪ দৌলৎ ৫ সৎপথ ৬ রস বাণী ধার
৭ আর; আরে ৮ কুটনি ৯ মুখ ১০ উকতি ১১ পাঠং ১২ কো
১৩ মাটিতে কি পাড়য়ে ১৪ যে ১৫ লিখল

ধরম না চাহসি[১]　　তেজি সতীত্ব মতি[২]
　　লোর-প্রেমে করাওসি হানি ॥
মোহর সুনায়ক[৩]　　গুণের পালক[৪]
　　মধুর মুরতি মুখ[৫] ভেশং।
সো মধু তেজিয়ে　　করাওসি বিষ পান[৬]
　　ভাল খাই কহ উপদেশং ॥
তুই বড় পাপিনী　　পাপ শুনাওসি
　　ধরম করাওসি বামং।
পাতকী ঘাতকী খাই　　কি মোক[৭] চিন্তসি
　　জাতি কুল কুরু[৮] নির্নামং ॥
দুরন্ত দুর্মতি দুতি,[৯]　　দূতীপনা দূর করো[১০]
　　চিন্তহ মোহর কল্যাণং।
কাজি দৌলতে ভণে　　দাতা মনোভব মনে
　　শ্রীযুত আশরফ খানং ॥

মালিনী ঃ

পুনি কহে মালিনীয়ে শুন ময়না রানী[১১]।
বিপরীত কহ কেনে কি হৈল না জানি ॥
এহ মাস গেল সতী না শুনিলা হিত।
আইল শ্রাবণ মাস দেখলো বিদিত ॥
শ্যামল সুন্দর ঋতু ঘন-চয়-রুচি।
নিত্য নব নীর বর্ষে[১২] সুনির্মল শুচি ॥
মেহ জলে স্নান করে বধূ জন সঙ্গে।
ললিত মদনে মত্ত পতি পত্নী রঙ্গে ॥
তিতিল সকল দেহ কুচে ধারা বহে।
উর্ধ্ব কুম্ভ মুক্ত[১৩] করি যেন বৃষ্টি সহে ॥
তিতিল অঙ্গেত যদি পাটম্বর শাড়ি।
অঙ্গে বস্ত্র লাগে যেন বস্ত্রহীন নারী ॥
তাতে নারী পুরুষের জন্ময় বিগার।
দোহ মধ্যে না রহয় বসন লজ্জার ॥
আনন্দের হিল্লোলে দম্পতি সব দোলে।
কর্মহীন বিরহিনী[১৪] কান্ত নাহি কোলে ॥
এতেক বুঝিও তুমি কর্মহীন নারী।
দুর্ভাগ্যের মত্তো বঞ্চ রাজার কুমারী ॥

১ না সো অতি　২ তেজিয়া সৎমতি　৩ সুনায়র　৪ সায়র　৫ সুখ　৬ কৈছে বিষ পানাও
৭ মোর　৮ করহ　৯ অতি　১০ কর　১১ বাণী　১২ স্পর্শে　১৩ মত্ত, রিক্ত
১৪ বিরহীর

অবধি গজিয়া গেল শুন ময়নাবতী।
এহ ঋতু পতি তোর না আইল সম্প্রতি ॥

গীত

কামিনী-মরমে মোহ রহে[১] বলবান।
জীবন যৌবন ধন আনন্দ নিদান ॥ ধুয়া ॥
শ্রাবণ মাসেত ময়না বড় সুখ লাগৌ।
ঝিমি ঝিমি বরিখয় মনোভব[২] জাগৌ ॥
ধরতী বহয় ধারা রাত্রি আন্ধিয়ারি।
খেলয় বধূর সনে প্রেমের ধামারী ॥
শ্যামল অম্বর শ্যামল খেত খেতি।
শ্যাম লখি দশ দিশ দিবসক যুতি ॥
খেলয় বিজলী মেহু-চামরের সঙ্গে।
তমসী ভীমশ্রী নিশি রঙ্গে বিরঙ্গে[৩] ॥
শ্রাবণে সুন্দর ঋতু লহরী উঘার।
হরি বিনে কৈসনে পাইব আমি পার ॥
খরতর সিন্ধুরব[৪] পবন দারুণ।
চৌগুণ বাড়িয়া যায় বিরহ-আগুন ॥
আকুল কামিনীকুল কামভাব ত্রাসে।
পিয়া-পাও বন্দয় যে রতি রস আশে ॥
জনমদুখিনী তুই রাজার দুহিতা।
বিফল সে নাম ধর লোরের বনিতা ॥
সুজন পিরীতি জান[৫] নিত্য নব মালা।
লস্কর নায়ক মণি জগ উজিয়ালা ॥

ময়না ঃ

মালিনি কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥ ধুয়া ॥

শ্রাবণেত গগনে[৬] সঘন ঝরে নীর।
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ[৭] শরীর ॥
মদন ঐষিক[৮] জিনি বিজলীর রেহা।
তর্কয়[৯] যামিনী কম্পয় মোর দেহা ॥
না বল না বল ধাই অনুচিত বোল।
আন পুরুষ নহে লোর সমতুল ॥
লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ।
কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ ॥
গরল সদৃশ পর পুরুষের সঙ্গ।
দংশিয়া পলায় যেন এ কাল ভুজঙ্গ ॥
তাহা সনে পালয় যে প্রেমের অঙ্কুর।
স্থির রহে জানি পিরীতি দুঃখে লোর[১০] ॥
বিরহ পীড়ায় ধনি জপ রতি[১১]-নাহা[১২]।
লস্কর নায়ক মণি রস গুণ গাহা ॥

১ মোহর ২ মনে ভাব ৩ অভিরঙ্গে ৪ সিন্ধুবর ৫ যেন ৬ শাঙন গগন
৭ পাপ ৮ বিশিখ ৯ তরক এ ১০ জানি রহে পিরীতি দুহু কূল ১১ জপ ইতি
১২ নেহা

মালিনী :

আইল ভাদর মাস গহীন গম্ভীর। দাদুরীর কল্লোলে জাগয় বিষধর॥
চতুর্দিকে বরিখে নিবিড় ঘন নীর॥ পঞ্চশরে পৃথিবী সকল কৈল বশ।
গর্জয় প্রচণ্ড মেহু-মণ্ডলী-নিশান[১]। সুরতি সম্ভোগ তেজে কাহার মানস॥
পাতাল শয্যাতে নাগ হৈল কম্পমান॥ দিনে দিনে জীবন যৌবন যায় তোর।
ঘোরতর রজনী দীর্ঘরি ভয়ঙ্কর। অখনেহ হিতাহিত না শুনিল মোর॥

ভাদ্র মাসে চন্দ্রমুখি, সুচরিতা কামিনি[২]
(একাকী) বসতি তিমিরে অতি ঘোরং।
অধর মধুরৌ তাম্বুল বিনা ধুসরৌ
নিচল চকোর আঁখি ঝোরং॥
(ময়নাবতী) তেজ নিজ মান পরিখেদং।
দুরন্ত বিরহানলৌ দহতি তব অন্তরৌ
তথাপি না চেতই[৩] ময়না চেতং॥
বক[৪] ফুল মঞ্জরী কিমিতি অতি সীদতি
মলিন অঞ্জন মুখ ভেশং।
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং॥
সিন্দুর বিনে শীষৌ মলিন কেশ ভেশৌ
কিমিতি মলিন তনুচীরং।
শূন্য সুমন[৫] তনৌ শূন্য পাট সিংহাসনৌ
শূন্য সুবর্ণ মন্দিরং॥
শেষ[৬] ঋতু বরিষণ নিষ্ফল, ধনি, বঞ্চসি
না গণসি[৭] হিত সুখ সারং।
এ ভব ভোগ সম্পদৌ কিমিতি, ধনি, বঞ্চসি
তব তাত জগ অধিকারং॥

১ বিষাণ ২ একাকিনী ৩ চেতন ৪ বন ৫ সে মন, শ্যামল ৬ শ্বেত ৭ গুনসি

ভণতি কাজি দৌলত দুতী চাটু পটু কৃত
সতী-কর্ণে অশনি সমানং[১] ।
লস্কর গুণমণি দানে কল্পতরু
শ্রীযুক্ত আশরফ খানং ॥

ময়না :

(আরে মালিনী) হাম[২] বড় দুঃখী অপরাধীরে ।
যে দুঃখ মোহর পরে পড়ৌক সতিনী শিরে,
চন্দ্রানী হইল মোর বাদীরে ॥ ধুয়া ॥

ভাদ্রের সম্পদৌ সুখে কি বিপদৌ
দুঃখ সম তনু বিনু লোর রে ।
দীর্ঘরি ঘোর নিশি একাকী জপি বসি
হরি বিনু মদন-হুতাশ রে ॥
মলয়া আগুন পরিমল বর্জন
বিষ সম তনু বিনু লোর রে ।
মোহরা-রাজ-নন্দিনী সে চান্দ গোহারিনী
লৈ গেল সে মোর সিন্দুর রে ॥
নটবর ভেশ রস রভস উল্লাস হাস
কি হেতু করিমু কি লাগি রে ।
যৌবন কালেতে হরি বিদেশে গেলেক ছাড়ি
হাম বড় বিরহ বৈরাগী রে ॥
চকা চকীরে[৩] জিনি রজনী দম্পতি বিনি
একাকিনী জাগি প্রেম-ত্রাসেরে ।
লোর বিনে লোর ঘোর নয়নে বরিখে মোর
তনু দহে মদন-হুতাশে রে ॥

১ অথ বিষ মানং ২ আমি ৩ চকীত

অবিরত হরি নিতি[1] জপ ইতি[2] কলাবতী
আন মনে সমতুল নহে রে।
শ্রীযুত আশরফ খান শুনহ সতীর গুণ[3]
কাজি দৌলতে রসে গাহে রে ॥

মালিনী :

আইল আশ্বিন মাস শরৎ নির্মল।
নব স্থতে গুথে পুষ্প যুবতী সকল ॥
রত্নায় বলে ময়না বুঝহ বিচারি।
সুখ হেতু কোন্ কর্ম মানবে না করি ॥
যেবা বল ধর্ম কর্ম সেহ আমি জানি।
আগে আপ্ত রক্ষা পাছে পিতৃ কর্ম মানি ॥
কার্য যদি সাধকে পারয় সাধিবার।
এহ[4] লোকে থাকি স্বর্গ পারে কিনিবার ॥
এতেক করন্ত লোকে প্রতি মাসে মাস।
দেব পূজা রঙ্গ রস আনন্দ উল্লাস ॥
বিচিত্র তারকা শশী শোভয় অম্বর।
জলে কুমুদিনী শোভে কুসুমে ভ্রমর ॥
ধবল শরৎ ঋতু উজ্জ্বল যামিনী।
নারী পুরুষের কথা শুনলো কামিনী ॥
যে নারীর পুরুষ না থাকে নিত্য পাশ।
বিফল সে রাজরানী[5] জীবন নৈরাশ ॥
বারে বারে কথেক বুঝাইমু তোকে আর।
শরতে সুহৃদ এক মিলাম তোমার ॥

আদেশ করহ ময়না মাগি পরিহার।
কুদশা লাগিল, বাণী না শুন আমার ॥
সুরপতি রূপ জিনি ছাতন কুমার।
অনঙ্গে এড়ল অঙ্গ সম্রমে[6] যাহার ॥
ভুবন মোহন রূপ ময়নাবতী বালা।
তোমা সনে উচিত ছাতন রতি কলা ॥
এতেকে না বুঝিলা পিরীতি আদি অন্ত।
গঞ্জিল শারদ ঋতু না আইল কান্ত ॥

সুন্দরি, তব চিত্ত কঠিন পাষাণ।
কুলিশে না ভেদে, কি এ[7] পঞ্চশর বাণ ॥ ধুয়া ॥

আশ্বিনে শুনলো রানী ঋতুর চরিত্র।
মনোহর অম্বর জান তারক[8]-বিচিত্র ॥
সুন্দর শুচিরুচি নির্মল যামিনী।
পুর লো মনোরথ পুণ্যবতি কামিনি ॥
সুন্দরি, সুচিত্ত তোর নিঠুর পাষাণ।
কোকিলার নাদ যেন পঞ্চশর বাণ ॥

১ লোর ইতি ২ জপয়তি ৩ গান ৪ ইহ ৫ রাজধানী ৬ সম্রাসে
৭ হিয়া ৮ তারকা

কৌতুকেত পরবে খেলয় সব নারী।
ভুঞ্জয় সুরতি-সুখ মদন-ভিখারী ॥
কান্ত সোহাগিনী নারী সকল উল্লাস।
জনম-বিরহী তুই মদন তরাস[১] ॥
বিকসিত বনে যেন কুসুম ললিত।
তেন মতে হৃদে তোর যৌবন ফুটিত ॥
করাঞ্জলি রতনায় নিবেদয় বাণী।
মধুবনে মধুকর মিলাইব আনি ॥
বুঝিলেক ময়নাবতী দূতীর চাতুরী।
গরল পিলায় যেন মধুরস জুড়ি ॥
শ্রীকাজি দৌলতে ভণে বিরচিত গান
গুণমণি নায়ক শ্রীআশরফ খান ॥

ময়না :

মালিনী, কি এ তুই ভোলাওসি রাই।
যেই সিংহাসন খঞ্জন খেলন
তাত তুই কাক সোয়াওসি আই ॥ ধুয়া ॥

কহে ময়নাবতী শুনহ দুর্মতি দূতি
আশ্বিনে কি মোক সুখ সার।
যত ইতি তুয়া বাণী শুনাওসি দোচারিণী[২]
তব মুখে পড়উক ছার ॥
আন বধূজন মিলি সম্পদ সুরতি কেলি
তাহে কি বোলসি মম ঠাঁই।
কুটিল[৩] কুজনী নারী পরের অঞ্চল ধরি
স্বর্গে যাইবারে মনে ভায় ॥
রঙ্গবতী[৪] যত সতী সুজন সনে পিরীতি
সে সব সতীর হয় খ্যাতি।
অনিত্য দেহ লাগি এক তিল সুখ ভুগি[৫]
হয় কেন জনম দুর্গতি।
যাহার যেমত বিধি নিয়ত[৬] মিলায় নিধি
তাহে কিবা গুণিগণে রোষে।

১ মদনে ডরাস ২ দ্বিচারিণী ৩ কুমন ৪ রসবতী ৫ ভাগী ৬ নিয়তি

হেরিয়া পরের ধন লোভে হয় হত মন
জনাধম[১] হয় কাপুরুষে ॥
কাজি দৌলত ভণে ধৈর্য ধরহ মনে
সত্য ঘট না টলায় বায়ু।
শ্রীযুত আশরফ করুণা সাগর রূপ
ভবানন্দে[২] বাড়ে চির আয়ু ॥

মালিনী :

কার্তিকেত কান্ত তোর গেল দিগন্তর।
বন পদ্ম এড়ি যেন গেল দিবাকর ॥
চন্দ্রানীর উদ্দেশে বিকল রাজা লোর।
চন্দ্রের উদ্দেশে যেন চঞ্চল চকোর ॥
হেন স্বামী গর্ব কর, পরের অধীন।
বারেক না লৈল বার্তা পুছি একদিন ॥
পুরুষ ভ্রমরা জাতি সম্ভ্রম না এড়ে।
যেই ফুলে মধু পায় তথা গিয়া পড়ে ॥
রমণী কুসুম জাতি নিজ স্থানে বৈসে।
মধু লোভে ভ্রমরা পুরুষ চলি আইসে ॥
বিমর্ষিয়া চাহ ময়না পরিহর রোষ।
কামাতুর জনের নাহিক কোন দোষ ॥
আগে আপ্ত সুখ ভোগ, পাছে তত্ত্ব আন।
পাপ পুণ্য হেন নাহি আছে কোন স্থান ॥
যেবা বল ময়নাবতী মৃত্তিকার কায়া[৩]।
মাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ আপ্ত মায়া[৪] ॥
মাটি মাটি করি ময়না কিবা বাখানিছ।
পরমার্থ মাটি ভেদ ময়না না জানিছ ॥
মহামায়া মাটি পরে বিধাতার দৃষ্টি।
মাটি মেলি[৫] রহিয়াছে ত্রিজগৎ সৃষ্টি ॥
মাটি মেলি[৬] স্থিতি[৭] স্বর্গ সুমেরু পাতাল।
কিবা দেব নাগ লোক অষ্ট লোক পাল ॥
সিদ্ধি পদ পুণ্য পদ পৃথিবীতে সব।
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব ॥
মাটি হস্তে রত্ন মণি রূপের প্রতিমা।
সৃজিয়া প্রকাশে বিধি আপন মহিমা ॥
পরম হংসের খেলা মাটির পাঞ্জর।
মাটি ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর ॥
মাটি হস্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল।
ছোট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল ॥
নানা রঙ্গে কেলি কলা[৮] উপজে[৯] বিলাস।
মৃত্তিকায় ভোগ পুনি মৃত্তিকা গরাস ॥
কে বুঝিবে মাটি-মর্ম পরম সংশয়।
হাসি খেলি যত ইতি মাটিতে মিশয় ॥
মাটি দেখি মাটি ভুলে মাটি মহামায়া।
মাটি শূন্য, স্থিতি[১০] মাটি, মাটি যুক্ত কায়া ॥

১ জন্মাধম ২ ভবানন্দে ৩ মায়া ৪ কায়া ৫ মেলে; মিলে ৬ মেলে; মিলে
৭ ক্ষিতি ৮ খেলা ৯ উপরে যে ১০ ক্ষিতি

মহামায়া-মাটি-মগ্ন হই যুবা জন।
নারীর লাবণ্য রূপে মজিয়াছে মন ॥
তরুমূলে গ্রাসি যেন ভুমি রহিয়াছে।
নারী-মায়া-পাশে তেন পুরুষ রহিছে ॥

গীত

আরে ময়না পরব দেওয়ালি।
রতি মায়া অতি
খেলে মঙ্গল ছত্রিশ জাতি পাঁতি,
আরে ময়না পরব দেওয়ালি ॥
সফল সব শুভ কাম।
শরৎ শিশিরে অভিরাম।
হরষিত শরীর সঘন পিয়াস ॥
বৈশ্যানী শূদ্রানী বৈরাগিণী নারী
পাটলি সকল কামিনী সারি,[১]
ময়নাবতী-পিরীতি বিরহ-হুতাশ ॥
ছাতন রতন সঙ্গে।
রুচয় তোমা মিলি অতি রঙ্গে
রজনী-সময় গমন কমল-ভঙ্গে
সুরতি রঙ্গে ভঙ্গে ॥
কাজি দৌলতে বচ ভণে।
জগতে না রহে দূতীর মনে।
খান আশরফ নায়ক সুবলী
ময়না, পরব দেওয়ালি ॥

ময়না :

আরে মালিনী বুঝ দেখি জগৎ বিচারি।
যত দেখ লোভ মায়া, যেন দর্পণের ছায়া
অল্প দিনে হয় আন্ধিয়ারি ॥ ধুয়া ॥

কি মোর কার্তিক মাসে পরব দেওয়ালি রসে[২]
কিবা সুখ সুচিত্র[৩] আকাশে।
যাহার নাহিক কান্ত দিবসে না দেখে পন্থ
কি করিব নিশি অভিলাষে ॥
সুললিত নর[৪] পিণ্ড কেবল মৃত্তিকা ভাণ্ড
দহনেত হয় ভস্মছালি।
হেন কোন্ মূঢ় আছে সে ভস্মছালির আশে
দুকুলে লাগায় মুখে কালি ॥

১ শাড়ী ২ বসে ৩ বিচিত্র ৪ জড়

আঞ্জন-মন্দির সম পাপকারী কুণ্ডাধম
পরশে লাগায় কালি অঙ্গে।
পাপ রসে মজি যাইমু পাছে কি উত্তর দিমু
যদি দেখা হয় লোর সঙ্গে ॥

মালিনী :

এই মাস গেল, সতি, দুখ পরিক্লেশে। এত কালে সংসারেত হৈলা বিরহিণী ॥
অগ্রান আইল নব খেতি নানা বেশে ॥ কোন্ সাধ পৃথিবীতে দুর্লভ তোমার।
নানা বর্ণ শস্য পুষ্প[১] পৃথিবী উজ্জ্বল। লীলায় মনের বাঞ্ছা পারো পুরিবার ॥
খঞ্জনের রঙ্গ দেখি বাড়ে কামবল ॥ যেবা বল সতী-স্থানে পাপ না পরশে।
চতুর্দিকে হিমময় বরিখে মণ্ডল। কাম ক্রিয়া পাপ নহে শাস্ত্র উপদেশে ॥
পতি সনে পুণ্যবতী করে কুতূহল ॥ মোক্ষ পদ কাম বর্গ ভুবন নিদান।
ভুঞ্জে নানা সাইল ভোগ সুগন্ধ বহুল। কামরসে মজিয়াছে পুরুষ প্রধান ॥
কর্পূর বাসিত পান সরস তাম্বুল ॥ ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত নহে কাম কেলি।
নানা বর্ণ রঙ্গিমা কোমল পাটাম্বর। রাধা সনে[৪] নিকুঞ্জে খেলয় বনমালী ॥
তনু সুখে শয়ন,[২] ভূষণ মনোহর ॥[৩] পুরুষ-বিদ্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী।
সুবাস কোমল শয্যা মদনের স্থলী। সেহ চোর-প্রেমে মজি হৈল কামাধিনী ॥
তাতে নারী ভাগ্যবতী পুরুষের কেলি ॥ জগতে প্রতিষ্ঠা দেবী কুন্তী পতিব্রতা।
হিমেত প্রবন্ধ ভোগে জীব আমোদিত। রুদ্রদেব-রূপ কল্পি হইল কামহতা ॥
সুগন্ধি শীতল জলে তৃপ্তি করে চিত ॥ সতী হেন কত গর্ব কর ময়নাবতী।
তোমার মন্দির-রুচি সুনির্মল সমা। মদনে লাঞ্ছনা করে কাহার শকতি ॥
বিচিত্র সুগন্ধি শয্যা দেখি মনোরমা ॥ এতেক তোমারে কহি হিতের বচন।
তাতে একাকিনী বঞ্চ দীর্ঘরি রজনী। পদার্থ না বুঝি কর আমাকে গঞ্জন ॥

(কামিনি) পতি-রতি হিমেত আনন্দা।
বহু প্রসারিব গুণ, কোরে হরি ভয় মন,
ভীত চিত শীত দুরন্তা ॥

১ শস্য ২ সুবর্ণ, বসন ৩ তনু-সুখ বসন ভূষণ মনোহর ৪ (মূলে) বিনু

অঘ্রাণ আইল নব সুগন্ধি সাইল সব
বিবিধ ক্ষেত ক্ষেতি শোভয় ।
সরস মাধুরী স্বরে শারি, শুক সঞ্চরে
মানিনী (কি) এমন সহয় ॥
সুগন্ধি চন্দন রচি[১], কান্ত সঙ্গে জাগি নিশি,
পুণ্যবতী সুরতি বিলাসে ।
দোহে যেন উন্মত্ত মন নাহি রহে শান্ত
লাজ ভয় প্রেমেত গরাসে ॥
সুজন পিরীতি মিলি[২] জলদ[৩]-বিজলী জলি[৪]
যাবৎ জীবন জগে স্থিতি ।
পুনি মরে পুনি জিয়য় তবু শশী না তেজয়
রোহিণী রমণী[৫] পিরীতি ॥
কাঁচা সুতা জৈসা লোরের পিরীতি তৈসা
চটকে লাগিয়া টুটি যায় ।
কাহে লাগি কামিনী তসু গুণ গুণি গুণি
চিন্তসি আপনা উপায় ॥
কাজি দৌলতে ভণে মালিনী যা লয় মনে
সতীক যুকতি নাহি তাতে ।
খান আশরফ নাহা নবীন নীরদ দেহা
বরিখে ধরম ধারা পাতে[৬] ॥

ময়না :

চল চল মালিনী বুঝিলুঁ নিদান ।
যত কহ মালিনী আন ফল জান ॥ ধুয়া ॥

আইল অঘ্রান মাস নব রঙ্গ ঋতু ।
মোর চক্ষে[৭] সব যেন[৮] অকুশল হেতু ॥

অন্তরে আগুন দিয়া দিগন্তরে কান্ত ।
বাহিরে কি করে, বহি[৯] হিম হতমন্ত ॥

১ রুচি ২ মানি ৩ জলদে ৪ জনি ৫ রজনী ৬ ধরাখাতে ৭ লক্ষ্যে
৮ জান ৯ রহি

কুলটা কুটনি ধনি মালিনী যে ধাই।
লাজ ধর্ম সব তোর দেওরে ভাসাই ॥
ধন-লোভে পাপবিচরণ ভালা দুতি।
পাথর ভরমে হের যেন মণি মুতি ॥
যে কিছু অনাহিত শুনাও বচনা।
সেমত উচিত ফল পাইবা রতনা ॥
যেই মুখে শুনাও সে সুহৃদক আশ।
তাহে দূতী কপটীর কণ্ঠ হবে নাশ ॥

এ সব শুনয় যবে জনক ভূপাল।
ছত্রপতি তোর শিরে বৈঠাইব কাল ॥
যে-ভেল সো-ভেল, পলটিয়া ঘরে যাও।
সুহৃদকে গিয়া নিজ কুশল জানাও ॥
নাহি অনুভাব কর নাহি করো লোভ।
শির সিনাও গিয়া সমাহিত ক্ষোভ ॥
কাজি দৌলতে ভণে সরস সুধীর।
শ্রীযুত আশরফ নায়ক উজির ॥

মালিনী :

এই মাস গেল সতী ভাবিতে চিন্তিতে।
হিমময় পৌষ মাস আইল বিদিতে ॥
হিমে অঙ্গরাগ ভোগ বসন ভূষণ।
হৃদয় কম্পিত হিমে কম্পিত দশন ॥
একাকিনী নারী হিমে সদায় সীদতি।
ভাগ্যবতী কেলি করে লই নিজ পতি ॥
হিমেত স্বামীর কোলে আনন্দ অসীম।
পতি ভার্যা ক্রিয়া করে ভয়ে ভঙ্গ হিম ॥
সর্ব কলা পূর্ণ রামা চন্দ্রিমা সমান।
কামিনী সভাতে করি তোমার বাখান ॥
নানা গুণে বিশারদ পতিব্রতা রানী।
তোমা সঙ্গে কি কহিমু রঙ্গের কাহিনী ॥
তোমার প্রতিষ্ঠা শুনি যুবক সকল।
কুসুমের গন্ধে যেন ভ্রমরা বিকল ॥
তোমার হিতের হেতু মোর নিবেদন।
তুমি কেনে মোকে মিষ্ট না বল বচন ॥
আদেশ করহ রামা মাগম পরিহার।
শরতে সুহৃদ এক মিলাম তোমার ॥

কামিনি রস খেলহ বহু রঙ্গে।
মিলাইয়া দেম ছৈলা ছাতনের সঙ্গে ॥ ধুয়া ॥

পৌষ মাসেত হিম দশ দিক গাড়ি।
হিমেতে জরিয়া যায় যৌবনক নারী ॥
সুশীতল সুমন্দির শীতল মশারি।
শীতল যে সিংহাসন শীতল উয়ারী ॥
পিয়া বিনু শীতে তনু জরি গেল যার।
মায়ার তরাসে দোহে হিয়ার অন্তর ॥
কম্পয় দশন আঁখি আর ঝরে বারি।
গৌরব না ছাড়ে কেনে রাজার কুমারী ॥
মালঞ্চ-মধুপ মধু-রসে বশ হই।
লোরক চকোর, চন্দ্ররানী চান্দ সেই ॥
দীর্ঘরি রজনী বৈরী হইল তোমারি।
কোথায় যে কান্ত তোর কোথায় মাধুরী ॥
অবধি গঞিয়া গেল না আসিল লোর।
না পুরিল কাম কলা রতি-রস তোর ॥

মালিনী মিনতি করি নিবেদয় বাণী।
ধীর[১] জগৎ ভোগ লও অনুমানি ॥

কাজি দৌলতে ভণে এহি রস গান
গুণমণি নায়ক শ্রীআশরফ খান ॥

ময়না :

মালিনি, মোর মনে আন নাহি ভায়।
নয়নের জল দিয়া, সে পদ ধোলাইমু গিয়া
যদি বিধি সে বন্ধু মিলায় ॥ ধুয়া ॥

পৌষ মাসেত ধাঁই হায় বড় দুঃখ পাই
শীতে জরি যায় মোর জীউ।
না মাগম সুর পদ রাজরানী[২]-সম্পদ
যাবতে মিলায়[৩] সেই পিউ ॥
প্রাণের দুর্লভ কান্ত দেখিলে হৃদয় শান্ত
আঁখি যুগে পিয়াব আনন্দ[৪]।
মধুর-মুরতি পতি আলোল-বিলোল গতি
অমৃত মণ্ডলী মুখ-চান্দ ॥
করাত দেয়ন্ত লোরে যদি মোর শির পরে[৫]
না দোলয় দেহ যে আমার।
সতী নামে ময়নাবতী জগতে রাখিমু খ্যাতি
মরণেত মুক্ত স্বর্গ-দ্বার ॥
জীবন যৌবন ধন প্রিয় বিনে অকারণ
ভব-সুখ গরল সমান।
সঙ্কর নায়ক[৬] গুণের পালক[৭]
রসপতি আশরফ খান ॥

১ সুধীরে ২ রাজধানী ৩ পিলায় ৪ হিয়ার আনন্দ ৫ যদি মোর শিরে পড়ে
৬ নাগর ৭ সাগর

মালিনী :

এই মাস গেল সতী মাঘ পরবেশ।
সময় গমিতে আছে কি করি বিশেষ ॥
প্রবেশ করিল মাঘ পঞ্চমী মঙ্গল।
যুবক বালক বৃদ্ধ আনন্দ সকল ॥
ঘরে ঘরে পঞ্চমী পূজয় নর-নারী।
নগরে নগরে যেন আনন্দ লহরী ॥
কৌতূহলে ছোট বড় ভুঞ্জে রতি কলা।
বিরহ-সাগরে কেন মজি যাও বালা ॥
বিমনা না হও বালা শুন হিত সার।
নগরেতে আছে এক পণ্ডিত কুমার ॥
সকল ধারেত[১] শিক্ষা সুধীর সুজন।
দর্শনে পুলক তনু আনন্দ নয়ন ॥
কি কহিমু সে রূপের মহিমা অপার।
অঙ্গের ত্রিভঙ্গে কত অনঙ্গ বিহার ॥
কর্মেত কুশল বড় মর্যাদা পণ্ডিত।
পূর্ব প্রেমে পালে নিত্য যেন নব নিত ॥
প্রীতি-রসে মরে সেহ পিরীতে জীবন।
প্রেম[২] পরিচর্যাতে সদাই ভক্ত-মন[৩] ॥
স্বরূপা[৪] কামিনী যদি পায় সে সুজন।
দৃষ্টির অন্তরে নহে তিলেক বিমন ॥
সুহৃদ দেখিয়া হয় প্রসন্ন বদন।
তৃপ্তি-বৃন্দাবনে নিত্য[৫] তোষে মিত্রগণ ॥
যার সঙ্গে হয় তার অনুভাব প্রীতি।
দিনে দিনে বাড়ি যায় যেন চন্দ্রাকৃতি ॥
তুমি হেন নারী যদি মিলয় তাহার।
চক্ষুর উপরে রাখি পূজিব কুমার ॥
তাহা সনে প্রীতি যুক্ত সঙ্গম তোহর।
মরকতে কাঞ্চনে লাগয় যেন জোড় ॥
এত ভাবি কার্য যদি না কর সম্প্রতি।
শেসে কি বিকল রামা যুয়ায় পিরীতি ॥
ঋতু মাস বহি গেল কার নহে সার।
পাইতে কঠিন পুনি পঞ্চমী বিহার ॥

এত দুঃখ সহে রে, তোহর হৃদয় না[৬]।
তোহর পামর বরে বারেক না পুছে তোরে
তার কি গৌরব আর কর রে ময়না ॥ ধুয়া ॥

মাঘ মাসেত লো শ্রীপঞ্চমী উজ্জ্বল
রস বহু রঙ্গ কুশল।
এহেন সুদিনে তোর পতি সনে
চন্দ্রানী পূজয় মঙ্গল ॥

১ ধীরতা ২ পাভ ৩ পাভ পরিচর্যাতে সদয় ভক্তমন ৪ স্বরূপা ৫ চিত্ত
৬ মূলে 'না' নাই

শিশু হস্তে প্রীতি দোহান আরতি
বাড়াইল বহুল আদরে।
এবে লোর চিতে তোমাকে স্মরিতে
বটেক মূল না করে ॥
ভালা সঙ্গে যাইও ভাল ফল পাইও
কুশলে রজনী গোমাই।
কুসঙ্গ সঙ্গতি হয় মন্দ গতি
কোলের রমণী হারাই ॥
দৌলত ভণয় মালিনী শুনয়
ময়নার মনের সাধ।
খান আশরফ রস অনুরূপ
খণ্ডউক মন-বিবাদ ॥

ময়নার খেদ :

কি হৈল জঞ্জাল রে।
যৌবন জঞ্জাল জাল ধাঞি হৈল মোর কাল
কি মোর জীবন রে ॥ ধুয়া ॥

মাঘের পঞ্চমী কি মোর গুণ।
কামপুরে মোর হৈল শূন ॥[১]
তাতে ধাই কহে রঙ্গের বাণী।
ঘায়েত লবণ মিলায় আনি ॥
হাস্য পরিহাস্য বিকল ধাই।
মুই ত ব্যাকুল[২] সাঞি হারাই ॥

চারু সঙ্গ নিতি[৩] করৌ বিচার।
ধাই হই করে কুলের খাঁকার ॥
কাহার নন্দন কাহার নাতি।
কি জানি ছাতন কি কুল জাতি ॥
নগরিয়া লোক নগরে থাকে।
শত মুখে ধাই বাখানে তাকে ॥

১ পুথিতে ইহার পর তিন ছত্রে উপরের ধুয়া অংশ এই ভাবে আছে : কি মোর জীবন রে। জীবন-যৌবন জঞ্জালি-জাল। ধাঞি হৈল মোর প্রাণের কাল। [প্রা. পু. বি ,পৃ. ৪৫]

২ মুই এবে আকুল ৩ নিতে

কথ কথ মুই শুনিমু বোল।
ঘাটে বসি মুই হারাইলুঁ কুল ॥
কুলটা মালিনী কুপন্থে চলে।
মোকেহ কুপন্থে লৈ যায় ছলে ॥[১]
কাক সঙ্গে সুখ মিলাইতে চাহে।
ঘাটে নৌকা নিয়া ঘাটেত লাগাহে ॥
ধাই জন হয় জননীর তুল।
সে কেন কহে এতেক কুবোল ॥
ধাই হেন মোর না লয় মন।
পুণ্য ছাড়ি কহে পাপের বচন ॥
সহজে মালিনী জাতিতে হীন।
হীনের পিরীতি মরণ-চিন ॥
কাজি দৌলতে ভণে বিচারি।
শ্রীআশরফ খান মুরারি ॥

মালিনী ঃ

এহ মাস গেল সতী না শুনিলা সার।
আইল ফাল্গুন মাস ফাগুর বিহার[২] ॥
প্রবেশিল সময় ফাল্গুন চারু-ভেশ।
পতি সনে রসবতী আনন্দ বিশেষ ॥
সুরঙ্গ ফাগুর গুঁড়া পরিয়া সকল।
হরি গুণ গাহে সবে নগরে মঙ্গল ॥
বিবিধ সুগন্ধি সব করিয়া ভূষিত।
গাহয় হরির গান[৩] হুই হরষিত ॥
সুবিচিত্র পাটাম্বর কোঙ্কা পরিধান।
অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গ[৪]-শোভা কেয়ূর কঙ্কণ।
বান্ধিয়া পাটলি-চূড়া[৫] কুসুমে জড়িয়া।
বাহান্ত তবল তাল যুবক মিলিয়া ॥
মৃদঙ্গ কর্তাল বাজে কহন না যায়।
ত্রিভঙ্গ মোহন ভেশে মৃদঙ্গ বাজায় ॥
হেলি ঢলি বাহে তাল ভ্রময় মধুর।
হরি গুণে পদ গানে হরিষে অন্তর ॥
খেলয় নাচয় ফাগু-রঙ্গ দশ দিশে।
মৃত্তিকা প্রতিমা কেহ দোলায় হরিষে ॥
পতি সঙ্গে রতি পুরে সকল কামিনী।
তোর সঙ্গে বিরহ বৈসয় একাকিনী ॥
স্বামী না পুছয় বালা[৬] জীবন কঠিন।
ঝামর নলিনী যেন সলিল বিহীন ॥
আপনার ভাগ্যফল তেজ কি কারণ।
দিন দুই সুখভোগ অথির জীবন ॥
এথ জানি ময়নাবতী কর অবধান।
ফাল্গুনে বলিমু গীত মাধুরী[৭] সমান ॥

১ মোহকে কুপন্থে লই যাইতে ছলে। ২ বাহার ৩ গুণ ৪ অঙ্গ ৫ টালনি চূড়া
৬ বার্তা ৭ মধুরই

(কামিনি), ফাগুনে ফাগু বিলাসা।
চৌদিকে সুন্দরী ফাগু আঙ্গে[১] ভরি,
ধাবয় মদন পিয়াসা ॥ ধুয়া ॥

ফাগুনে দেখ সখি, ফাগুনের রঙ্গ[২]
সবে মিলি ফাগু বসাই।
রতি রস খেলাই, প্রিয়া পানে চাই,
আনন্দ উৎসব বহাই[৩] ॥
লাল কুসুম রেণু লাল সিন্দুর জনু
লাল সব তনু সাজে।
সব যেন লাল কুসুম বিকশিল
পান্তরে পন্থেত বিরাজে ॥
নিশি নিশাকরে[৪] বরিখয়, আহারে,
সঞ্চারে মধুর তুষার।
জরা যুবা বালক সব রসে পুলক
বিরহিণী হৃদয় বিদার ॥
মৃগমদ সৌরভ কুঙ্কুম পরিমল
পাটবাস ললিত অঙ্গে।
রঙ্গিনীয়ে রঙ্গে সুমঙ্গল গায়ত
নাচত তাল মৃদঙ্গে ॥
মালিনী ভোলাঅয় কামিনী দোলাঅয়
মাতই সকল গুণ-মৌলি।
কাজি দৌলতে ভণে লস্কর আশরফ
রভসে দোসর বনমালী ॥

ময়নার খেদ

মালিনি, কি মোর ফাগুর বিলাসা।
নিদাঘ শরৎ বর সম্পদ জানে মোর
অন্তরে তাপ তরাসা ॥ ধুয়া ॥

১ পাঙ্গে ২ ফাগুন করে রঙ্গ ৩ (মূলে) চোহাই ৪ নিশাতে নিশাকরে

ফাগুনে কোন্ গুণ রঙ্গিমা ফাগুন
কুঙ্কুম সৌরভ সিন্দুর।
খেলি, কেলি, মেলি, সকল গেল মেরি,
যদি গেল কান্ত সে দূর॥
সরোবর সো হল মলিন নলিনী দল
নীর বিহু জনি শুকি যায়।
ঢলি[১] যায় যৌবন টুটয় জীবন ধন
হরি বিনে মরণ সে ভায়॥
হিম দীর্ঘরি নিশি শিহরে মন্দানিল
বিষ বরিখয় জনি সন্ধ্যা।
জনিরে কমল দল দহয় বিরহী-মন
শিশির ঋতু বড় মন্দা॥
না লক্ষি দিবস রবি মলিন জ্যোতি সবি
সঞ্চরে পবন দারুণ।
গরল তাহে জানি হৃদয়-মনে মরি[২],
কি করিব ফাগুনী আগুন॥
কাজি দৌলতে ভণে শুনহ ময়না মনে
সত্যহি ধরম পদ সার।
শ্রীযুত আশরফ মহিমা সায়র
সুর-তরু[৩] জগে অবতার॥

মালিনী :

তবেহ নিলাজ দূতী নটক কুজনি।
ময়নার বিদিতে কহে চৈত্র ঋতু পুনি॥
চৈত্র-রুচি চূতাঙ্কুর বিচিত্র পল্লব।
ক্রীড়া করে কোকিল, কাকলি কলরব॥
নবীন মঞ্জরী পুঞ্জে কুণ্ডল রচিত।
বল্লী, মল্লি পরাগে কানন সুশোভিত॥
বিবিধ কুসুমগণ কাননে বিকাশ।
তারক পটলে যেন শোভয় আকাশ॥

১ ঢলি ২ হৃদয়ে বাণ মারি ৩ সুরগুরু

নব তরু পত্র বনে শোভে কিসলয়া।
বসন্ত পবন বহে সমীর মলয়া ॥
মলয়া পবন দেখি আনন্দের স্থলী।
সকল দম্পতি মিলি করে রতি কেলি ॥
ডালে ডালে পাখী সবে রঙ্গ ক্রিয়া করে।
জলে ক্রিয়া করে জলবাসী জলচরে ॥
বনে ক্রিয়া করে বনবাসী চলাচল।
যার যার হাস্ত ক্রিয়া করেন্ত সকল ॥
তুমি কেনে কাম ক্রিয়া রতি রঙ্গ হীন।
একসরী বসন্তে বঞ্চিবা কথ দিন ॥

না জানি কি হৈল তোর পূর্ব পাপ ফলে।
যৌবন সময় দহে বিরহ অনলে ॥
রতিরস বর্জি তনু পাষাণ সমান।
মৃতদেহে যেন না পরশে পঞ্চবাণ ॥
পঞ্চবাণ না পরশে শরীর যাহার।
মরণ সমান জানি জীবন তাহার ॥
যাহার জীবন হয় মরণ সমান।
তা হন্তে আছয় কি সংসারে অপমান ॥
এই মাস গেল সতি না শুনিলা হিত।
মাধবীতে মধুর বলিমু এক গীত ॥

(কামিনি) রতিরস খেলে সোহাগী।
এহ ঋতু বিলাস বিমুখ বিস্বাদ[১] রস
জনম পরম দুঃখ ভাগী ॥ ধুয়া ॥

আইল সুরুচি মধুমাস মধুঋতু[২]
চৌদিকে কুসুম বিকাশ।
মলয়া কোমল মল্লি পরিমল
প্রসবিত কুঞ্জ সহাস ॥
নব চূত অঙ্কুর কিসলয় মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কল কল কুজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে ॥
কেতকী চম্পক কদম্ব কুরুবক
বকুল মুকুল কুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধু পানে মধুকর
মানিনী-মান এবে ভঙ্গে ॥
কৈতব পরিহাসে মালিনী মধুভাষে
সতী-মতি দোলাইতে চাহে।
কাজি দৌলতে ভণে জানে তান যশ মানে
আশরফ খান সুনাহে ॥

১ বিচ্ছেদ ২ রীতি

ময়না :

কহে ময়নাবতী শুনহ দুর্মতি দূতি
মরম না বুঝ পরেয়র[১] ।
হও জনি সকল জীবধারি-মানস[২]
সবারে শুনাও প্রেম ওর[৩] ॥
নব ভ্রমরায় ভ্রমি কুসুম সমূহ দেখি[৪]
এক তরে[৫] সঙ্গী নাহি পায় ।
তা হেতু মধুকর অবহু নিরাকুল
তরু চারু খুঁজিতে[৬] বেড়ায় ॥
মানিত জনে জানে[৭] মান-সর[৮] বিশাল,
মরু সম মোর এই মাস ।
যেই বল হাস্য বিলাসে চৌদিশ
বিরহীক সেই উপহাস ॥
পিয়া বিহীন যত মধুরস করি কত
মাধুরীহ বিষসম তাহে ।
আশরফ যে নায়ক জীবন বাড়ুক লাখ[৯]
কাজি দৌলতে রস গাহে ॥

মালিনী :

এহ মাস গেল সতি লোর গুণি গুণি ।
আইল মাধবী মাস ঋতু রাজ পুনি ॥
ঋতু মাস[১০] আইল বৎসর ফিরি ফিরি ।
না ফিরে জীবন, যবে জীব যায় মরি[১১] ॥
চলিতে যৌবন যায় যেন স্রোতোধার ।
তাতে কত সহিবা বিরহ দুঃখ-ভার ॥
কাণ্ডারী-বিহীন[১২] নৌকা স্রোতে ভঙ্গ হয় ।
পুরুষ বিহনে নারী জীবন সংশয় ॥

১ অপরের ২ মাণুষ ৩ তোর ৪ চুমি ৫ একত্রে ৬ খুঁজিয়া
৭ মানিনী জানে মনে ৮ মান রস ৯ ভাক ১০ রাজ ১১ (মুলে) হরি ১২ বিহীনে

আর কিবা তোমাকে করিমু উপদেশ।
সর্বকলাযুতা তুমি বিদ্বান্ বিশেষ॥
তবে ময়না অল্প আমি কহি বারে বার।
আইল বসন্ত, কান্ত না আইল তোমার॥
বিকশিত হৈল যত নব উপবন।
নব দলে মেলে যেন নৃপতি মদন॥
সুচরিত পুরুষ, রমণী কলাবতী।
দোহার হৃদয়ে কাম-নৃপতির স্থিতি॥
যেই দেশে নাহি নৃপ পাট মনোরম।
সে দেশের লোক পশু, দেশ বন-সম॥
যাহার বিনোদ চিত্তে বৈসে কামস্থলী।
প্রথমে তাহার চিন প্রেম, প্রীতি, মেলি॥
যাহার হৃদয়ে নাহি প্রেমের সন্ধান।
রূপে নরাকৃতি সেই হৃদয় পাষাণ॥
প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া কাম-নৃপ-সখা।
এ সকল মিত্র সঙ্গে কারো নাহি দেখা॥
মহা দর্পী কাম-রাজা ত্রিলোক পূজিত।
যার বাণে অষ্ট দিক কামে বিমোহিত॥
বলবন্ত শক্রক না গণে তৃণবত[১]।
যার বাণে বেষ্টিত শঙ্কর উন্মত্ত॥
হেন কাম-নৃপ সেবা তুমি পাসরিলা।
বিরহ সাগরে পড়ি শোকেত মজিলা॥
শরৎ বসন্ত ঋতু শীতল যামিনী।
পতি সনে রতি ক্রিয়া না দেখি কামিনী॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে না দেখি বিহার।
শ্মশান-পাষাণ হেন শরীর তোমার॥

যে তোমাকে না ইচ্ছয় তাকে ইচ্ছ বর[২]।
ইচ্ছিব যে সুহৃদকে শক্র তুল্য কর॥
অবিচার কার্যেত, ময়না, তোমার বিশেষ।
অবিচারে দুঃখ পাও, উন্মত্তের ভেশ॥
সাধিলে যে নহে সিদ্ধি কি ফল[৩] আরাধি।
লোর হেতু বৃথা কর তপস্যা সমাধি॥
তোমা পাসরিয়া লোর গেল দিগন্তর।
তাহার উদ্দেশে তোর কি ফল অন্তর॥
যে জনে তোমাকে তেজি গেল অন্য দেশ[৪]।
বৃথা অনুশোচ কর তাহার উদ্দেশ[৫]॥
গোহারি দেশের রাজা মোহরা নৃপতি।
তাহার দুহিতা যে চন্দ্রানী কলাবতী॥
শুনিয়াছ অবশ্যই চন্দ্রানী বাখান।
পূর্ণিমার চান্দ নহে তাহার সমান॥
সে রূপ নির্মিল বিধি মহিমার বলে।
আকাশের চন্দ্র যে সৃজিল মহীতলে॥
সেই চন্দ্রানীর রূপে মজিলেক লোর।
চন্দ্রের সহিত যেন চঞ্চল চকোর॥
পঞ্চ-প্রাণী লোরের সে চন্দ্রানী কুমারী।
তোমা হেতু আসিব কি চন্দ্রানী-প্রেম ছাড়ি॥
লোর হৈল চন্দ্রানীর কণ্ঠমণি হার।
সেই নাগ-শিরো-মণি চাহ ছলিবার॥
দহিবা নাগের বিষে না পাইবা মণি।
সামান্য সতিনী তোর না হয় চন্দ্রানী॥
বিফলে জনম যায় শুনলো সুন্দরী।
মাধবীর এক গীত[৬] কহিব মাধুরী॥

১ তৃণবৎ ২ ইচ্ছা কর ৩ বিফল ৪ দেশে ৫ উদ্দেশে ৬ গীতে

মাধবি মাসেত প্রসব বিকশিত
মধু বাত বহেন্ত।
শ্যামল কোমল ধীর সুশীতল
সঞ্চারিছে দিবসান্ত॥
কামিনী হের লো কেমন সুন্দর
দেখ ঋতুপতি সাজে।
কোমল মলয়ানিল মধু স্রোত সঞ্চারে
বনজ[1] কুসুম রাজে॥
শুচি-রুচি-শীলা পুনি নব বিলাসিনী[2]
নব পল্লবে[3] অতি সাজে।
মাধুরী লোভেত মধুকর ঝঙ্কত
পিবই[4] রস ভ্রমি ভ্রমি গাজে॥
দৌলতে ভণতি সরস ঋতু পতি
বিরহিণী মানস তাহে জাগে।
আশরফ নায়ক মনি, কীর্তি দিগন্ত জিনি
বহতি মরুৎ কুসুম পরাগে॥

ময়না।

(মালিনি), ভাল হিত জানাওসি পাই।
স্ত্রী হব পরেয়া[5] পিরীতি দুরীত[6]
সুহৃদক দেশে ভাসাই॥ ধুয়া॥

কি এ মধুময় মাধবি সময়
মাধবী মালতী মাল।
লোর বিনু আমার[7] হৃদয়মণি হার
ভেল বিষলতা জাল॥

১ মনোজ্ঞ ২ বিলাসিলা ৩ পল্লব ৪ পিয়ে ৫ অপরের ৬ দূষিত
৭ হামার

যে বল কোমল মলয়া পবন[১]
লোর বিনু সেহ হয় মন্দ।
কোথায়[২] বসন্ত আসে উদ্‌ভ্রান্ত
গরল উদ্‌গারে চান্দ ॥
কুলটা কুটনি, শুনহ মালিনি,
গুণে ও জাতিএ[৩] হীনী।
তোহর কুকৃতি আকৃতি বিকৃতি
ছলিতে লোর কামিনী ॥
যবে ইহলোকে না মিলে লোরকে
পরলোকে হইব সঙ্গী[৪]
খান আশরফ পুরৌক মনোরথ
নব ঋতুপতি-ভঙ্গি[৫] ॥

মালিনী :

জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ বৎসর হইল শেষ
দুঃখ-দশা না গেল তোমারি।
দিনে দিনে পীড়া বাড়ে বিরহের শোকান্তরে
চন্দ্রকলা যেন যায় জরি ॥
বহয় পবন মন্দ বাজায় মদনে দ্বন্দ্ব
হৃদে জাগে বিরহ অনল।
পতি-রতি-ক্রিয়া গেল কান্ত আর না দেখিল
শরীর দগধে শ্রম-জল ॥

দৌলৎ কাজি কৃত অংশের সমাপ্তি

১ [illegible] ২ কতহো ৩ গুণে ও অগুণী, জাতিতেও ৪ লইব সঙ্গ ৫ রঙ্গ

পরিশিষ্ট

(ক)

[আলাওল-কৃত শেষাংশের কথা]

গ্রন্থের ভূমিকায় পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কবি দৌলৎ কাজি তাঁহার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত কাব্যাংশই এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহার অসমাপ্ত গ্রন্থ কবি আলাওল সমাপ্ত করেন। আলাওল-রচিত কাব্যাংশ এই গ্রন্থে না দেওয়ায় পাঠকের মনে কাহিনীর শেষাংশ সম্বন্ধে জাগ্রৎ কৌতূহল অনিবৃত্ত থাকিবে বলিয়া এস্থলে ইহার সারাংশ সংক্ষেপে দেওয়া হইল। দৌলৎ কাজি তাঁহার আরব্ধ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঠিক কি ভাবে করিতেন বলা সম্ভব নহে। তবে কবি আলাওল এই কঠিন কাজটি যে ভাবে সম্পন্ন করেন তাহা কাহিনীর নিম্নপ্রদত্ত সংক্ষিপ্তসার হইতে উপলব্ধি করা যাইবে। আলাওলকৃত অংশের সংক্ষিপ্ত সার :

প্রথমে প্রভু নিরঞ্জনকে প্রণাম করিয়া কাব্য আরম্ভ করিতেছি। রোসাঙ্গের পূর্বতন অধিপতি সুধর্মের সময়ে তদীয় অমাত্য আশরফের আদেশে দৌলৎ কাজি লোর-চন্দ্রানীর যে-কাহিনী সমাপ্ত করিবার পূর্বেই স্বর্গে গমন করেন তাহা সমাপ্ত করিবার ভার শ্রীচন্দ্র সুধর্মের মহাপাত্র সোলেমান কর্তৃক আমার (আলাওলের) উপর ন্যস্ত হইল। "আদেশ-কুসুম তান শিরেত ধরিয়া। হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালী রচিয়া ॥"[১]

মালিনী রত্নার অসৎ প্রস্তাবে ময়না কিছুতেই রাজি না হওয়ায় মালিনী ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। ছাতনের নিকট কি করিয়া নিজের মুখ রক্ষা করিবে ইহাই তাহার ভাবনা। তাই শেষ চেষ্টা করিয়া জ্যৈষ্ঠের দাব-দগ্ধ প্রকৃতির মধ্যে শীতল আনন্দের ব্যবস্থা হিসাবে ময়নাকে যৌবন বৃথা না কাটাইয়া নাগরের সহিত মিলিত হইবার উপদেশ দিতে লাগিল। কিন্তু ময়না ঠিক পূর্ববৎ তেজের সহিতই সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। মালিনী তথাপি আবার তাহার পাপ-প্রস্তাব উত্থাপিত করাতে এবার ময়নার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। রত্নার কল্পিত ধাত্রীত্বে এইবার অবিশ্বাস করিয়া ময়না কহিলেন "আজু সে জানিলুম তুই ছাতনের দূতী। কদাচিৎ ধাঁই মোর না হসি দুর্মতি ॥"[২] অতঃপর "দ্রৌপদী হরণে যেন কীচকের গতি"[৩] সম্পূর্ণ না করিলেও মালিনীকে বেশ করিয়া উত্তম মধ্যম দিয়া মুখে চুন কালি মাখাইয়া তাহাকে গর্দভ-পৃষ্ঠে নগর ঘুরাইয়া দূর করিয়া দেওয়া হইল।

অতঃপর ময়নার বিরহ-ব্যথা নিতান্ত দুঃসহ হইলে তাঁহার প্রিয়সখী তাঁহাকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ-ক্রমে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে একটি সুদীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করিল। সংক্ষেপে গল্পটি এইরূপ :

১ স. ম. পৃঃ ১১০ ২ পৃঃ ১১৭ ৩ ঐ

ধর্মবতী নগরীর রাজা উপেন্দ্রদেবের প্রধানা মহিষী রতনকলিকা রাজার কোনো প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে সুখ দুঃখ সমস্তই ভাগ্যের অধীন এবং ভাগ্যে সুখ থাকিলে কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারে না। ইহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া গর্ভবতী মহিষী রতনকলিকাকে আপন অঙ্গুরীমাত্র অভিজ্ঞান দিয়া খাদ্যদ্রব্যসহ মাঞ্জসে পুরিয়া "ভাসাইয়া দিল কুল আদেখা করিয়া।"[১] "এইমতে একমাস ভাসি সিন্ধুজলে"[২] তরণী আসিয়া রত্নপুরের উপকূলে লাগিল। সেখানে নামিয়া রাজ্ঞী বনমধ্যে আশ্রয়-সন্ধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—"বাল্মীকি কাননে যেন জানকী গর্ভিণী।"[৩] সহসা এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে পিতা ও তৎপত্নীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া তদাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। এইখানেই গর্ভবতী রতন-কলিকা এক পুত্র প্রসব করিলেন এবং তাহার নাম রাখা হইল আনন্দবর্মা। আনন্দ ক্রমশঃ বড় হইয়া "পঞ্চদশ অব্দ যদি হইল কুমার। একদিন চলিলা মৃগয়া করিবার॥"[৪] মৃগয়াক্রমে সে-দেশের রাজপুত্র কালকেতুর সহিত আনন্দের নিদারুণ বৈরীভাব জন্মাইল, এবং রাজপুত্রের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আনন্দকে বন্দীশালায় রাখিলেন। ইতিমধ্যে ধর্মবতী নগরীর জনৈক সদাগর প্রভাকর (?) রত্নপুরে বাণিজ্য করিতে আসিয়া দৈবক্রমে নৌকা অচল হইলে দৈববাণী শুনিলেন যে নরবলি দিলে তবে নৌকা চলিবে। তখন রাজার কাছে নিবেদন করিলে রাজাদেশ হইল যে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় দণ্ডিত কোনো অপরাধীকে দেওয়া হোক্। এদিকে কালকেতু কোতোয়ালকে বলিয়া কোনোক্রমে আনন্দকেই অন্যায়ভাবে বলিরূপে পাঠাইল। আনন্দের জননী আসিয়া সদাগরের মুখে সব কথা শুনিয়া এবং তাহাকে স্বদেশের লোক জানিয়া আপন সতীত্বের প্রভাবে নৌকা চালাইলেন—"যদি মুই সতী হম এক পতিব্রতা। মোর আশীর্বাদে ডিঙ্গা চলিব সর্বথা,"[৫] এবং পুত্রের প্রাণ বাঁচাইয়া নিজেও পুত্রসহ বণিকের সহিত স্বদেশে ফিরিলেন। পথে সদাগর রতনকলিকাকে তাহার সহিত ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করাইতে বহু চেষ্টা করিয়াও বিফল হইল। আবার পথে সমুদ্রমধ্যে ভাসমান শিলার উপরে এক সুন্দরী তরুণীকে রত্নাসনে বসিয়া রত্নময় ছুরিচা বা ছুলিচায় পাসা খেলিতে দেখিয়া সদাগরের ইচ্ছাক্রমে আনন্দ সেই শিলায় যাইতেই তরুণী পাসাটি লইয়া জলমধ্যে অন্তর্হিত হইল। আনন্দ রত্নময় আসন প্রভৃতি তরুণী-পরিত্যক্ত পাসাখেলার সরঞ্জামগুলি মাত্র লইয়া সদাগরকে দিল। দেশে পৌঁছিয়া সদাগর রাজা-উপেন্দ্রদেবকে রত্নময় পাসার সরঞ্জামগুলি দিতেই রাজা বলিলেন পাসাটিও আনা চাই। সাধু অর্থাৎ সদাগর আবার আনন্দকে লইয়া সেই পূর্ব স্থানে গেল। আনন্দ এক মাঞ্জসে চড়িয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিল, উপরে সদাগর অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠিক হইল মাঞ্জসের শিকলে টান পড়িলে সদাগর তাহাকে টানিয়া তুলিবে। আনন্দ জলমধ্যে গিয়া এক রাক্ষসের পুরীতে একমাত্র জীবিত পরমাসুন্দরী রাজকন্যা মদনমঞ্জরীকে দেখিয়া তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিল। কিছুকাল পরে রাজকন্যা ছল করিয়া এক কূপ-মধ্যে রক্ষিত রাক্ষসের প্রাণ স্বরূপ ভ্রমরের কথাটি জানিয়া লইতেই আনন্দ ভ্রমরকে মারিয়া রাক্ষস নিপাত করিয়া ফেলিল। অতঃপর শিকলের দ্বারা ইঙ্গিত জানাইয়া প্রথমে মদনমঞ্জরীকে পাঠাইয়া দিয়া পশ্চাৎ ধনরত্নাদি লইয়া নিজে যাইবার ব্যবস্থা করিল। এদিকে মদনমঞ্জরীকে পাসা হস্তে আগত দেখিয়াই দুর্বৃত্ত

১ পৃঃ ১২৩ ২ পৃঃ ১২৪ ৩ পৃঃ ১২৫ ৪ পৃঃ ১২৯ ৫ পৃঃ ১৩৭

সদাগর নৌকা ছাড়িয়া দিল, আনন্দ সাগরতলের পুরীতে একাকী পড়িয়া রহিল। দুরাত্মা সদাগর মদনমঞ্জরীকেও প্রণয় নিবেদন করিতে ছাড়িল না, অবশ্য বলা বাহুল্য লাভ কিছু হইল না। এদিকে পাপিষ্ঠ সাধু আনন্দের মৃত্যু রটাইয়া ধনরত্ন দিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া থানা, চৌকিতে সংবাদ দিয়া রাখিল যাহাতে আনন্দ ফিরিবামাত্র তাহাকে খবর দেওয়া হয়। মদনমঞ্জরীও দুর্বৃত্ত সাধুকে এই বলিয়া মিথ্যা প্রবোধ দিল যে, "যেই দিন শুনিমু পাতালপুর কথা। সেই দিন তোমা সঙ্গে মিলিব সর্বথা।"[১] সুতরাং সাধু দ্বিগুণ উৎসাহে পাতালপুরের অর্থাৎ পাতালপুরে পরিত্যক্ত আনন্দের সংবাদের উদ্দেশ্যে চর নিযুক্ত করিল। এদিকে আনন্দ ইন্দ্রের শাপে পক্ষি-রূপ প্রাপ্ত দুই যক্ষকে মৃত রাক্ষসের মাংস ভক্ষণ করাইয়া খুশি করিয়া পক্ষিচরণ ধরিয়া ধর্মবতী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আনন্দ পক্ষীদের কাছে পাপাত্মা সদাগরের সকল কীর্তি জানিল, ও পক্ষি-দত্ত একটি পালক নিজের কাছে রাখিতেই মহাবৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইল এবং কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। এই ছদ্মবৃদ্ধ পাতালপুরীর সংবাদ জানে বলিয়া সাধুর নিকট আনীত হইয়া নিজের নাম বলিল জ্ঞানব্রহ্ম। অতঃপর জ্ঞানব্রহ্মের (অর্থাৎ ছদ্মবেশী আনন্দের) ব্যবস্থামত রাজসভা করা হইলে সেখানে বৃদ্ধ সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিয়া দিয়া পক্ষি-পালক ত্যাগ করিতেই মুহূর্তে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সকলের নিকট আনন্দ বলিয়া পরিচিত হইল। চতুর্দিকে উল্লাসের কলরোল উঠিল। রাজা আনন্দের হাতে অঙ্গুরী অভিজ্ঞান দেখিয়া সব কথা জানিতে পারিলেন এবং রাজা, রানী ও পুত্রের মধ্যে মিলন হইল। রাজাজ্ঞায় দুষ্ট সদাগরকে তখনই বধ করা হইল।

এই কাহিনী শুনিয়া "সতী ময়নাবতী...... ধৈর্য ধরি রহিলা সহিয়া মনে ব্যথা।"[২]

এদিকে চন্দ্রানীর গর্ভে লোরের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম রাখা হইল প্রচণ্ডতপন। এইরূপে "চতুর্দশ বৎসর বহিয়া গেল যবে,"[৩] তখন ময়না লোরের নিকট ভারতী-চতুর নামে "দ্বিতীয় কালিদাস"[৪] সম এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূত পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ সঙ্গে একটি পক্ষী লইলেন—

আছিল ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিব্য এক সারি।
সঙ্কেত শব্দের আর নানা বাক্যধারী ॥
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান মৃগচর্মাসন।
প্রতি বেদ পুরাণে সঙ্কেত বিচক্ষণ ॥
ইঙ্গিতে বুঝয় মর্ম হাস্যালাপ কলা।
মোহন পণ্ডিত, নামে সারিকা বিমলা ॥[৫]

এই পক্ষী ব্রাহ্মণের ইঙ্গিতে রাজসভায় লোরক-সম্মুখে ময়নার বিরহ বেদনার কথা সালঙ্কারে বর্ণনা করিলে ব্রাহ্মণও সে সমস্ত কথায় পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন অনুতপ্ত লোর আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। সত্বর মাণিক্যপুর রাজ্যের মহীপাল শূদ্র (? রুদ্র) সেনের কন্যা চন্দ্রপ্রভার সহিত চন্দ্রানীর গর্ভজাত পুত্র প্রচণ্ডতপনের বিবাহ দিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া চন্দ্রানীকে সঙ্গে লইয়া

১ পৃঃ ১৫৩ ২ পৃঃ ১৬৭ ৩ পৃঃ ১৬৯ ৪ ঐ ৫ পৃঃ ১৭১

ময়নার নিকটে ফিরিলেন। অতঃপর দুই রানী লইয়া লোর রাজা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। -

এই মতে লোরক চন্দ্রানী ময়না সঙ্গে।
গোঁয়াইল চিরকাল নানা সুখ রঙ্গে ॥
ভক্তিভাবে দুই জনে সেবে নিজ পতি।
নাহিক পিশুন রিষ দুই এক মতি ॥
ইচ্ছা হৈলে তিন জন পুত্র পাশে যায়।
ইচ্ছা হৈলে পুত্রে আসি এথাতে বোলায় ॥[১]

অবশেষে কালপূর্ণ হইলে ব্যাধি হইয়া রাজার মৃত্যু ঘটিলে দুই রানী সহমরণে গেলেন—"ব্যাধি হই মৈল যদি লোর নরপতি। সেই চিতা প্রবেশি চলিলা দুই সতী ॥"[২]

দৌলতের আরব্ধ কাহিনী আলাওল এইভাবে সমাপ্ত করিলেন, এবং নিজ অংশের আরম্ভেও যেমন সমাপ্তিতেও তেমনি আলাওল বারবার দৌলৎ কাজির প্রশংসা করিয়া নিজের রচনা সম্বন্ধে বিনয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।—

শ্রীযুক্ত দৌলত কাজি মহাগুণবন্ত।
তানে আগ্রে করিয়া রচিল আদি-অন্ত ॥
তান সম আমার না হয় পদ গাঁথা।
গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা ॥[৩]

১ পৃঃ ১৯৬ ২ ঐ ৩ পৃঃ ১৯৭

পরিশিষ্ট

(খ)

বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকা যখন লিখিত হয় তখনও দৌলতের কাব্যের অনুমিত মূল সাধন-কবি-রচিত হিন্দী "মৈনা সত" কাব্যের অস্তিত্বের প্রমাণ কেবলমাত্র Tessitori'র "A Descriptive Catalogue of Bardic and Historical Mss" গ্রন্থের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল [দ্রঃ পৃঃ ১৪]। সম্প্রতি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাঃ ভি, এস্, অগ্রওয়াল মহাশয় আমাকে পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে তিনি সাধনের এই কাব্যের একটি পুথি দেখিয়াছেন তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক হাসান আস্কারি মহাশয়ের গৃহে। ডাঃ অগ্রওয়াল মহাশয় আলোকচিত্র সাহায্যে এই পুথির একটি যথার্থ প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। সাধনের এই "মৈনা সত" কাব্যই যে দৌলতের কাব্যের আদর্শ ছিল তাহাতে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। ডাঃ অগ্রওয়াল "মৈনা সত" কাব্য হইতে আমাকে কয়েক ছত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম চারি ছত্রের হুবহু অনুবাদ দৌলতের কাব্যে পাওয়া যাইতেছে। ঐ কয়েক ছত্রের মূল ও দৌলৎ-কৃত অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল :

সাধন (মৈনা সত) :

এক এক করত জীব দেউঁ।
জগ দোসরকো নাঁব ন লেউঁ ॥
ফাটহি তাসু নারিকো হিয়া।
এক ছাড়ি জেহি দোসর কিয়া ॥

দৌলৎ : (পৃঃ…১১৫)

এক এক করি মুই দিমু নিজ প্রাণ।
জগতে দোসর নাম না লইমু আন ॥
ফাটউক সে নারীর হৃদয় দারুণ।
এক ছাড়ি ভাবয় যে দোসরক গুণ ॥

পরের দুই এক ছত্রেও ভাবানুবাদ মিলিতেছে। ইহা হইতে অন্ততঃ এটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে দৌলৎ সাধনের কাব্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং কোথাও কোথাও মূলের হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন, আবার কোথাও কোথাও ভাবানুবাদও করিয়াছেন। ডাঃ অগ্রওয়াল মহাশয়-প্রেরিত ছত্রসমষ্টি হইতে ইহাও অনুমান হয় যে দৌলতে এমন বহু অংশ আছে যাহা সাধনের কাব্যে নাই।

শব্দসূচী ও আবশ্যক টিপ্পনী

অখনে (১০৮, ১২১, ই.) = এখন
অগুণী (১৪০, পা. টী.-৩) = গুণহীনা
অথাতে (১০৩, ১১১, ই.) = এখানে
অধিরোপ (১০৫) = (?) প্রসার, প্রয়োগ
অনাহিত (১২৯) = অহিত
অনুবন্ধ (১০২, ১০৫) = উপক্রম, সংকল্প
অনুভাব (১২৯, ১৩১) = মানসিক অভিপ্রায়-সূচক হাবভাব ; রসানুভূতি
অনুযুক্ত (৬২) = উপযুক্ত
অনুশোচ (৬৩, ৭২, ৭৬, ১০৬, ১১৬, ১২৮, ই.)
অনুসরি (৬১, ৬৬, ১১১, ১১৬, ১১৭, ই.) = স্মরণ করিয়া
অন্তস্পট (৬৫, ৬৭, ই.) = বিবাহকালে বরবধূর শুভদৃষ্টিকালীন আবরণ-বস্ত্র
অন্তস্পুর (৭১, ৭৭, ৮৩, ৮৫, ৮৭, ৮৯, ১০৯, ই.) = অন্তঃপুর ; অন্তস্পুরী (৮৪)
অন্যে অন্যে (৫০, ৬০, ৭০, ৭৭, ৮০-৮২, ৮৬, ৮৭, ৯১-৯৩, ই.) = পরস্পর
অহি (৭১) = ঐ
আএ (১১৮) = অগ্নি
আকুলে (১০৩) = আকুলতায়, আকুল হওয়ায়
আগর (৭৫)
আগু, আগুবাড়ি, আগু সারি (৫৮, ৬২, ৭০, ১১২, ই.) = অগ্রে গিয়া
আগুনী (৯৯) = আগুন
আচি (৪৬) = (?) অচীন = প্রাচীন দেশ বিশেষ [বি. কো., ১, পৃঃ ৯৯]
আচৌক (৬০), আছউক (৪৫) = থাকুক
আজু (৬২, ৭০, ৮১, ১১৫, ই.) = আজ
আঞ্জ (১৩৪) = গণ্ডদেশ (ফা.)
আঞ্জন (৮৬, ১২৭, ই.) = অঞ্জন
আটোপ (৪৮, ৯০, ১০৫, ই.) = দর্প, প্রভাব
আন্ (৪২) = সম্ভবতঃ আদ্ হইবে। আরবের এক প্রাচীন জাতি আদ্ ; কোরানে ইহাদের কথা একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে ক্রমাগত অস্বীকার করায় ইহাদের ধ্বংস হয়। [Enc. Is., I, পৃ. ১২১ ; H. Q. (A. Y. A.), S. vii. 65-70, S. xlvi. 21-26]
অথবা, ? অন্ধ > আন্ধ্ > আন্
আরতি (৪৯, ৬১, ১০০, ১০৪, ১০৬, ১১২, ১৩২, ই.), তু. শ্রী. কী.
আর্জিলেন্ত (৪৪) = অর্জন করিলেন
আল (৯৯, পা. টী.-১৩) = আলোক
আলীম (৪৬) = বিদ্বান্ (ফা.)
আলোল-বিলোল (১৩০) = চঞ্চল
আহাদ (৪৩) = আদি সংখ্যা এক (ফা.)
আহুতিমু (৭৩), -য়া (৬৯) = আবৃত্তি (করিব, -য়া)
ইমান (৪৪, ৪৬) = (ইস্লাম) ধর্ম-বিশ্বাস
ইসুপ (৪৯) < ইয়ুসুফ (= Yusuf) = কোরানে উক্ত এক ধার্মিক ব্যক্তি। ইঁহার কাহিনী খুবই বিচিত্র [দ্রঃ Sh. Enc. Is. পৃ. ৬৪৬-৬৪৮]
ইস্রাফিল (৪৩) = একজন প্রধান দেবদূত। ইঁহারই তূর্যবাদনে মৃতের পুনরুত্থান হইবে।
উখারি (৮৩) = উখাড়ি = উৎপাটিত করিয়া
উগায়, উগি, উগিল, উগিলেন্ত, উগে, ই. (৫৮, ১১৬, ৭৫, ১০৬, ই.)
উঘার (১২০) = প্রকাশিত, প্রবল
উজিয়ালা (১২০) = উজ্জ্বল
উঞ্চ (৪৭, ৭১) = উচ্চ
উঠক (৪৩) = উষ্ট্রকে
উৎসাহীন (১০৩) < উৎসাহহীন
উদিতে লুকিতে (৬৯) = দেখা দিয়াই অন্তর্হিত
উপকান্ত (৮৮) = উপপতি
উপরোধ (৮৮, ১০৭) = অসুবিধা, বাধা
উপশম (৪৫) = শান্ত
উপাসঙ্গ (৫৯) = পৃষ্ঠ-লগ্ন
উপাসি (৯৯, ১০১) = উপবাস করিয়া, উপবাসী
উপহাস্য (১১৬) = উপহাস
উয়ারী (১২৯) < উপকারিকা (= সুসজ্জিত স্থান বা চন্দ্রাতপ)
একরঙ্গী (৮৪)
একরূপা, -রূপী (৮৫)

একসর, একসরী (৫০, ৫৭, ৯০, ৯৭, ৯৮-১০০, ১০৭, ১০৯, ১৩৬, ই.)
= একাকী, একাকিনী
এথ (৮৭, ১০৩, ১০৪, ১১৬, ১৩৬, ই.) = এত ; এথেকে (৪২) = এতেকে
এথা (৬৭, ৭৯), এথাতে (৭, ১০৯) = এখানে
ঐষিক (১১৬, ১২০) = বাণবিশেষ, বাণ
ওষ্ঠক (৮৯)
কঙ্ক (৯১, ৯৯)
কণ্ঠ (১০৯/পা. টী-১) = নগর-প্রান্ত
কথ, কথেক (১৩০, ১৩৬, ১২৩)
কনে (৪৬) = কোনে = কোন্ = কে
করকা (৫৯) = শিলাবৃষ্টি
করট (৯৮) = কাক
করটী (৯৮/পা. টী) = হস্তী
কর্ণিক (৪৯) = কর্ণিকা = কর্ণাভরণ
কলিমা (৪৩) = ইস্লাম ধর্মের মূল বাক্য
কল্প (১০২) = ইচ্ছা ; কল্পয় ; কল্পি (৭২, ১০১ ; ৭২, ১০২)
কামন (৮৩) = কাম
কামাকুলী (৭৪, ১১৭)
কামান (৯২) = ধনুক
কালু (৮১, ৮৭) = কল্য, কাল
কাহাতে (৫৯) = কাহাকে
কাহে (১২৮) = কাহার বা কাহাকে
কিংশুক (৫৬) = নির্গন্ধ পলাশের মতো নিগুর্ণ ব্যক্তি
কিবাভিষ্ট (১০৭) = কিবা অভীষ্ট
কিমিতি (১২১)
কিসে (৭৮, ১০৮) = কি জন্য
কুসুম (৭৯, ১১১, ১১৩, ১২৪, ১২৫, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৯)
কুকি (৪৬/পা. টী) = জাতিবিশেষ [দ্রঃ বি. কো., ৪, পৃঃ ১৭৩]
কুচি (৪৬) = (?) কোচীন = দেশবিশেষ [বি. কো., ৪, পৃ. ৫২৮]
কুজনি, কুজনী (১১৮, ১২৪) = মন্দ নারী
কুণ্ডাধম (১২৭) = কুণ্ডের (জারজ সন্তান) মধ্যে অধম
কুঠারিয়ে (৮৩) = কুড়ুল সহযোগে
কুলকান্ত (৭৪, ১০৩) = কুলেশ্বর

কৃত (৪৮) = কীর্তি
কৃত্যা (৮৫, ১১২, ১১৪) = ছলনা
কেমত,-তে (৭০, ১০৩) = কিরূপে
কৈ (৫৩) = কোথায়
কৈগনে, কৈসে (১২০, ১১৯/পা. টী)
কোঞ্চা (১৩৩) = কোঁচা
কোর (৪৯, ৯৮) = কোল
ক্ষয়া (১০৮) = ক্ষয়প্রাপ্ত
ক্ষেত ক্ষেতি (১২৮), খেত খেতি (১১০, ১২৭)
ক্ষেত্রি (৯৩) = ক্ষত্রিয়
খণ্ডউক (১৩২), খণ্ডৌক (৮০)
খর (৫৭/পা. টী-১০) = (?) প্রকাশক (ফা.)
খসুয়া (৫৮)
খসৌক (৮৭)
খাকার (৮৯, ৯৩, ১৩২)
খাকিনী (১০৯) = সমস্ত শত্রুকে যে ধুলায় পরিণত করে
খান্দান (৪৬) = উচ্চ বংশ
খেচনি (৪৭) = শোভন
খেলি (১৩৫) = খেলা
খোপ (১১৪)
গঠ (৪৭) = গঠন
গড় (৮৬)
গমন (১১৩) = আগমন
গরাস (১২৫),-সে (১২৮)
গরি (১০৩/পা. টী-১৩) = কার্য (ফা.)
গহিন (৬৬), গহীন (১২১)
গাজে (১৩৯) < √গর্জ্
গাড়ি (১২৯) = গাড়িয়া, ঝাঁকিয়া বসিয়া
গাহন (৪৫) = কীর্তন
গাহা (১২০) < গাথা
গাহুল বিস্তোল (৬৬) = বংশদণ্ডে পতাকা লইয়া শোভাযাত্রীর দল [দ্রঃ ম. ম. (বি) পৃ. ৩২০]
গুঞ্জা (৫০) = কুঁচফল
গুণ মৌলি (১৩৪) = গুণ-শেখর
গুথিয়া (১১৪), গুথিলেক (৮২), গুথে (২৬, ৮২, ১২৩) < √গাঁথা
গুরুগম্য (৪২)
গোহারী (৪৮) = গ্রাম্য হিন্দী
গ্রহ (৮৩) = দুঃখ

গ্রামিক (৭৯) = গ্রাম্য ব্যক্তি
ঘট (৪৪) = চেষ্টাকৃত বস্তু ; ঘটন (৯৮)
ঘাও (৫৩, ৯৩) < ঘাত
ঘুষিবেন্ত (৮৮) = ঘোষণা করিবে
চকা (১২২), চকী (১২২, ১২২/পা.টী-৩) < চক্রবাক্
চকিত বিলোকিত (৭২) = অকারণে ইতস্ততঃ চকিত দৃষ্টি
চক্ষুয়, চুক্ষ (৯১) = চক্ষুদ্বারা
চটকে (১২৮)
চাটু (১০৫, ১২২)
চাতরে চাতর (১০৯), চাতরে চাতরে (৪৭)
চিন (৬৮, ৮৫, ১৩৮, ই.), চিনন (৮৫) < চিহ্ন
চিন্তি (৪৬) = মুইন-অল্-দীন মহম্মদ চিস্তীর (১২শ শতাব্দী) নাম হইতে। ইনি একটি সূফী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
চীর (৯৪) = বসন
চেতই (১২১) = সচেতন হয়
চোখা (৯২) = শাণিত, তীক্ষ্ণ
চৌছরা (১১২) = চৌছড়া
চৌদিশ (১৩৭)
চৌপাইয়া (৪৯) = চৌপদী
ছত্রবৎ (৩৫) = ছত্রযুক্ত
ছন্নমতি (৯৮)
ছানি, ছানী (৪৭, ৮৩)
ছার (৯০, ১২৪)
ছৈলা (১১৭, ১২৯) < প্রা. ছইল্ল < সং. *ছবিল = বিদগ্ধ নায়ক [বা. সা. ই., ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৮, পা. টী.-১০]
জড়িয়া (৫৮), জরি (১৪০), জরিয়া (১২৯), ই.
জনাধম (১২৫) = অধম জন
জনি (১৩৫,১৩৭), জনু (১৩৪), জান (৫৬, ই.) = যেন
জরা (১৩৪) = বৃদ্ধ
জর্ম (৬৩, ৮৭, ৯০) ; জর্ময় (১১৯) ; জর্মিলা (৭৯) < জন্ম
জাগন (৮৪) = জাগরণ
জাতিএ (১৪০)
জিউ (৪৪), জীউ (১৩০) = জীবন
জিব্রাইল (৪৪) = ইস্লাম ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবদূত [দ্রঃ Sh. Enc. Is. পৃ. ৭৯]
জীব (১৩৭) = প্রাণী ; (১০৫, ১০৬) = জীবন ; (৭৬, ৮১, ৮৮, ১০৪), জীবেক (১০০) = বাঁচিবে
জুড়ি (১২৪) = যোগ দিয়া
জুতির্ম্ময় (১০৬), যুতি (১২০) < জ্যোতি
জুয়ায় (৫৭), যুজায় (৮৬), যুয়ায় (৪৪, ৭৬, ৮৮, ৯৬, ১৩১) = যুক্ত হয়
জৈক্ষ (৭৩) < যক্ষ
জৈসা (১২৮)
জ্যোতিয় (৬৯, ১০০) = জ্যোতি দ্বারা
ঝাপিয়া (৮৫), ঝাপিল (৮৭)
ঝামর (১৩৩, ৫৭/পা. টী)
ঝুপি (৮৪) = গুচ্ছাকৃতি লম্বিত (বস্তু)
ঝোরং (১২১)
টালনি (১৩৭/পা. টী-৫)
টুঙ্গি (৮২)
ঠগ (৪২, ৪২/পা. টী)
ঠাম (৭৪, ৯৭) = স্থান
ঠাট (৫২)
ঠেকা (৯৭) = হেলান
ঠেট (৪৮), ঠেটা (৪৯) = চলিত হিন্দী
ডাউক (১১৭) = ডাক পাখি
ঢামন (৪২) = ঢেমন = লম্পট
ঢামর (১২০) (মু. প্র) = ঢামন
ঢেঙ্গ (৪২) = ঢঙ্গ = প্রতারক, দুষ্ট
তৎকাল (৮০, ৯২)
তৎক্ষণ (৮৮)
তত্ত্ব (১০৪) = প্রকৃত বস্তু
তথাতে (৬৯, ১১১)
তনৌ (১২১) = তনু
তবেহ (৬৯, ৯৩, ১১৪) = তথাপি
তমসী (১২০), তামসী (১১৭)
তর্কয় (১২০) = তড়কায় = তড়পায় = চমকিত হয়। পুথিতে বিকল্প পাঠ : থরকএ
তরাস (১২৪), তরাসা (১৩৪)
তসু (১২৮) = তাহার
তাক (৫৪) = ইহাকে, তাহাকে, ই.
তাড়ি (৮৬) = তাড়াইয়া বা চালাইয়া
তাত (৬৩/পা. টী, ১২৪) = তাহাতে
তার (৪৭) = তারের বাদ্যযন্ত্র
তাবন্তে (৮৮)

তারক (১২৩, ১৩১) = তারকা
তা সভান (১ ৪) = তাঁহাদের সকলের
তাহে (১২৪, ১২৯, ১৩৭, ১৩৯, ই.) = তাহাতে
তুরমান (৫৬) < ত্বরায়মান
তুরিত (৬৯, ৭৮) < ত্বরিত
তেকারণে (৪২, ৬৮, ৭৯, ১০২, ১০৯, ১১৫)
তেন মতে (১২৪) = সেই ভাবে
তেরা (১১৮) = তোর
তৈসা (১২৮)
তৈক্ষক (৯৯) < তক্ষক
তো (৭৬, ই) = তোর
ত্রিয় (১০০), ত্রিও (১০০/পা টী) = তিন
থাউক (৮৪) = থাকুক
থুই (৫৮)
থুপি, থোপ (৮৭); থোপা (৪৭)
দণ্ডক (৭১) = এক দণ্ড পরিমাণ সময়
দম্প (৮০) = দর্প
দরুদ (৪২) = ভক্তিপূর্ণ প্রণতি (ফা)
দাপ (৪৩, ৮৮, ৯১) < দর্প
দাপনি (৪৩) < দর্পণ
দারুণী (১১৭)
দিগন্তর (৫২, ৭০, ১২১, ১৩৮ ই.) = বহুদূর
দিবারে (১০৩) = দিতে
দীর্ঘরি (১২২, ১২৭, ১২৯, ১৩৫) = সুদীর্ঘ
দীর্ঘাঞ্জনে (৮২) = দীর্ঘ দৃষ্টিতে
দুমদুমি (৪৬, ১০৭, ই.)
দুরন্তা (১২৭), দুরান্ত (৫০) = দুরন্ত
দুরীত (১৩৯) = দূরীভূত
দৃষ্টিএ (১৮/পা. টী.), দৃষ্টিয় (৫৪), দৃষ্টে (৭০)
দেবস্থানী (৬৯) = দেবস্থানে উপস্থিত
দেবা (৮৪, ১০০) = দেব
দেশান্তরী (৪৬, ৫৪) = অন্য দেশবাসী
দেহা (৯৯, ১২০, ১২৮) = দেহ
দোচারিণী (১২৪) < দ্বিচারিণী
দোলয় (৮৫, ১১৬), দোলাঅয় (১৩৪)
ধরণ (৭১, ১০৭), ধরাণ (৫৪)
ধরতী (১২০) < ধরিত্রী
ধামারী (১২০), ধামালী (৯০)
ধিগদৃষ্ট (৭৬) = ধিক্ + অদৃষ্ট

নগরি (৭৯), নগরিয়া (১৩২) = নগর-বাসী
নটক (১৩১) < নষ্টক
নবী (৪২, ৪৩) = পয়গম্বর
নবুয়ত (৪৩) = নবীত্ব
নাহা (১২০,১২৮) < নাথ
নাও (৪৪) = নৌকা
নাচত (১০৪)
নাট (৪৭) = নৃত্যশীল
নিকুঞ্জ (খেলা) (৪৭) = শিকার করা
নিগড় (৮৫), নিগার (৮৫/পা. টী.) = সূত্র বা রজ্জু
নিচল (১২১) < নিশ্চল। তুঃ শ্রী. কী. পৃ. ৩৪, ১১৫
নিছিয়া (৭৯) = মঙ্গলের উদ্দেশ্যে
নিজুলিয়া (১০৩/পা. টী.), নিযুজিলা (১০৩)
নিদান (৭৩, ১২০, ১২৭, ১২৮)
নিবন্ধ (১০৩) = যাহা নির্ধারিত হইয়াছে
নির্নাম (১০৮,১১৯)
নির্বন্ধ (৬৩,৭১)
নিরঞ্জন, নিরাঞ্জন (৮৪, ই.)
নিরাকুল (১০৩, ১৩৭) = অতিশয় আকুল
নিরোধ (৮৮) (বি.); (৯০) (ক্রি)
নিশান (১২১) < নিঃস্বান = শব্দ
নুর (৪৩) = জ্যোতি
নেত (৬৫, ৮৫)
নেহা (৭৭, ১২০/পা. টী.)
নেহালিত,-তে, নেহালে (৮২), নেহালেন্ত (৮৫), ই.
নেহো (৯১) (অনুজ্ঞা) = লওয়া হোক
নৈরাশ (১২৩) = নিরাশ
পঞ্চপ্রাণী (৭৬,১০৮)
পড়উক (১২৪), পড়োক (১১৫)
পন্থ (৫৭, ৮২, ৯৯, ১০৬, ই.), পন্থিক (৪৬, ৬৫, ১১৭, ই)
পবনা (৬৪) = পবন
পরাণী (৪৩, ৭৯, ৯৮), পরানী (৭৩), প্রাণী (৭৬, ৭৯, ৯৮) = প্রাণ
পরাভব (৮৮) = নিন্দা
পরিক্লেশ (১২৭)
পরিখেদং (১২১)
পরিপাক (১০১) = বিপাক
পরিপাটি (৭৯,১১৭)

পরিভঙ্গ (১০৬) = অপসরণ
পরেয়র (১৩৭), পরেয়া (১৩৯) = অপরের ; তুঃ পরাও, পরাব (= পরাও), [P. (L. D.) পৃ. ২৭২] = অপরের
পাও (৫৬, ১২০) = পা
পাঞ্জ (১৩৪/পা. টী.) = হাত (ফা.)
পাটং (১১৮)
পাটম্বর (৮২,১১৯), পাটাম্বর (৬৫, ৮৪, ১২৭, ১৩৩)
পাটলি (১২৬) = পাটলবর্ণা, (১৩৩) = ? পাটল পুষ্প-মণ্ডিতা
পানাও (১১৯,পা. টী.) = পান করাও
পান্তর (১৩৪) = প্রান্তর
পাল (৪৮), পালনা (৭৩) = পালন ; পালয় (১১৫), পালেন্ত (৪৮)(ক্রি)
পালিতা (৭৩) < পালয়িত্রী
পিউ (১১৬,১৩০) = প্রিয় বা প্রিয়া
পিনাক (৫০) (মু. প্র.) = পিণাক = বাদ্যবিশেষ
পিব (৭০) = পান করিবে, -ই (১৩৯) = পান করে
পিন্ধাইল (৯৭), পিন্ধায় (১১৪, ১২৪, ই.)
পুরিত (১০৬) = পূর্ণ
পুরুষতা (৮৫), পৌরুষতা (৮৩)
পুরোক (১৪০)
পুলক (১০০) = পুলকিত
পূর্ণক (৭১/পা. টী.-২) = পূর্ণ
পৃষ্ঠ-গোপ (৭৪) = পশ্চাদ্ভাগের রক্ষী, Van-guard
পেখন (৫৭, ৬৬, ১১৬)
পোতল, পোতলি (৫৪), পোতলী (৫২, ৫৪) = পুতুল ; পোতলি,-লী (৫৪, ৫৫) = চোখের মণি
প্রকুতি (৪২) (? < প্রকুপিত) = আকুল
প্রণতিয়ে (১০৪) (৩য়া)
প্রতিনিতি (৫৬)
প্রদেশী (৫৬/পা. টী. -৪)
প্রসর (৪৩) = (?) উজ্জ্বল ; প্রসবে (৭৫) = ছড়ায় ; প্রসারে (৬৬) = ? দীপ্তি দেয়
বংশী (১০৩) = বংশ-জাত
বঙ্ক (৮২, ১১৪)
বচ (১২৬), বচনা (১২৯) = কথা
বটরী (৪৯) = ? বটেরী = স্ত্রী-বটের (পক্ষী)
বটেক (১৩২) = এক কড়া
বড়াবড়ি (১০৩) = শ্রেষ্ঠ
বণিজ (৪৮) = হাট, (১১১) = বণিক্ ; বণিজ্ঞার (৬৫, ১১৭, ই.), বাণিজার (৪৬) < বাণিজ্যকার
বান্ধা (৭২) = বন্ধক
বামহি (১২০) = প্রতিকূল
বায়ে (৯৬), বাহান্ত, বাহে (১৩৩) = বাজায়, বাজে
বার্তি,-ল (৭৪),-লেক (৭৯) = বার্তা ঘোষণা (করা)। তুঃ হি. বত্তানা
বাহুড়াই (১০৭) < ব্যাঘুটিত
বিগার (১১৯) = মতিভ্রম
বিঘাত (৯৩) = প্রহার
বিচিয়া (৫৪) = ব্যজন করিয়া
বিনোদ (৫২, ৬২, ১৩৮) = উৎফুল্ল
বিভা (৪৯) = বিবাহ
বিভোল (৫৯, ৮০)
বিমন (১০৯, ১৩১), বিমনা (১৩১) = বিমুখ তুঃ শ্রী. কী. পৃঃ ১২১
বিমষিয়া (১২৫), তুঃ শ্রী. কী. (পঃ ৫, ৯৭, ই.)
বিম্ব (৭৬), বিম্বু (৫৪, ৬৭)
বিষ্ণুপতি (১০৯) = ? চন্দ্র
বিস্তোল (৬৬) = দ্রঃ গাহুল
বিলাসা (১৩৪) = বিলাস
বিস্‌মিল্লা, বিস্‌মিল্লাহ অর্‌ রহমান (৪২)
বিসর্জসি (১০০)
বুক (৪৩) = তূর্য—যাহার শব্দে মৃতদেহের পুনরুত্থান হইবে
বুদ্ধাচার (৪৫) = বৌদ্ধ মতাবলম্বী
বুন্দ (৮৪) = বিন্দু
বুলাবুলি (৯১)
বেভার (৭০) < ব্যবহার
বেহারেস্ত (৪৮)
বৈঠাইব (১২৯)
বৈদেশী (৫২, ৬৪)
বৈদ্যালি (৭৮) = বৈদ্য সম্বন্ধীয়
বৈরতা (৮৮)
বৈসয় (৪৮, ১৩৩), বৈসেন্ত (৪৬, ১১১)
বোটরি (৪২) = (?) মৎস্যের আধার। তুঃ গাঁটরি

বোরাক (৪৪) = যে জন্তুর (? অশ্ব) পৃষ্ঠে চড়িয়া মহম্মদ স্বর্গে গমন করেন। [দ্রঃ Sh. Enc: Is., পৃ. ৬৫]
ব্যাল্লিস (৫৯, ৬৫)
ভক্তিয়,-য়ে (১০৮) (৩য়া)
ভণতি (১২২, ১৩৯, ই.)
ভরদৃষ্টি (৮৫),-ষ্টে (৮২)
ভস্মছালী (১০৪, ১২৬)
ভাটি (১১৫) = হ্রাস
ভাতি (৯১) = প্রকাশ
ভাবক (৫৪), ভাবন (৭০)
ভাবিনী (১১৫), ভামিনী (১১৫/পা. টী)
ভায় (১২৪, ১৩০, ১৩৫)
ভালা (১১২, ১৩২) = ভাল
ভূষণা (৫০) = ভূষণ
ভেউর (৪৭) = ভেরী
ভেজে (৯১) = পাঠায়
ভেশ (৭১ ৭৭, ৭৯, ১০৯, ১১২, ১২২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৮), ভেশং (১১৯)
মইল (৬০) = মৃত্যু
মচিনি (৪৬/পা. টী.)
মনাতঙ্ক (৭১/ পা. টী.)
মলি (৩১)
মহিমে (১০৫)
মাও (৬৫), মায় (৮৮) = মা
মাগম্ (৬৫, ১২৯, ১৩০, ই.)
মাচীন (৪৬) = (?) মহাচীন
মাতই (১৩৪)
মাধবি (১৩৯),-বী (১৩৬-১৩৯)
মাধুরী (১২৮, ১৩৮) = মধুর ;—সাদরে (৫৪, ৯৯) = মধুর ভাবে
মানাই (৭৯),-মু (৭৬)
মানিত (১৩৭) = মান্য
মার (৫৮/ পা. টী.) = কামদেব
মারণ,-ন (১০২)
মাল (১৩৯) < মালা
মিত (৫৮) < মিত্র
মিম (৪৩) = (?) ফার্সি বর্ণমালার ২৮ সংখ্যার অক্ষর যাহা আদি মাস মহরমের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। [দ্রঃ Steinglass]
মিসির (৪৯) = মিশর দেশ
মুতি (১২৯) < মৌক্তিক
মুনিয় (১০২) (১মা)
মুল (১৩২) < মূল্য
মুশ্চিত (৭৬, ৯৭); মোহশ্চিত (৫৪, ৯৪)
মেরি (১৭৫) = আমার
মেহু (১০৫, ১১৯-১২১) = মেঘ
মোচঙ্গ (৪৭) = বাদ্যবিশেষ
মোঝাব (৪৬) = ধর্মপথ ; (এখানে) ধর্মসম্প্রদায় (sect) (ফা.)
মোদিত (৫০)
যত ইতি (৬০), যথ ইতি (৭৪)
যশস্ত (৪৫, ১১৪) = সুখ্যাতিজনক
যাম (১১৭) < √যাওয়া (মধ্যমপুরুষ), যায়ে (৯৭) = যায়
যুক্ত (৪৭, ১০৭) = যোগ্য, যুক্তিমন্ত (৪৬), যুত (১১১)
যুগী = যোগী
যেন মতে (১০৬)
যো (১১৮), যো-ভেল (১২৯)
যোগান (৪৪, ৪৯, ৫৮, ৬৩, ৬৬, ৮০)
রঙ্গিনীয়ে (১৩৪) (১মা)
রত্তন (৮৬)
রস-বন্ত,-মন্ত (৮৬)
রসুল (৪৩-৪৫) = দূত, পয়গম্বর (আ-ফা.)
রহমান (৪২) = দয়ালু ঈশ্বর (আ-ফা.)
রহাস্তক (৮৩)
রহিম (৪২) = দয়ালু (আ-ফা.)
রাও (৫৩)
রাজাত (১০২),-তে(৫৪), রাজন (১০৬), রাজনেতে (৭০)
রুমী (৪৬) = রুম দেশবাসী [দ্রঃ বি. কো.]
রেহা (১২০) < রেখা
রৈক্ষক (৮৬)
লক্ষি (১৩৫), লখি (৯২, ১২০)
লঘু লঘু (৭৮) = মৃদু মৃদু
লাএলাহা-ইল্লাল্লাহো মহম্মদ রসুল (৪৩) = আল্লা ব্যতীত কোনো ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদ তাঁহার দূত

লাঘব (৫৭) = অপমান, দুরবস্থা
লামিয়া (৮৬),-ল (৮৮) < √নাম্
লাগ (৮৮)
লাস (১১২, ১১৫) < লাস্য
লীলয় (৬১) = লীলা করে
লুকি (৪৯),-ত (৭৯)
লেউটিয়া (৫৬) < নিবর্তিত
লৈ (১১', ১২২),-মু (১০২)
শয়না (৯৯) = শয়ন
শিলা, -রস (৮৪)
শীর্ষৌ (১২১) < শীর্ষ
শুচিরুচি (৬২, ৯৯, ১১১) = পবিত্র শোভাযুক্ত
শুনয় (৫৫), শুনাওসি (১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২৪), শুনিলেহ (৮১, ৮৮), শুনেন্ত (৫৪)
শুভমস্তু (৫৯, ৬৬)
শূন (১৩২) < শূন্য
শোকাকুলী (৭৭, ১১৬)
সংঘটন (৮৪) = (?) সাফল্য
সংহতি (৪৬/পা টী.) = সঙ্গে
সখাবর (৪৫) = (?) শ্রেষ্ঠ সখা ; অথবা, (?) সখা (ফা.) = উদার + বর
সঙ্কেতন (৮১) = সংকেত
সঙ্গতি (৪২, ৪৬, ৬৩, ৯০, ১০৪, ১০৯, ১৩২, ই.)
সঙ্গিতা (৭২) = সঙ্গিনী
সন্ধি (৭৮) = কৌশল
সন্নিপাত (৪৬) = সমষ্টি
সভান (১০৪) সকলের
সমবায় (১৩৭) = সদল মিলন
সমসর (৬৭, ৭০, ৮৫, ৮৮)
সমাপ (৪৩) = সমাপ্ত
সমাহিতে (৬৬, ৮৭, ১০৭, ১২৯)
সমুর্দিতে (৪৮, ৫৬, ৮৩) = সহিত
সমে (৪৬, ৫৮, ১০২, ১০৭, ১০৮)
সরি (৯২) = (?) আকর্ষণ করিয়া
সরিয়ত (৪৪) = ধর্ম (ফা.)
সল্লোল (৭২/পা. টী.-১) = ?
সাইল (১২৭, ১২৮) < সালি
সাচন (১০৯)
সাস্তাইমু (৯৪),-ইয়া (৭৬, ৭৯) (না. ধা)
সাম (৫৮) = রাজনীতির চারি অঙ্গের অন্যতম [অবশিষ্ট : দান, ভেদ, দণ্ড]
সারি (৫১) = পাশা (খেলা) ; (১২৬) = দল
সারিয়া, সারে (৯৩) = অস্থির (হওয়া)
সালাম (৪৩)
সিদ্দিক (৪৯) = (সত্যনিষ্ঠ বন্ধু) মহৎ উপাধি বিশেষ [Sh. Enc. Is., পৃ: ৫৪৫]
সিদ্ধা (৭৩) = দেবযোনি বিশেষ।
সিনাও (১২৯) = স্নান করাও, ধৌত কর
সিফত (৪৩) = গুণাবলী (ফা.)
সীতা (৮৬) = মাথার অলঙ্কার বিশেষ
সীদতি (৬৪, ১২১, ১২৯)
সীসেত (১১৫) = শীর্ষে
সুখাইব (৬৪) = শুকাইবে
সুতিল (৯৫/পা. টী.)
সুভেশ (৮৬),-ষ (৬৩)
সুরঙ্গ (৭৭, ৭৭) = উত্তম রঙের
সুরতরু (১৩৫) = কল্পবৃক্ষ
সুলাস (৪৯) = সুন্দর লাস্য যুক্ত
সুত্রক (৮২) (২য়া)
সুর (৬২, ১০৬) = সূর্য
সৈন্য-সেনা (৫২, ৯০, ১০৯, ই.)
সো (১১৯, ১৩৬),-ভেল (১২৯)
সোয়াওসি (১২৪)
স্তিরী (৯০) < স্ত্রী
স্থলী (১০৯, ১২৭) = পাত্র, স্থান
স্বরূপা (১৩১) = সুন্দরী
হ (৯৬, ই) = ও (also).
হই (৬৯, ৯৯, ১০৫, ১৩৩, ই.) = হইয়া
হস্তে (৪৩, ৫৪, ৯১, ই.)
হানাফী (৪৬) = সুন্নি মুসলমানদের অন্যতম সম্প্রদায় (Enc. Is, III, পৃ: ২৫৬)
হাবিলাষ (৪২, ১০৭)
হাম (১২২, ১৩০), হামার (১৩৯/পা. টী)
হারাই (১৩২)
হিন্দুয়ান (৪৮) = দ্র : পৃ. ৪১। হীনী (১৪০)
হুঙ্কারি (১০৫),-রে (৮৩)
হুতাশ (১২২, ১২৬) = হুতাশন
হুর (৭৩) = পরী। হুলাহুলি (৪৭, ৭৫)

গ্রন্থপঞ্জী ও সংক্ষেপ-সমাচার

ই. = ইত্যাদি। পা. টী. = পাদ টীকা। তু: = তুলনীয়। পৃ: = পৃষ্ঠা। হি = হিন্দী। না. ধা. = নাম ধাতু। ফা. = ফার্শিতে চলিত। প্রা. = প্রাকৃত। সং = সংস্কৃত। মু. প্র. = মুদ্রা প্রমাদ। ক্রি = ক্রিয়াপদ। বি. = বিশেষ্য। বিণ = বিশেষণ। দ্রঃ = দ্রষ্টব্য। আ-ফা. = আরবী ফার্সি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: গ্রন্থমধ্যে কাব্যাংশের পাদটীকার বিকল্প পাঠগুলি অংশতঃ পরলোকগত মৌলবি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় প্রেরিত পুথি হইতে গৃহীত।

১। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (কালিদাস) = অ. শ.

২। আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য = আ. রা. স. বা. সা.
(ডঃ মুহম্মদ এনামুল্ হক্ ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ) (১৯৩৫)

৩। Imperial Gazetteer of India (1908) = Imp. G. I.

৪। Indian Linguistics (পত্রিকা)

৫। ইসলামি বাংলা সাহিত্য (শ্রীসুকুমার সেন) = ই. বা. সা.

৬। Encyclopaedia Brittannica (1911) = Enc. Britt.

৭। Encyclopaedia of Islam (1913) = Enc. Is.

৮। Origin and Developement of Bengali Literature
(Dr. Sunitikumar Chatterji) (1926) = O. D. B. L.

৯। (The) Ocean of story (Tawney),
Edited by N. M. Penzer = O. S. (T.)

১০। Cambridge History of India (1937) = C. H. I.

১১। কৃত্তিবাসের রামায়ণ = কৃ. রা.

১২। গোর্খবিজয় (শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত) = গো. বি.

১৩। জনসেবক (পত্রিকা)

১৪। Journal of Asiatic Society = J. A. S.

১৫। Journal of Asiatic Society of Bengal. = J. A. S. B.

১৬। দেশ (পত্রিকা)

১৭। নওবাহার (পত্রিকা)

১৮। পঞ্চতন্ত্র (১), সম্পাদক F. Kielhorn, Ph. D. (ষষ্ঠ সং.) (১৮৯৬) = পঞ্চতন্ত্র

১৯। পদ্মাবতী (হবিবী প্রেসে মুদ্রিত) (সন ১৩৩৮ সাল) = প. (হ)

২০। Padumavati (Dr. Lakshmi Dhar) (1949) = P. (L. D.)

২১। Persian-English Dictionary (F. Steinglass) (Second Impression) — Steinglass

২২। প্রাচীন পুথির বিবরণ (সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৪৩ সং, সন ১৩২১ সাল) (সম্পাদক : মুনশী শ্রীআবদুল করিম) — প্রা. পু. বি,

২৩। বর্ণ-রত্নাকর (জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য) (শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) — ব. র (জ্যো. ক.) (Reprinted from the proceedings of the fourth Oriental Conference, Vol. II., 1928)

২৪। বঙ্গে সূফী প্রভাব (ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক্) (১৯৩৫) — ব. সূ. প্র.

২৫। বাল্মীকি রামায়ণ (মূল) — বা. রা.

২৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (শ্রীসুকুমার সেন) (২য় সং.) — বা. সা. ই.

২৭। বিদ্যাপতি (শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র) — বি (অ. বি. ও খ. মি.) (২য় সং., ১৩৪৮)

২৮। Bibliotheca Indica (Dr. L. P. Tessitori) — B. I. (T.) (A Descriptive Catalogue of Bardic and Historical Manuscripts) (Asiatic Society) (1917)

২৯। বিশ্বকোষ (রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়) (১৩০৮) — বি. কো.

৩০। বিশ্বভারতী পত্রিকা — বি. প.

৩১। বৈষ্ণব পদাবলী (শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র) (১৯৩০) — বৈ. প.

৩২। ভাষার ইতিবৃত্ত (শ্রীসুকুমার সেন) (৪র্থ সং.) — ভা. ই.

৩৩। মনসামঙ্গল (বিপ্রদাস পিপিলাই) (শ্রীসুকুমার সেন : এসিয়াটিক সোসাইটি) = ম. ম. (বি)

৩৪। মহাভারত (মূল) — ম.

৩৫। মহাভারত (ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট) — ম. (ভা. ও. রি. সো.)

৩৬। মাসিক মোহাম্মদী (পত্রিকা) — মা. মো.

৩৭। মাহে নও (পত্রিকা)

৩৮। Medieval India Quarterly (পত্রিকা) — M. I. Q.

৩৯। Modern Vernacular Literature of Hindusthan (George A. Grierson) (1889) — Mod. Vern. Litt. of Hindusthan (G.)

৪০। রঘুবংশম্ (কালিদাস) — র. ব.

৪১। Linguistic Survey of India — L. S. I.

৪২। Shorter Encyclopaedia of Islam (H. A. R. Gibb and J. H. Kramers) (1943) — Sh. Enc. Is.

৪৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (চণ্ডীদাস) (সম্পাদক : শ্রীবসন্ত রঞ্জন রায়) (২য় সং) — শ্রী. কী.

৪৪। শ্রীগীতগোবিন্দম্—শ্রী. গী.

৪৫। সওগাত (পত্রিকা)

৪৬। সতী ময়না (১ম অংশ : দৌলৎ কাজি; ২য় অংশ : আলাওল) (হামিদী প্রেস হইতে মুদ্রিত)—স. ম.

৪৭। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—সা. প. প.

৪৮। Hobson Jobson (Yule and Burnell, 1903)—H. J.

৪৯। হিন্দী সাহিত্য (ড: হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী)—হিন্দী সাহিত্য (হা. দ্বি)

৫০। (A) History of Indian Literature, Vol. I—H. I. L. (W.)
(M. Wienternitz) (1927)

৫১। History of Burma—H. Bur. (Ph.)
(Lieut.-General Sir Arthur P. Phayre, 1883)

৫২। History of Burma (G. E. Harvey, 1925)—H. Bur. (H.)

৫৩। History of Bengal (Sir Jadunath Sarkar, 1948)—H. B. (J.)

৫৪। History of Brajabuli Literature (Sri Sukumar Sen, 1935)—H. B. Litt.

৫৫। (The) Holy Quoran (Edited by Abdullah Yusuf Ali)—H. Q. (A. Y. A.)

সংশোধন

পৃঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫২	যাম···(মধ্যম পুরুষ)	যাম···(উত্তম পুরুষ)

রাংলার নাথসাহিত্য

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

বাংলার নাথসাহিত্য

সাহিত্যের জন্ম নিশ্চয়ই কোন এক পুণ্যলগ্নে হয়েছিল, কারণ ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কপালে পরেছে ধর্মের তিলক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মকে আশ্রয় করে সাহিত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু কেন? এর উত্তরে বলা যায়, সব দেশে ধর্মের রাজ্যেই সভ্যতা প্রথম পদক্ষেপ করে। ধর্মের বিস্তারই সভ্যতার প্রসারের প্রথম স্তর। ধর্মসম্প্রদায়গুলির ছত্রছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেই দেশের বিশেষ বিশেষ লোক প্রথমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আশিস্ লাভ করেন। তারপর তাঁদেরই উদ্যোগে ধর্মের অনুশাসনগুলিকে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রথা প্রবর্তিত হয়; তারপর ক্রমশঃ সেই লিপিবদ্ধ অনুশাসনে শিল্পনৈপুণ্য সঞ্চারিত হতে থাকে। এইভাবেই হয় সাহিত্যের জন্ম। এই নবজাতকের সঙ্গে সর্বসাধারণের সম্পর্কও স্থাপিত হয় ধর্মেরই মাধ্যমে। যখন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আকারে ধর্মমত প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখনও সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহিত্যকে অবলম্বন স্বরূপ ব্যবহার করা হয়; কারণ কেবলমাত্র সাহিত্যের মায়ারসায়নই ধর্মের কঠিন ও নীরস তত্ত্বকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারে। এই রকম করেই বিস্তৃত হয় সাহিত্যের পরিধি।

আমাদের দেশেও সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশ এইভাবেই হয়েছিল। কিন্তু অন্যসব দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ অনেক বেশিদিন স্থায়ী হয়েছে। আমাদের সংস্কারের বৈশিষ্ট্যই তার জন্য দায়ী। আমাদের প্রাচীন সমাজে এই বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে ধর্ম সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ যে সত্যের উপলব্ধি লাভ করে, তাই মানব মনের অনুভূতির পরাকাষ্ঠা। এই কারণে সে যুগের লোকেরা সাহিত্য চারুকলা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্পগুলির মূল্য ও সার্থকতা অনুভব করলেও তাদের ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করবার কথা কল্পনা করতে পারেন নি। তাদের উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই তাঁরা ধর্মের উপর তাদের নির্ভরতার লাঘব করেন নি। তাঁদের ধারণা ছিল, সাহিত্য একান্ত ভাবে ধর্মাশ্রিত হলেই তার লোকোত্তর চমৎকারিতার চরম স্ফূর্তি হয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁরা রসাস্বাদনের অনির্বচনীয়তা বোঝাবার জন্যে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বিশেষণ প্রয়োগ করতেন। আবার এই বিশেষণটির বহুল ব্যবহারের ফলে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে রস আস্বাদনের যোগ্যতা প্রাক্তন কর্মফলের উপর নির্ভর করে। এর ফলে ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের আর একটি যোগসূত্র রচিত হল।

এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাহিত্যের উপর ধর্মের আধিপত্য চলেছিল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি। দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মমত প্রচারকে উপলক্ষ্য করে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের আবির্ভাব। তারপর থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়ার আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ধর্মের একচ্ছত্র

অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। নানা সম্প্রদায়ের সাহিত্যে এই অবিচ্ছিন্ন ধারাটির গতিপথ চিহ্নিত হয়ে আছে। মধ্যযুগের নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্যে আমরা তারই একটি সূত্র পাই।

আজকে আমরা নাথসাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা করব। কিন্তু এ আলোচনা তত্ত্বমূলক বা তথ্যমূলক নয়, সাহিত্যিক সমালোচনা। প্রশ্ন উঠতে পারে, নাথসাহিত্য সম্বন্ধে এই জাতীয় আলোচনা করার সার্থকতা কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, নাথসম্প্রদায়ের প্রভাব ও প্রসার ছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, তাঁদের সাহিত্যসাধনাও একটি দুটি ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভারতের প্রধান প্রধান সব ভাষাকেই আশ্রয় করেছিল। এই সর্বভারতীয় সাহিত্যে বাংলার কতখানি দান এবং কতটুকু তার গুণাগুণ, সে সম্বন্ধে সঠিক হিসাব নিকাশ করে নেওয়া ভালো।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি বাংলার নাথসাহিত্যের উপজীব্য কাহিনী দুটি বাংলারই নিজস্ব সম্পদ। এও আমরা দেখিয়েছি কাহিনী দুটি নাথসম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নয়, সর্বসাধারণের সম্পত্তি। এদের আবেদন ও ভাবৈশ্বর্য যে কত অপরিসীম, তা আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, দুটি কাহিনীই অত্যন্ত প্রাচীন। 'গোরক্ষবিজয়' এর রচনাকাল যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ, তা অন্যত্র দেখানো হয়েছে। সুতরাং তারও আগে থাকতে এর কাহিনী বাঙালীর পরিচিত ছিল বলে মনে হয়। গোপীচাঁদের কাহিনীও যে ষোড়শ শতকেরও আগে থাকতে ছিল তার প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দী কাব্য 'পদুমাবৎ'এ (জায়সী বিরচিত) এই কাহিনীর উল্লেখ। অতএব নাথসাহিত্যের বিশদ সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের এই প্রাচীন ও মহার্ঘ সম্পদের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি যেমন সম্ভব হবে, তেমনি কবিদের হাতে পড়ে এই সম্পদের কি পরিমাণ সদ্ব্যবহার হয়েছে, তারও একটা পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাবে।

বাংলায় নাথসাহিত্যের বর্তমানে যে উদাহরণ মেলে, তা পদ্যে গ্রথিত দুটি কাহিনী। নাথ সিদ্ধ (বা সিদ্ধা) দের মাহাত্ম্য এই দুটি কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে একটিতে পাই দেবী গৌরীর শাপে সিদ্ধ মীননাথের অধঃপতন এবং সুযোগ্য শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর উদ্ধারের বৃত্তান্ত। অপরটিতে মেলে জননী ময়নামতীর অনুরোধে মেহেরকুলের রাজা গোপীচাঁদের সিদ্ধ হাড়িপার কাছে দীক্ষা গ্রহণের বর্ণনা। প্রথম কাহিনীটি যে রচনার মধ্যে পাওয়া যায় তার বিশিষ্ট নাম 'গোরক্ষবিজয়'। আজ পর্যন্ত এর যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গেছে, তাতে বিভিন্ন লোকের ভণিতা থাকলেও তাদের পরস্পরের পাঠের মধ্যে প্রভেদ যৎসামান্য। সুতরাং এই কাহিনী অবলম্বনে যে একটির বেশী পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এর রচয়িতা কে, এবং রচনাকাল কি, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় কাহিনীটি নানা ধরণের রচনার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এগুলির রচনাকালও জানা গেছে। আজ পর্যন্ত আমরা এই কাহিনী অবলম্বিত এই রচনাগুলি পেয়েছি—সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একটি নাটপালা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত তিনজন বিভিন্ন কবির তিনটি পাঁচালী এবং উনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত একটি লোকমুখে প্রচলিত অলিখিত ছড়া। এই সমস্ত রচনাগুলিকে আমরা সাধারণভাবে 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' নামে অভিহিত করতে পারি।

বাংলার নাথসাহিত্যের নিদর্শনগুলি খুব প্রাচীন না হলেও এর ঐতিহ্য খুবই সুপ্রাচীন। বহু

আগে থেকেই নাথসম্প্রদায় নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টি করে আসছেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের রচনাগুলি হয় লুপ্ত হয়েছে, না হয় অপরাপর সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে মিশে গেছে। ডাঃ সুকুমার সেন তাঁর "নাথ-পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য" নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে চর্যাপদের মধ্যে একান্তরূপে নাথ ভাবধারা আশ্রিত কয়েকটি পদ রয়েছে। এগুলিকে নাথসম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোকের রচনা বলে তিনি মনে করেন। বাংলার নাথসাহিত্যের উদাহরণ স্বরূপ যে দুটি আখ্যায়িকা আমাদের কাছে পৌছেছে, তাদের আদি উদ্ভব যে বাংলা দেশে হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রমাণ সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে গোরক্ষবিজয়ের কাহিনীটি পূর্ণাঙ্গ রূপে বাংলা দেশের বাইরে যায়নি, তার ভগ্নাংশ মাত্র অন্যান্য প্রদেশের কোন কোন অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক রচনায় পাওয়া যায়; এই ঘটনা নিয়ে স্বতন্ত্র কাব্য সৃষ্টির নিদর্শন বাংলা ভিন্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না। গোপীচাঁদের পাঁচালীর কাহিনী অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে এবং বর্তমানে প্রাপ্ত বাংলা রচনাগুলি তাদের তুলনায় পরবর্তী কালের সত্য, কিন্তু সমস্ত প্রদেশের কাহিনীতে গোপীচাঁদকে বাংলা দেশেরই রাজা বলা হয়েছে এবং বাংলা দেশই কাহিনীর প্রধান ঘটনাস্থল। অতএব বাংলাই এই কাহিনীর উৎসভূমি, তাতে কোন সংশয় নেই।

এই দুটি কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত কাব্য লেখা হয়েছে, আমরা আপাততঃ তারই আলোচনা করব। এই কাব্যগুলি মঙ্গলকাব্যেরই মত ধর্মমূলক আখ্যানকাব্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য এগুলিকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ে ফেলেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এক রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত গোপীচাঁদ-ময়নামতীর ছড়াটি ভিন্ন নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত আর কোন রচনাই লোকসাহিত্যপদবাচ্য নয়। কারণ লোকসাহিত্যের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে নেই। লোক-সাহিত্য সমগ্র সমাজের সৃষ্টি, রচয়িতার নিজের হাতের ছাপ তার মধ্যে থেকে মুছে যায়, কিন্তু 'গোরক্ষবিজয়', ভবানীদাসের 'গোপীচাঁদের পাঁচালী', সুকুর মহম্মদের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' প্রভৃতির মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত কৃতিত্বই বেশী স্পষ্ট, তাঁর সচেতন শিল্পবোধের পরিচয়ও অনেক জায়গায় মেলে, অন্ততঃ প্রত্যেকটি কাব্যই যে মোটামুটিভাবে আগাগোড়া একই হাতের লেখা, তা সহজেই বোঝা যায়। এই সমস্ত কাব্য যে একদিন লোকের মুখে মুখে গীত হত এবং পরে ব্যক্তিবিশেষ এদের সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন, একথা মনে করবার অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই। লোকসাহিত্যে অঞ্চল-ভেদে গুরুত্বপূর্ণ পাঠভেদ দেখা দেয়, কিন্তু উপরোক্ত গ্রন্থগুলির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে পাঠভেদ খুবই অল্প। এছাড়া এই সমস্ত বইগুলির মধ্যে, বিশেষতঃ 'গোরক্ষবিজয়ে' অনেক জায়গায় দুর্বোধ্য সাধনতত্ত্ব সাংকেতিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, এ জিনিস যে লোকসাহিত্যের মধ্যে স্থান পেতে পারে না, তা শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নিজেই স্বীকার করেছেন (বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ৪৭-৪৮)। নাথ-সাহিত্যের কাহিনী দুটি বাংলার জনসমাজেরই সম্পত্তি, এই হিসেবে নাথসাহিত্যকে লোক-ঐতিহ্য-বিজড়িত সাহিত্য বলা যায়, কিন্তু এর অধিকাংশ রচনাকেই আমরা বর্তমানে যে আকারে পাচ্ছি, তা ব্যক্তিবিশেষের নিজের সৃষ্টি, লোকসাহিত্য নয়।

অতএব এই রচনাগুলিকে ধর্মমূলক আখ্যানকাব্য ভিন্ন অন্য কোন আখ্যায় অভিহিত করা যায় না।

বাংলার ধর্মমূলক সাহিত্যের বিবর্তনের ক্রমগুলি এদের মধ্যে বেশ সুচিহ্নিত। আমরা আগেই বলেছি, কোন সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে ধর্মচর্চার প্রয়োজন থেকে হয় সাহিত্যের জন্ম, তারপর বাইরের সর্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন থেকে হয় সাহিত্যের প্রসার। কিন্তু বিশেষ কারণে কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম ঘটে, যেমন ঘটেছে আমাদের দেশে একটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। যেসব সম্প্রদায় অদীক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব পরিবেশন অবাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতে দেন না, ফলে তার প্রসার হয় রুদ্ধ। আমাদের দেশে প্রায় সমস্ত প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের বিশুদ্ধি এবং গোপনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখার আগ্রহ কম বেশী পরিমাণে ছিল, কিন্তু এই মনোভাব সবচেয়ে প্রবল ছিল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য দীর্ঘকাল ধরে শুধুমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের গণ্ডীতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, বহুদিন পর্যন্ত বাইরের লোক তার আস্বাদন থেকে বঞ্চিত ছিল। বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যেও নিজেদের ধর্মতত্ত্বের গোপনীয়তা ও পবিত্রতা অব্যাহত রাখার কঠোর নিয়ম ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার তাঁদের মনে জনসাধারণকে আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষাও কিছু কম ছিল না। এই কারণে তাঁরা চর্যাপদগুলি রচনায় একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে দু'দিকই রক্ষা করেছিলেন। ধর্মের মূল তত্ত্বটি যাতে অদীক্ষিতেরা বুঝতে না পারে, সেই জন্যে তাঁরা তাকে সাঙ্কেতিক ভাষায় আবৃত করে রেখেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করবার জন্যে সেই প্রচ্ছন্ন তত্ত্বযুক্ত সাহিত্য তাদের মধ্যে প্রচার করতেন মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে, মনোরম ছন্দে, সুরতাল সহযোগে গান করে। তাই চর্যাপদগুলির মধ্যে অন্তর্গূঢ়তা ও বহির্মুখিতা এই দুই আপাতবিরোধী বৃত্তিকে যুগপৎ ক্রিয়ারত দেখা যায়। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে কিন্তু এই দুই বৃত্তি আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ঐ যুগে দেখা যায় বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্য সম্পূর্ণভাবে নিজের বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আর মঙ্গলকাব্য নামে সাম্প্রদায়িক রচনা হলেও আসলে সম্প্রদায়বিশেষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে উঠেছে, পরিপূর্ণভাবে সমগ্র সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এই যুগের সাহিত্যে পূর্বোক্ত দুটি বৃত্তির বিশ্লেষ ঘটলেও নাথসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'গোরক্ষবিজয়' ও 'গোপীচাঁদের পাঁচালী'র ভিতর এমন অনেক অংশ পাই, যাদের মধ্যে নাথধর্ম ও নাথ সাধনপ্রণালীর গূঢ় তত্ত্ব সাঙ্কেতিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, অনধিকারী যাতে কিছু না বুঝতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার দেখি ধর্মের মূল উপদেশটি বর্ণনা করা হয়েছে চিত্তাকর্ষক কাহিনীর মধ্য দিয়ে, সর্বজনবোধ্য ভাষায়, পয়ার ত্রিপদী ছন্দে। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, অংশতঃ সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা এই সাহিত্যের প্রচার অশিক্ষিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই মধ্যে বেশী হয়েছিল। ভাবার দ্বৈতরীতির দিক দিয়ে নাথসাহিত্যের সঙ্গে চর্যাপদেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গেও নাথসাহিত্যের সুনিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। গঠনের দিক দিয়ে নাথসাহিত্য মঙ্গলকাব্যেরই সগোত্র—এ সাহিত্য মঙ্গলকাব্যেরই মত ধর্মের পটভূমিকায় রচিত আখ্যানকাব্য। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে নাথসাহিত্যে বর্ণিত কোন কোন ঘটনার সাদৃশ্য আছে। যেমন, মনসামঙ্গল কাব্যে দেবী মনসা কর্তৃক চাঁদসদাগরকে ছলনার বর্ণনা

আর গোরক্ষবিজয় কাব্যে দেবী গৌরী কর্তৃক গোরক্ষনাথকে ছলনার বর্ণনা অনেকটা একই রকম। গোপীচাঁদের পাঁচালীর হীরা বেশ্যার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যের নয়ানীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যু যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে মনসামঙ্গলের লখিন্দরের মৃত্যু বর্ণনার যথেষ্ট মিল আছে। তারপর, ধর্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তনকাহিনী ও নাথসাহিত্যে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তনকাহিনী প্রায় অভিন্ন। মঙ্গলকাব্যের রচনা-প্রণালীর কতকগুলি বাঁধা-ধরা রীতি ছিল। তার মধ্যে কয়েকটি,—যেমন নারীর রূপ বর্ণনা, নায়িকার বারমাস্যা বর্ণনা, ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা বর্ণনা প্রভৃতি 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' পর্যায়ের কোন কোন রচনায় স্থান পেয়েছে।

শিবায়ন কাব্যের সঙ্গেও নাথসাহিত্যের গভীর ঐক্য রয়েছে। নাথধর্মের গঠনে শৈবধর্মের প্রভাব সামান্য নয়। ফলে বাংলার শৈব সাহিত্য স্বতঃই বাংলার নাথসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে। শিবায়ন কাব্যের শিবকেই নাথেরা একটু মেজে ঘসে নিয়ে নিজেদের রচনায় স্থান দিয়েছেন।

কিন্তু এইসব সাহিত্যের সঙ্গে এতখানি সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও নাথসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র আসন অধিকার করে আছে। তার কয়েকটি কারণও আছে। প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্য প্রমুখ রচনাগুলি একান্তভাবে বাংলাদেশেরই সম্পত্তি, কিন্তু নাথসাহিত্য সারা ভারতের সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি রচনা প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ বলে তাদের ভাবাকাশ খণ্ডিত, কিন্তু নাথসাহিত্যের পরিবেশ সর্বভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে উদার, প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। তারপর মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির মধ্যে লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী, তাঁদের মাহাত্ম্যের সুলভ নিদর্শন, ভিন্ন দেবতার নিন্দা, তাঁদের উপাসকের উপর উৎপীড়ন প্রভৃতি স্থান পাওয়ায় তাদের আবহাওয়া মলিন হয়ে উঠেছে। নাথসাহিত্যে এ সমস্ত বস্তুর কোন নিদর্শন মেলে না। নাথধর্ম নিরীশ্বর এবং উচ্চস্তরের দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তার প্রভাব নাথসাহিত্যে গ্লানিকর পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়নি, বরং তার প্রতিষেধক হয়েছে। লৌকিক দেবদেবীর পূজা করে ঐহিক ও পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের সহজ সুলভ পথ নাথসাহিত্য দেখায়নি, তার মধ্যে নাথধর্মের তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—যে ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য জীবন্মুক্তি লাভ। ভিন্ন ধর্মকে ছোট করার কোন প্রচেষ্টাই নাথসাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় না। এই উদার আদর্শের প্রভাবে নাথসাহিত্যে ভব্যতা ও সংযমের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। আয়তনের দিক থেকেও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে নাথসাহিত্যের পার্থক্য রয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত দীর্ঘায়তন হত, কিন্তু নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি নাতিদীর্ঘ ও সংহত।

মঙ্গলকাব্যগুলি দেশের মধ্যে শত ধারায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন সম্প্রদায়বিশেষের বেষ্টনী তাদের ধরে রাখতে পারেনি, সর্বসাধারণের মাঝখানে তারা স্থান লাভ করেছিল। উন্মুক্ত আসরে দিনের পর দিন ধরে মঙ্গলকাব্যগুলি গীত হত। একই মঙ্গলকাব্য কত বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবে রচনা করেছেন। নাথসাহিত্যের আখ্যায়িকার মধ্যে 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' প্রসারের দিক দিয়ে মঙ্গলকাব্যকেও হার মানিয়েছে। মঙ্গলকাব্যেরই মত গোপীচাঁদের গীত গাওয়া হত প্রকাশ্য আসরে, সারা বাংলা জুড়ে। উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ সব জায়গাতেই গোপীচাঁদের পাঁচালী রচনার নিদর্শন পাচ্ছি, এর থেকেই বোঝা যায় এই আখ্যায়িকার প্রচারক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ ছিল। মঙ্গলকাব্যের মত গোপীচাঁদ-

আখ্যায়িকার বিষয়বস্তুও বিভিন্ন কবির হাতে পড়ে বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে—নাটপালা, পাঁচালী, ছড়া নানা ধরণের রচনায়।

গোরক্ষবিজয়ের প্রসার এতখানি না হলেও তার কাহিনীর প্রসার নিতান্ত অল্প হয়নি। হয়নি যে তার একাধিক প্রমাণ আছে। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন কোন রচনার মধ্যে এই কাহিনীটি স্থান লাভ করেছে, যেমন সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিলপুরাণ; এর থেকেই বোঝা যায় কাহিনীটির এক সময়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা ছিল। দ্বিতীয় প্রমাণ, আগে বাঙালী ছেলেদের মধ্যে অনেকের 'মীনচেতন' নাম রাখা হত, এর থেকেই প্রতিপন্ন হচ্ছে সে যুগের জনসাধারণের মধ্যে গোরক্ষবিজয়-কাহিনীর সবিশেষ প্রচার ছিল।

গোরক্ষবিজয় গ্রন্থের বিস্তৃত বিচারে প্রবৃত্ত হবার আগে আমরা অন্যান্য রচনায় এর কাহিনী যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, তার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলব। সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে বহু পৌরাণিক ও অপৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীও অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। লক্ষ্মণের অনিলপুরাণের মধ্যে কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত ভাবেই বর্ণিত হয়েছে, তবে এক জায়গায় তার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। সমুদ্রের তীরে বসে শিবের গৌরীকে মহাজ্ঞান উপদেশ দান এবং মৎস্যের রূপ ধরে অলক্ষিতভাবে মীননাথের সেই মহাজ্ঞান শ্রবণ লক্ষ্মণ বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করেছেন। এটি এই কাহিনীর একটি বিশিষ্ট অংশ অথচ গোরক্ষবিজয়ে এর বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই ঘটনাটি সুকৌশলে বর্ণনা করলে উপভোগ্য রস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব; লক্ষ্মণ ততখানি না পারলেও তিনি যে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁর বিস্তৃত বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। এই বর্ণনার বেশীর ভাগই সন্ধা ভাষায় রচিত, ফলে বর্ণনাটি রহস্যের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হয়েছে। বৈষ্ণবদের গ্রন্থ ভক্তমালের বাংলা সংস্করণেও গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনী পাওয়া যায়, তবে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাতে মীননাথ ও গোরক্ষনাথকে নাথযোগী না বলে বৈষ্ণব সাধক বলা হয়েছে। তাতে দেখি মীননাথ কদলীর রাজ্যের রাজা না হয়ে বিষ্ণুভক্তিহীন এক রাজ্যে রাজপদ লাভ করে মায়ায় আবদ্ধ হয়েছেন। যে ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে তাঁর এই দশা হয়েছে, তা গোরক্ষবিজয়ে বর্ণিত ঘটনাপরম্পরা থেকে স্বতন্ত্র। তবে এক জায়গায় 'ভক্তমালে'র কাহিনীতে গোরক্ষবিজয়ের কাহিনীর তুলনায় উন্নতি দেখা যায়। গোরক্ষবিজয়ে দেখি, গোরক্ষনাথের উপদেশে মীননাথের মোহভঙ্গ হবার পর তিনি সমস্ত ভোগ ঐশ্বর্য নিঃশেষে ত্যাগ করে চলে এসেছেন। কিন্তু ভক্তমালার কাহিনীতে দেখি, গোরক্ষনাথের কাছে তত্ত্বকথা শুনে মীননাথের চৈতন্যোদয় হলেও সমস্ত মোহই এক সঙ্গে অন্তর্হিত হয়নি, তিনি রাজ্য ও নারী ত্যাগ করে এলেও মূল্যবান রত্নালঙ্কারগুলি সঙ্গে করে এনেছিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ রাস্তার মধ্যে সেগুলি জলে ফেলে দিয়ে উপদেশ প্রদান করে গুরুর অলঙ্কারের প্রতি মোহ ভঙ্গ করেন। এই যে একেবারে মীননাথের জ্ঞানোদয় না দেখিয়ে ক্রমে ক্রমে তাঁর আংশিক থেকে পরিপূর্ণ মোহমুক্তি আনা হয়েছে—এর মধ্যে নাটকীয় কলাকৌশলের পরিচয় আছে। এই বৈষ্ণব গ্রন্থে গোরক্ষনাথকে আদর্শ বৈষ্ণবের মত বিনয়ী রূপে দেখানো হয়েছে। তিনি গুরুকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে সঙ্কোচ বোধ করে গুরুর কাছে পরীক্ষা দেবার ছলে তত্ত্বকথা বলেছেন। গোরক্ষনাথকে দিয়ে এইভাবে তত্ত্বকথা বলানোও রচয়িতার শিল্পবোধের পরিচায়ক।

এখন 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের আলোচনা সুরু করা যেতে পারে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়েছে। সেইগুলির সমাধানের চেষ্টা করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য।

প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা কে? আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থের বারোটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আটটি পুঁথি মুন্শী আবদুল করিম সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল। তিনি 'গোরক্ষবিজয়' নাম দিয়ে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে এই আটটি পুঁথির পাঠ উল্লেখ ও ব্যবহার করেছেন। এদের মধ্যে একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৮৪ বঙ্গাব্দ, এই গ্রন্থের এর চেয়ে প্রাচীন পুঁথি আর মেলেনি। এই আটটি পুঁথি ছাড়া আরও চারখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে একটি পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, ডাঃ শহীদুল্লাহ্ এর ভণিতাংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। আর একটি পুঁথি ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সংগ্রহ; তিনি এই পুঁথিটি অবলম্বনে 'মীনচেতন' নাম দিয়ে এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। আর একটি পুঁথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। সর্বশেষ পুঁথিটি বিশ্বভারতীর সম্পত্তি; এটি অত্যন্ত অর্বাচীন, লিপিকাল ১২৬৩ বঙ্গাব্দ; এইটিকে অবলম্বন করে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল 'গোর্খবিজয়' নামে এর এক সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন, এই গ্রন্থের এইটিই আধুনিকতম সংস্করণ।

সমস্ত পুঁথিতে যদি একই লোকের ভণিতা আগাগোড়া মিলত, তাহলে সেই লোককেই অবিসংবাদিতভাবে আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা বলা যেত। কিন্তু ভণিতায় একাধিক লোকের নাম পাওয়া যাওয়াতে এ সম্বন্ধে বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে আমরা প্রথমে কোন পুঁথিতে কার ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে, তার একটি তালিকা সঙ্কলন করে তারপর এঁদের মধ্যে কে রচয়িতা, তার বিচার করব। নীচে তালিকাটি দেওয়া হল।

কোন পুঁথি	কার ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে
আবদুল করিমের ১নং পুঁথি	ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র ও কবীন্দ্রদাস
ঐ ২নং পুঁথি	ফয়জুল্লা ও ভীমদাস
ঐ ৩নং পুঁথি	ফয়জুল্লা ও ভীমদাস
ঐ ৪নং পুঁথি	ফয়জুল্লা ও ভীমদাস
ঐ ৫নং পুঁথি	ফয়জুল্লা ও শ্যামদাস সেন
ঐ ৬নং পুঁথি	ফয়জুল্লা
ঐ ৭নং পুঁথি	ফয়জুল্লা
ঐ ৮নং পুঁথি	ফয়জুল্লা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি	ফয়জুল্লা
ডাঃ ভট্টশালীর পুঁথি	শ্যামদাস সেন
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি	ফয়জুল্লা ও ভীমদাস
বিশ্বভারতীর পুঁথি	ভীমসেন রায়

যাঁদের ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ভীমদাস ও ভীমসেন রায় সম্ভবতঃ একই লোক। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এঁদের মধ্যে মূল রচয়িতা কে ?

কেউ কেউ অনুমান করেছেন কোন একজন অজ্ঞাতনামা কবি 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য রচনা করেছিলেন, কাব্যে তাঁর ভণিতা ছিল না (বা থাকলেও কালক্রমে লোপ পেয়েছিল), পরে গায়নরা নিজেদের ভণিতা বসিয়ে দিয়েছেন, এই হিসেবে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, শ্যামদাস, ভীমদাস প্রভৃতি সকলেই মূল গ্রন্থের গায়ন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এতগুলি লোকের ভণিতা যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন সকলকেই এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া এই অভিমত যদি সত্যি হত, তাহলে প্রত্যেকটি পুঁথির কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই ভণিতা পাওয়া যেত না, সেক্ষেত্রে গায়নেরা নিজেদের খুশীমত যে যেখানে ইচ্ছে ভণিতা দিতেন। অতএব এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে মূল রচনার এইসব নির্দিষ্ট জায়গায় লেখকেরই ভণিতা ছিল, পরে কোন কোন পুঁথিতে গায়নেরা বা লিপিকরেরা ভণিতায় লেখকের নাম বাদ দিয়ে নিজেদের বা অপরের নাম বসিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাপার আগেকার দিনে খুবই চলত, নাথগ্রন্থ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' রচয়িতা সুকুর মহম্মদ তাই লিপিকরদের উদ্দেশ্যে শপথ দিয়ে গেছেন,

"দেখিয়া লিখিতে জে দেএ আপন ভঙ্গিতা।
নরকেত পড়িবে তাহার মাতাপিতা॥
সপ্তপুরুষ তার নরকেত বাস।
আবদুল সুকুরে কহে রাজার সন্ন্যাস॥"

অতএব যার ভণিতা সবচেয়ে বেশী পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাঁকেই আমরা 'গোরক্ষবিজয়'এর রচয়িতা বলে স্বীকার করতে বাধ্য। এই হিসেবে ফয়জুল্লাকেই গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা বলতে হয়, কারণ শতকরা ৮৩টি পুঁথিতে তাঁর ভণিতা পাওয়া যাচ্ছে। অবিমিশ্রভাবে তাঁরই ভণিতা পাচ্ছি চারটি পুঁথিতে।

ফয়জুল্লাই যে 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা, তার অকাট্য প্রমাণ ডাঃ এনামুল হক সাহেব আবিষ্কার করেছেন। তিনি ২৪ পরগণার বারাসতের কাছে এক গৃহস্থ বাড়ীতে কতকগুলি পুঁথির বিক্ষিপ্ত পাতা পান। তাদের একটির মধ্যে এই কটি চরণ মিলেছে,

"গোর্খবিজএ আছে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।
খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজী॥
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন॥"[১]

১ মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৪২, পৃঃ ৫৩৬-৩৭

উদ্ধৃত অংশটিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে শেখ ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয় এবং সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন।[১] এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উপরে উদ্ধৃত অংশটি আবিষ্কারের পরে ফয়জুল্লার সত্যপীরের পাঁচালীর পুঁথিও আবিষ্কৃত হয়েছে (ডাঃ সুকুমার সেন রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১০৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং উদ্ধৃত অংশটুকুর অকৃত্রিমতা ও প্রামাণিকতা সন্দেহের অতীত।

গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণও ফয়জুল্লার স্বপক্ষে। প্রায় প্রত্যেকটি পুঁথিতেই প্রচুর মুসলমানী শব্দ দেখা যায়—যেমন আমল ('অভ্যাস' অর্থে), খাক্, আসমান, জমিন, নুর, আপেআপ প্রভৃতি। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি,[১] মুন্‌শী আবদুল করিম[২] এবং ডাঃ শহীদুল্লাহ্[৩] এর বিস্তৃত উদাহরণ দিয়েছেন। এই সব শব্দ প্রাচীন হিন্দু কবিরা ব্যবহার করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ বলে থাকেন, 'গোরক্ষবিজয়ে' হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা, হিন্দু পুরাণের উপাখ্যান এবং হিন্দু যোগশাস্ত্রের কথা আছে বলে তা মুসলমানের লেখা হতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই অচল। ফয়জুল্লার দৃষ্টিভঙ্গী যে সম্পূর্ণ উদার ছিল, তার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা 'সত্যপীরের পাঁচালী'র মধ্যে। এই কাব্যের সূচনায় কবি আল্লা, মোহাম্মদ মুস্তফা, পাঞ্জাতন পীর, রসুলের চার ইয়ার, স্থানীয় পীর ও পীরাণী প্রভৃতির বন্দনা করে তারপর বলেছেন,

"হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
যমুনার তটে বন্দো রাস-বৃন্দাবন
কৃষ্ণ-বলরাম বন্দো শ্রীনন্দনন্দন॥
দৈবকী রোহিনী বন্দো শচী ঠাকুরাণী
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলা আপনি।
শুনহ ভকত লোক হয়ে একচিত
সত্যপীর সাহেব সভার করে হিত॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন।
ভকত না একের তরে মোদেত হইয়া
আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়া।
ছাড় গাজি মোক্কার স্থান আসরে দেহ মন
গাইল ফৈজল্যা কবি সত্যপদে মন॥"[৪]

১ প্রতিভা, ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪
২ গোরক্ষবিজয় (আবদুল করিম সম্পাদিত), পৃঃ ৫৬-৫৮
৩ সা. প. প. (৬০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১২১)
৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১০৪৩-৪৪

যোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা এই কাব্যে আছে, তা নাথধর্মের কায়াযোগ, এতে শুধুমাত্র হিন্দুদের অধিকার ছিল না, হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের লোকই যে নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তার প্রমাণ আছে (গোর্খবিজয়, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ভূমিকা, পৃঃ ছ-৫-৬ দ্রষ্টব্য)। কবি ফয়জুল্লা মুসলমান হলেও নাথপন্থী ছিলেন, তাই কায়াযোগতত্ত্ব তাঁর আয়ত্ত ছিল।

যাহোক্, আলোচনার ফলে দেখা গেল, ফয়জুল্লাই গোরক্ষবিজয় কাব্যের রচয়িতা। পরের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা গোরক্ষবিজয় সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি, তার থেকে বোঝা যাবে ফয়জুল্লা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এঁর প্রতিভা বহুমুখী ছিল। গোরক্ষবিজয়, গাজীবিজয় ও সত্যপীরের পাঁচালী ছাড়া তিনি বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়, কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে মীর্জা ফয়জুল্লা ভণিতায় অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ পাওয়া গেছে, গোরক্ষবিজয়ের একটি পুঁথিতে "মীর ফয়জুল্লা" ভণিতা দেখা যায়,[১] সুতরাং পদকর্তা ফয়জুল্লার সঙ্গে 'গোরক্ষবিজয়'কার ফয়জুল্লার এক হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

শেখ ফয়জুল্লার কাব্যের প্রচার প্রায় সারা বাংলা দেশেই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। গোরক্ষবিজয়ের অধিকাংশ পুঁথিই উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাওয়া গেছে, সত্যপীরের পাঁচালীর পুঁথি পশ্চিম বঙ্গে পাওয়া গেছে এবং ডাঃ এনামুল হক সংগৃহীত রচনাংশটুকু ২৪ পরগণা জেলায় পাওয়া গেছে। প্রাচীনযুগে এরকম একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় মুসলমান কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, এটি সত্যিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়।

'গোরক্ষবিজয়ের' রচনাকাল এতদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। কিন্তু ডাঃ এনামুল হক আবিষ্কৃত রচনাংশ থেকে এ সম্বন্ধে এখন পরিষ্কার আলোক লাভ করা সম্ভব হয়েছে। ঐ অংশটি থেকে জানা যাচ্ছে, 'সত্যপীরের পাঁচালী' 'মুনি-রস-বেদ-শশী" শাকে রচিত হয়। প্রাচীন বাঙালী কবিরা 'রস' শব্দ ছয় অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহার করতেন, সুতরাং ১৪৬৭ শকাব্দ বা ১৫৪৫-৪৬ শকাব্দ সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল। উদ্ধৃত অংশটি থেকেই জানা যাচ্ছে যে, ফয়জুল্লা সত্যপীরের পাঁচালীর আগে গাজীবিজয় লেখেন এবং তারও আগে গোরক্ষবিজয় লেখেন। সুতরাং গোরক্ষবিজয়ের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই নিশ্চিত।

গোরক্ষবিজয়ের এই প্রাচীনতা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত। গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও সুপরিচিত ছিল, তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, "ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মধ্যেও মীনচেতন নাম প্রচলিত ছিল।"[২] গোবিন্দদাসের একটি বিখ্যাত পদে "গোরখ জগাই" (গোরক্ষযোগী)র উল্লেখ পাওয়া যায়,

"গোরখ জগাই শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভিখ আনি দেল
মৌনী যোগীশ্বর মাথ হিলায়ত
বুঝল ভিখ নাহি লেল ॥"

১ গোরক্ষবিজয়, ভূমিকা, পৃঃ ৮ ২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭৫১

গোবিন্দদাসের এই উল্লেখ কাহিনীটির জনপ্রিয়তার আর একটি প্রমাণ। আমাদের মনে হয় এই সময় জনসাধারণের মধ্যে 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের বহুল প্রচার ছিল, তাই এই কাহিনীটি সুপরিচিত হয়ে পড়েছিল।

এসম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ভাষার প্রাচীনতা। চৈতন্যভাগবত, কবীন্দ্রের মহাভারত প্রভৃতি অন্যান্য ষোড়শ শতাব্দীর রচনার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, গোরক্ষবিজয়ের ভাষা তাদের তুলনায় কোন অংশেই আধুনিক নয়, বরং কোন কোন জায়গায় প্রাচীন বলেই মনে হবে। আবদুল করিম এই গ্রন্থের ভাষার প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১] প্রাচীনতর পুঁথিগুলিতে সর্বনাম পদে নাসিক্য মহাপ্রাণের প্রয়োগ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়, যেমন আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতি।

এই গ্রন্থের তথা এর নায়কের প্রকৃত নাম কি, সেটিও আজ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। বইটির পুরো নাম একটি পুঁথির পুষ্পিকায় পাওয়া যায়—"ইতি মীননাথ চৈতন্য গোর্খবিজয় সমাপ্ত।" কিন্তু 'গোর্খ' নামটির বদলে 'গোরক্ষ' পাঠ গ্রহণ করা উচিত কিনা, সে সম্বন্ধে সকলে একমত হতে পারেন নি। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল দেখিয়েছেন আজ অবধি কোন বাংলা পুঁথিতে 'গোরক্ষ' পাওয়া যায়নি, সর্বত্র 'গোর্খ' 'গুর্খ' বা 'গোর্ক্ষ' পাওয়া যায়। কিন্তু 'গোর্খ' শব্দটি যে মূলে 'গোরক্ষ' ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। কারণ হঠযোগদীপিকা, গোরক্ষবোধ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং অনেক অপভ্রংশ বাণীতে 'গোরক্ষনাথ' বা 'গোরখনাথ' নাম পাওয়া যায় এবং গোবিন্দদাসের ব্রজবুলী পদে 'গোরখ' শব্দই পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর ভারতের অনেক স্থানের নামের সঙ্গে 'গোরক্ষ' নাম যুক্ত দেখা যায়। 'গোরক্ষ'—এত বড় নামটি ছন্দ অক্ষুণ্ন রেখে ব্যবহার করা চলে না বলে বাঙালী কবি তাকে সংক্ষেপে 'গোর্খ' বা 'গোর্ক্ষ' করে নিয়েছেন। 'গোর্খ'-র বদলে 'গোরক্ষ' পাঠ নেওয়ার অনুকূলে প্রধান যুক্তি এই যে,—বাংলা পুঁথিতে কতকগুলি সংস্কৃত নাম প্রায় সর্বত্র পরিবর্তিত রূপে পাওয়া যায়, যেমন 'বাল্মীকি', 'কৃত্তিবাস' ও 'ভারত পাঁচালী'র জায়গায় 'বাল্মীক', 'কির্ত্তিবাস' এবং 'ভারথ পাঁচালী' পাওয়া যায়, কিন্তু এইগুলিকে পাঠবিকৃতি হিসেবেই গণ্য করা হয়, মূল সংস্কৃত রূপই অবিসংবাদিত ভাবে যথার্থ প্রয়োগ বলে বিবেচিত হয়। এই কারণে আমরা আমাদের আলোচনায় সর্বত্র 'গোরক্ষনাথ' ও 'গোরক্ষবিজয়' নামই ব্যবহার করেছি।

এখন আমরা এই প্রাচীন কাব্যটির সমালোচনা করব। আমাদের পূর্ববর্তী সমালোচকেরা এই কাব্যটির সম্বন্ধে যা বলেছেন, প্রথমে তার উল্লেখ করব। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "(গোরক্ষবিজয়ের) কাহিনীর প্রধান গুণ, ইহার মানবিক আবেদন; ইহার মধ্যে সাধন-ভজন ও সাধক-সিদ্ধার কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহা মূল কাহিনীর স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ ইহার প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া সহজ মানবিক অনুভূতির বিকাশ হইয়াছে।"[২] শ্রদ্ধেয় কালিদাস রায় বলেছেন, "যদি উপাখ্যানের ব্যঙ্গার্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে ইহার (গোরক্ষবিজয়ের) সাহিত্যিক মূল্য কম নহে।...এই কাহিনীর মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা এই—

"বহু কঠোর সাধনা করিয়া যে যোগী ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, কিংবা যে প্রবৃত্তির পরিপাকের পর নিবৃত্তি

১ গোরক্ষবিজয়, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩৮-৪৭ ২ বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৫৫

লাভ করিয়াছে, মোহিনী মায়ায় সে কখনো বিচলিত হয় না। কিন্তু যে যোগী শুধু সবলে ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বৃদ্ধবয়সেও পদস্খলন হয়। এখানে গোরক্ষনাথ নিজের কঠোর সাধনা বলে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—মীননাথ মহাজ্ঞান পাইয়াছিলেন ফাঁকি দিয়া। তাই তিনি মোহিনী মায়ায় মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বৈরাগ্যের মহাশত্রু মহামায়া। তিনি মায়ায় মুগ্ধ করিয়া জীবকে লালন করেন এবং তাহার দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করেন। মীননাথ মহামায়ার ছলনায় ভুলিলেন। গোরক্ষনাথকে ছলনা করিতে আসিয়া মহামায়ার লাঞ্ছনার একশেষ হইল। মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া গোরক্ষনাথের মনে হইল—এমন জননী পাইলে 'তাহান কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই'। মহামায়া মোহিনী মূর্ত্তিতে সকলকেই মোহিত করিতে আসেন, যে মা বলিয়া তাহার চরণে শরণ লয়,—সেই বাঁচিয়া যায়। মাতৃরূপে মহামায়ার ভজনার ইহাই মূল সূত্র।

"গুরু নিজে সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইয়াও যদি অনন্যসাধারণ শিষ্য লাভ করেন, তবে তাঁহার দীক্ষামন্ত্রে শিষ্য গুরুরও গুরু হইয়া উঠিতে পারেন—এমন কি যদি গুরুরও পদস্খলন হয় তাহা হইলে সেই শিষ্য তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন। মীননাথ মীনের মতনই পঙ্কে ডুবিলেন—গোরক্ষনাথ সেই পঙ্ক হইতে গুরুকে রক্ষা করিয়া গুরু-রক্ষক হইলেন। এত বড় গুরুদক্ষিণা আজ পর্যন্ত কোন শিষ্য গুরুকে দেয় নাই।"[১]

এই দুই প্রখ্যাত সমালোচকের মত অবশ্যই শিরোধার্য। কিন্তু কাহিনী এবং ব্যঙ্গার্থ ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও যে এই প্রাচীন গ্রন্থটির উৎকর্ষ বড় কম নয়, সেইটুকু দেখানোই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

গোরক্ষবিজয়ের বিচার করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে, বইটি কাব্য হয়েছে কিনা। এতদিন পর্যন্ত সকলে একে কাব্য বলেই গণ্য করে এসেছেন। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল বইটিকে কাব্যের শ্রেণীতে স্থান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইহা কাব্য নহে। বায়ু-বিজয়-শাস্ত্র।" এইজন্যে প্রশ্নটির বিশদ বিচার দরকার হয়ে পড়েছে।

পঞ্চাননবাবুর উক্তি থেকে মনে হয়, যে গ্রন্থ শাস্ত্রশ্রেণীভুক্ত, তা আদৌ কাব্যপদবাচ্য হতে পারেনা বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু আসলে কাব্য ও শাস্ত্রের মধ্যে এই জাতীয় আবিশ্যিক বিরোধ মোটেই নেই। বাইবেল ও শ্রীমদ্ভাগবত ধর্মগ্রন্থ হলেও সাহিত্য হিসাবে তাদের স্থান সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শাস্ত্রগ্রন্থ, কিন্তু তার সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এইরকম আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, 'গোরক্ষবিজয়ে'র শাস্ত্রত্ব তার কাব্যত্বের পরিপন্থী নয়, এই সত্যটি ইতিমধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে বলেই আশা করি। এখন 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য হয়েছে কিনা, এই প্রশ্নটিই আমাদের সাবধানে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

'গোরক্ষবিজয়' একটি দীর্ঘায়ত ছন্দে গ্রথিত কাহিনী। সুতরাং তার মধ্যে কাব্যগুণ স্ফূর্তি পেয়েছে কিনা তা জানতে হলে আখ্যানকাব্যের বিচার-পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে হবে। আখ্যানকাব্যের চারটি উপাদান—কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও ছন্দ তার চারটি স্তম্ভস্বরূপ। কাহিনীর মধ্যে কতখানি কাব্যোপযোগিতা

১ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯২-৯৩

আছে, চরিত্রগুলি সজীব ও স্বাভাবিক হয়েছে কিনা, ভাষার মধ্যে কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত আবেগ রমণীয়ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে কিনা এবং ছন্দের মধ্য দিয়ে কাহিনীটির গতি এবং বর্ণনার সৌন্দর্য ব্যঞ্জিত হয়েছে কিনা—আখ্যানকাব্যের আলোচনায় এই সব প্রশ্নেরই মীমাংসা করতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত সাহিত্যের যে অপরিহার্য লক্ষণ, জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ও নিবিড় সংযোগ, সেই গুণ আলোচ্য আখ্যানকাব্যের মধ্যে কতখানি স্ফূর্ত হয়েছে সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য আলোচ্য রচনা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হয়েছে কিনা নিরূপণ করতে হলে এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাবার পরেও আর একটি বিষয় বিচার করতে হবে। সেটি হচ্ছে এই যে, এই সমস্ত অঙ্গগুলির মধ্যে সুনিবিড় সংহতি এবং পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা অর্থাৎ রচনাটিতে একটি অখণ্ড সমগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায় কিনা। আমরা 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাব্যত্ব বিচার প্রসঙ্গে একে একে এই সমস্ত প্রশ্নেরই আলোচনা করব।

প্রথমতঃ আমরা দেখি, 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীটির মধ্যে কাব্যসম্ভাবনার কোন অভাব নেই। গৌরীর শাপে অধঃপতিত সিদ্ধযোগী মীননাথ যখন কদলীর রাজ্যে গিয়ে দুর্নীতি ও ব্যভিচারের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন, তখন তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ নর্তকীর ছদ্মবেশে তাঁর প্রাসাদে প্রবেশ করে তত্ত্বোপদেশ শুনিয়ে তাঁর চৈতন্য-সম্পাদন করলেন—এই কাহিনী চমৎকারিত্বে ও অভিনবত্বে আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। জীবন্মুক্ত শিষ্য কর্তৃক মোহমগ্ন গুরুকে উপদেশ দান, এই স্বভাব-বিপরীত কল্পনার মত স্নিগ্ধ ও মনোরম বস্তুর সন্ধান খুব অল্পই মেলে। এই দিক দিয়ে কাহিনীটি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত। ডাঃ সুকুমার সেন ঠিকই বলেছেন, "সর্বভূমিক সাহিত্যে বাংলার একটি বিশিষ্ট দান এই কাহিনীটি।"

এইবার চরিত্র-চিত্রণে কাব্যের মর্যাদা রক্ষা পেয়েছে কিনা তাই বিচার করতে হবে। প্রথমে এই কাহিনীর নায়ক গোরক্ষনাথের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করা যাক। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখি চরিত্রটির মধ্যে একাধিক বিষয়ে অসাধারণত্ব আছে। গোরক্ষনাথ একাধারে অটুট সংযম, দৃপ্ত পৌরুষ এবং অবিচলিত গুরুভক্তির মূর্তিমান দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাকে অবলম্বন করে সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলেছেন, "গোরক্ষনাথের অবিচলিত চরিত্রে যে নির্বিশেষ শ্রেয়োবোধ আছে, তাহা সাহিত্যেরই উপজীব্য।"

এই চরিত্রটির পরিকল্পনা বহু সহৃদয় সাহিত্যরসিককেই বিমুগ্ধ করেছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেছেন, "গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপূর্ব গ্রন্থ যে বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগে রচিত হইয়াছিল ; ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র ; তাহার চরিত্রমাহাত্ম্য বঙ্গসাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক-নির্দেশক স্তম্ভ। এই অপূর্ব পুঁথির গ্রাম্যভাষা ও রুচি যে পাঠককে শ্রান্ত ও ভগ্নোৎসাহ করিবে, তিনি সাহিত্যের এক মহার্ঘ খনির পরিচয় লাভে বঞ্চিত হইবেন।"

এই প্রশংসোক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে নায়ক গোরক্ষনাথের চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলেই গণ্য হবে। রচনার প্রথম অংশে অবশ্য এই চরিত্রটি প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে পারেনি। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে

সাক্ষাতের পর থেকে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাভাবিকত্ব মহত্ত্বের গরিমায় দীপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। তখন আর সে আদর্শবাদের মানবসংস্করণমাত্র নয়, আবেগে অনুভূতিতে সংবেদনায় জীবন্ত চরিত্র।

গোরক্ষনাথের চরিত্রের যে দুটি দিক প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা আগেই তার উল্লেখ করেছি। সে দুটির প্রথমটি তার চরিত্রের অতুলনীয় অবিচলিত সংযম, অপরটি গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি। কাব্যের সূচনাতেই তার সংযমের অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে গৌরীর প্রলোভন জয় করায়। একবার নয়, বারবার সে গৌরীর চক্রান্ত ব্যর্থ করেছে। কিন্তু এই সংযমের পরিচয় আমাদের মনকে খুব দোলা দেয় না, কারণ বর্ণনার মধ্যে একটা নিষ্প্রাণতা ও কৃত্রিমতা রয়েছে। এতদূর পর্যন্ত গোরক্ষ-চরিত্র অশরীরী ছায়ার মত। এর পর থেকে তার মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করি। যখন শিবের কাছে বর পেয়ে গন্ধর্ব-রাজকন্যা তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে চাইলেন, তখন

"গোর্খে বলে গুরুবাক্য পালিবারে চাই।
শিবের বচনে কন্যা বরিল জামাই॥"

গুরুভক্ত গোরক্ষনাথ গুরুবাক্য লঙ্ঘন করতে পারেন না। সেইজন্য আজন্ম ব্রহ্মচারী হয়েও তিনি পত্নীগ্রহণ করলেন।

তারপর আবার আর এক পর্ব তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। গৌরীর প্রলোভন জয় করার মধ্যে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য স্ফূর্ত হয় নি, কিন্তু নিভৃত গৃহে রাত্রিকালে তাঁর স্ত্রীর প্রলোভন অতিক্রম করার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম সুর, করুণ মর্মস্পর্শী ভাব ফুটে উঠেছে, যা আমাদের মনের নিভৃত অন্তর্লোকে রেখাপাত করে। স্ত্রীর অনুনয়-বিনয়, আবেদন-নিবেদন, ক্রন্দন-ভীতিপ্রদর্শনের উত্তরে গোরক্ষনাথ বললেন,

"তোমারে ভাণ্ডিল হরে কপট করিয়া।
কহিব সকল কথা না করিব মায়া॥
স্ত্রীপুরুষ নহি আহ্মি নাহি বীর্য্য বল।
শুখনা কাষ্ঠের মত শরীর সকল॥
গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দারের ফুল।
শরীরেতে রস নাই কাষ্ঠ সমতুল॥"

গোরক্ষনাথের এই উক্তির মধ্যে একটি অন্তর্গূঢ় মর্মস্পর্শিতা অনুভব করা যায়। একদিকে ব্রতের অনুরোধে তাঁর স্বাভাবিক জৈবধর্ম পালনে অস্বীকার, অসীম সৌন্দর্য ও দৃপ্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি হয়েও স্ত্রীর কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে নিজেকে অকুণ্ঠচিত্তে নির্বীর্য নপুংসক বলে ঘোষণা, অপরদিকে তাঁর স্ত্রীর আশাভঙ্গ, এ সমস্ত মিলে একটি অপূর্ব করুণরসমধুর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে কবি নিজের অজ্ঞাতসারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

তারপর অলৌকিক উপায়ে স্ত্রীর পুত্রকামনা চরিতার্থ করে তাঁর কাছ থেকে গোরক্ষনাথ বিদায় নিলেন। এর পরে কানফার সঙ্গে দেখা হল। দুজনেই অত্যন্ত উত্তপ্তভাবে কথা বললেন। কানফার কাছে নিজের গুরু মীননাথের সংবাদ পাবার পর কানফাকে তাঁর গুরুর খবর দিয়ে গোরক্ষনাথ গুরুর আসন্ন মৃত্যু রোধ করবার জন্যে যমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে মীননাথের উপর নজর দেওয়ার জন্য যমকে ভৎর্সনা করে

"হুঙ্কার করিয়া গোর্খ কামে (কাজে) কৈল মন।
টলমল কাপে যত যমের ভুবন ॥
গোর্খের দেখিয়া ক্রোধ যম কাঁপে ডরে।
যতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে ॥
একে একে যত বহি চাএ বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লিখা নেয়ন্ত উধারিয়া ॥"

তারপর শূন্যপথে তিনি কদলীরাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন।

মাঝের অংশটিতে অতিপ্রাকৃত ঘটনার চাপে গোরক্ষনাথ চরিত্রের বিশেষ বিকাশ হয়নি। কদলী-রাজ্যে প্রবেশের পর থেকে গোরক্ষ-চরিত্র আবার জীবন্ত, স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই রাজ্যে প্রবেশ করে গোরক্ষনাথ নানা দৃশ্য দেখে শেষকালে একটি বকুল গাছের তলায় বসে ভাবতে লাগলেন কেমন করে মীননাথের প্রাসাদে, কদলীরাজের প্রাসাদে, প্রবেশ করবেন। এমন সময় একজন রমণী সেখানে এসে গোরক্ষনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করল। গোরক্ষনাথ প্রথমে তাকে মিষ্ট কথায় বরপ্রদান করে ভোলাবার চেষ্টা করলেন, সে চেষ্টা বিফল হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুর কথা বলতে হল। তারপর তিনি মীননাথের প্রাসাদে প্রবেশের উপায় দেখতে লাগলেন। প্রথমে যোগীবেশে মীননাথের প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় গোরক্ষনাথ নর্তকী সেজে প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করলেন, কিন্তু এবারেও মীননাথের রাণীরা তাঁকে প্রচণ্ড বাধা দিল। সে বাধা তিনি অনেক কৌশলে জয় করলেন। মীননাথ এই সুন্দরী নর্তকীকে তাঁর রাজসভাতে আহ্বান করলেন।

রাজসভার দৃশ্যটিতে আবার গোরক্ষনাথ-চরিত্র বিদ্যুদ্দীপ্তিতে ঝলকে উঠেছে। এই সংযমী আজন্ম ব্রহ্মচারী পুরুষের নর্তকী সেজে এক দুর্নীতিপূর্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করা এবং নাচতে নাচতে কথা না বলে শুধুমাত্র মাদলের সঙ্কেতে তত্ত্বোপদেশ দেওয়া—তাও আবার আর কাকেও নয়, আপনার আত্মবিস্মৃত নীতিপথভ্রষ্ট গুরুকে, কাব্যোপযোগিতার দিক দিয়ে এই পরিবেশটির তুলনা নেই। 'গোরক্ষবিজয়'কারও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। উপযুক্ত ভাষার ঝঙ্কারে, চিত্রের বর্ণবৈচিত্র্যে এবং সুনিপুণ ভাব সঞ্চারণে তিনি এই দৃশ্যটির মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এর আগের কোন কোন অংশের মত এখানে তাঁর লেখনী বিপথে চলেনি, যদিও বিপথগামী মীননাথ এই দৃশ্যের অন্যতম মুখ্য চরিত্র। তত্ত্বের দিক থেকে যেমন, রসের দিক থেকেও তেমনি সমগ্র রচনার মধ্যে এই অংশেরই সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ।

"ঢিম ঢিম করিয়া মাদলে দিল সান।
কর্ণপথে যেন মত আবৃত হইল প্রাণ ॥
তাহার পশ্চাতে বাম মাদলে দিল ধাত।
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ ॥

শুধু 'সর্বপুরী'ই নয়, সেই সঙ্গে আমরাও মুগ্ধ হই।

নাচতে নাচতে মাদলের তালে তিনি গুরুকে উপদেশ দিতে থাকেন,

"নাচন্তি যে গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর।
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর ॥"

সুন্দরী যুবতী নর্তকী দেখে কামুক মীননাথ নিজের উগ্র লালসা ব্যক্ত করলে গোরক্ষনাথ প্রথমে নিজেকে গোরক্ষনাথের স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন। তখন মীননাথ লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করলেন "গোরক্ষ কোথায়?" গোরক্ষনাথ তখন নিজের পরিচয় দিলেন।

এরপর সুরু হল তাঁর গুরুকে বোঝানোর পালা। প্রথমে তিনি জ্ঞান হারানোর জন্য গুরুকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করে গুরুর সামনে তাঁর সাংঘাতিক পরিণামের ভয়াবহ ছবি তুলে ধরলেন। তারপর গুরুকে তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। কিন্তু মীননাথ অভ্যস্ত আরামের মোহ ছেড়ে কায়াসাধনের দুর্গম নিরানন্দ পথে চলতে কিছুতেই রাজী নন। গোরক্ষনাথের অসীম অধ্যবসায়ও কিছুতেই নিঃশেষ হবার নয়। বারবার গুরুর কৃতকর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে, বারবার এর ফলাফল সম্বন্ধে গুরুকে অবহিত করে, বারবার তত্ত্ব উপদেশ দিয়েও কোন ফল না হওয়াতে তিনি যা মুখে এল তাই বলে গুরুকে তিরস্কার করতে লাগলেন। ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে গুরুকে তিনি এমন কথাও বললেন,

"বোঝাইলে না বোঝ তুমি পশুর লক্ষণ।
অমৃত ছাড়িয়া কর গরল ভক্ষণ ॥"

গুরুর প্রতি এইরকম রূঢ় উক্তি সাধারণতঃ গর্হিত হলেও এই সময়ে এই উক্তি সঙ্গত হয়েছে। মূঢ় মীননাথের চৈতন্য মধুর ভাষণ দ্বারা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব বুঝে গোরক্ষনাথ ভৎর্সনা ও ধিক্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনের অবস্থাটিও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু এত ভৎর্সনাতেও মীননাথের জ্ঞান হল না। 'বিধির ঘটন কেবা খণ্ডাইতে পারে' বলে তিনি গোরক্ষনাথকে বিদায় করার চেষ্টা করলেন। তখন আবার সুর হল গোরক্ষের ধৈর্যের পরীক্ষা। তিনি আবার গুরুকে বোঝাতে লাগলেন-কখনও সাধারণ ভাষায়, কখনও সন্ধা ভাষায়, কখনও আদেশের ভঙ্গীতে, কখনও অনুনয়ের সুরে।

"খেনেকে বালক হএ খেনে বৃদ্ধ নাথ।
খেনেকে যুবক হএ মীনের সাক্ষাৎ ॥
হাতের মারিয়া তালি গুরুকে বোঝায়।
বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছায় ॥"

শেষ ছত্রের এই চমৎকার উপমাটি—"বনপক্ষিগণ যেন না ছাড়ে বাছায়"—এর মধ্যে দিয়ে গোরক্ষনাথের একাগ্র অধ্যবসায় এবং গুরুর প্রতি সুনিবিড় মমতা দুইই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

এই দৃশ্যটিতে বাদপ্রতিবাদ, মেজাজের ওঠানামা এবং আশা-নিরাশার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গোরক্ষনাথ-চরিত্র জীবনের দীপ্তিতে মণ্ডিত হয়েছে। পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘাতের মধ্য দিয়েই কাব্যের চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা এই গুরু-শিষ্য-সংবাদের দৃশ্যটিতে সংঘাতের মাত্রা প্রায় শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন বলে নায়ক গোরক্ষনাথ স্বাভাবিক মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছেন, তত্ত্বকথার বাহন মাত্রে পর্যবসিত হননি।

গোরক্ষনাথের অনেক পরিশ্রমের পরে মীননাথের মতি-পরিবর্তন হল। কিন্তু মহিষীদের কাতর অনুনয়ে বিচলিত হয়ে আবার তিনি 'পিছিয়ে গেলেন। তখন গোরক্ষনাথ গুরুকে আর এক প্রস্থ ভর্ৎসনা করে শেষ পর্যন্ত অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করে তাঁকে জয় করলেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সত্যিই বলেছেন, "মীননাথ মীনের মতই পঙ্কে ডুবিলেন, গোরক্ষনাথ সেই পঙ্ক হইতে গুরুকে উদ্ধার করিয়া গুরু-রক্ষক হইলেন। এত বড় গুরু-দক্ষিণা আজ পর্যন্ত কোন শিষ্য গুরুকে দেয় নাই।"

গোরক্ষনাথের চরিত্রে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্ণিত ধীরোদাত্ত নায়কের অনেকগুলি গুণই বর্তমান। সংযম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, তিতিক্ষা, ভক্তি, স্নেহ—সমস্তই তার আচরণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতি অনুসারে বিচার করলে গোরক্ষনাথের চরিত্র আদর্শবাদ-প্রভাবিত বলতে হয় কিন্তু আদর্শবাদপ্রভাবিত চরিত্রও যদি অন্তরের অনুভূতির সূক্ষ্ম রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তবে তা খাঁটী কাব্যের চরিত্র বলে গণ্য হতে পারে। গোরক্ষনাথের চরিত্রে যে এই বৈশিষ্ট্য আছে, তা আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন হয়েছে। সুতরাং প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য, প্রাচীন বা আধুনিক যে কোন আদর্শেই বিচার করা যাক না কেন, গোরক্ষনাথের চরিত্র যে সার্থক এবং কাব্যোচিত হয়েছে তা প্রমাণিত হয়।

গোরক্ষনাথের পরেই মীননাথের চরিত্র অঙ্কনে লেখকের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোরক্ষের পাশে মীননাথও সুপরিস্ফিন্ন, উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। গোরক্ষনাথ এই আখ্যায়িকার নায়ক, সারা আখ্যায়িকা জুড়ে তিনি বিরাজ করছেন, সমস্ত আখ্যায়িকা ধরেই তাঁর চরিত্রের বিকাশ হয়েছে। কিন্তু মীননাথ চরিত্র একটিমাত্র দৃশ্যে—রাজসভার দৃশ্যটিতে যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাতে রচয়িতার সৃষ্টিকুশলতার অপূর্ব পরিচয় ফুটে উঠেছে।

নীচ সংসর্গে পড়ে মীননাথ এমনই নেমে গেছেন যে তাঁর অন্য সমস্ত প্রকৃতিই লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, আছে শুধু দুর্নিবার লালসা। তাই তিনি নর্তকীবেশী গোরক্ষনাথের কাছে অকপটে তাঁর লালসা ব্যক্ত করলেন, কোন দ্বিধা বা চক্ষুলজ্জাই আর তাঁর নেই। কিন্তু গোরক্ষনাথ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে মাদলের তালে তাঁকে 'গুরু' বলে সম্বোধন করলেন। যুবতী নর্তকীর 'গুরু' সম্বোধন কামুক মীননাথের কানে বিষবর্ষণ করল। তিনি ভাবলেন, নর্তকী তাঁকে বৃদ্ধ মনে করে আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক, তাই গুরু বলে অব্যাহতি পেতে চাইছে। এই চিন্তা তাঁকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুলল। কাম ও ক্রোধ দুই রিপুই প্রচণ্ডভাবে উদ্রিক্ত হয়ে ওঠায় তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,

"বুড়া দেখি তুমি মোরে যাইতে চাহ ছলি।
বারে বারে ভক্তি কর গুরু হেন বলি॥
বুড়া নও আমি তরুণা কিসে লাগে।
শতেক তরুণা আনি দেয় মোর আগে॥
দেখিবা বুড়ার বল ধরি যদি বলে।
মীনের পুরীতে আসি যাইতে চায় ছলে॥

কাঞ্চলি ফাড়িমু তোর খসামু কবরী।
আমার ঘরেতে আসি যাইতে চায় ফিরি ॥"

এই অংশটি পড়বামাত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক বিগতযৌবন দোর্দণ্ডপ্রতাপ লম্পটের চরিত্র—বার্ধক্যের চিহ্ন যার আকৃতি ও কথায় সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, অথচ লেলিহান লালসার কণামাত্রও যায়নি। মীননাথের প্রচণ্ড হুঙ্কার যেন নিজের কানে শুনছি, তার বিরল দন্তের ফাঁকে ফাঁকে উচ্চারিত কথাগুলি যেন অবিকল ভঙ্গীতেই কানের ভিতর আসছে বলে মনে হয়। চরিত্রটির মধ্যে সার্বভৌমিকতা আছে, বর্তমান যুগেও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঠিক এই শ্রেণীর চরিত্র একেবারে বিরল নয়।

তারপর, ক্রমে ক্রমে নর্তকীর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে মীননাথের দুই রিপুই শান্ত হল। তখন এল অনুশোচনার পালা। কিন্তু শুধু দুঃখপ্রকাশ করলেই শিষ্য অব্যাহতি দেয় না, কায়াসাধন যোগ অভ্যাস করতে বলে। মীননাথ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন, তাতে তাঁর পক্ষে এর চাইতে অবাঞ্ছিত, এর চাইতে কষ্টকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। কাতর হয়ে তিনি গোরক্ষনাথকে বললেন,

"শোন শোন যতিনাথ তোমারে যে কই ॥
চলিতে না পারি আহ্মি গায়ে নাই বল।
কেমতে সাধিব মুই সে যোগ সকল ॥
মাগিতে না পারিমু আর ঘরে যাই।
কদলীর রাজা আমি ঈশ্বর মীনাই ॥

আরাম ও বিলাসিতা যার মজ্জায় মজ্জায় জড়িত হয়ে গেছে, কঠোর যোগ অভ্যাস, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ানো প্রভৃতি নিতান্ত ক্লেশকর কাজের কথায় সে যে এমনি দুচোখে বিভীষিকা দেখবে, এ তো পরম স্বাভাবিক। একটু আগেই নর্তকী 'বুড়ো' ভাবছে মনে করে যিনি ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন, তিনিই এখন শিষ্যের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের বার্ধক্য স্বীকার করে বলছেন,

"বৃদ্ধকাল হইল মোর চলিতে নাই দিন।
মাগিবারে গেলে লোকে বাসিবেক ঘিন ॥
পাকিল মাথার কেশ ঢলিলেক বস।
এমত সময় কালে কিসের সাহস ॥"

মীননাথের এই অসহায় অবস্থা, তার চলচ্চিত্ততা, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই দুরকম পরস্পরবিরোধী উক্তি, সমস্তই অবিমিশ্র কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে। এই চরিত্রটি অঙ্কনে লেখক বাস্তবতার মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করে নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম তুলির টান দিয়েছেন। ফলে চরিত্রটি রসসাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরে অক্ষয় স্থান পাবার অধিকারী হয়েছে।

'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে দুটি পুরুষ চরিত্রই প্রধান। এই দুই চরিত্র অঙ্কনেই লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন দেখা গেল। এইবার নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। নারীচরিত্রগুলির মধ্যে গৌরীর চরিত্র বেশ উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "গোর্খনাথ-মীননাথের

কাহিনীতে শিব হইতে পার্বতীর চরিত্রটি অধিকতর সুপরিস্ফুট হইয়াছে। একান্ত স্বাভাবিক নারীমন লইয়া তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, কোনও পুরুষ কামভাব শূন্য হইতে পারে।... পুরুষের শক্তিমাত্র তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন ; নিজের শিষ্য-সম্পর্কিত ভোলানাথ স্বামীর বিশ্বাস তিনি টলাইতে চাহেন। এই ক্রূর কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই তিনি চারিজন সাধকের জীবনে সর্বনাশ করিলেন। গোর্খনাথের নিকট তাঁহার এই শক্তি বাধা প্রাপ্ত হইল বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, এই ঈর্ষ্যাক্ষিপ্ত মন লইয়া তিনি নারীজীবনের চরম লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াও গোর্খনাথকে এক জঘন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন, গোর্খনাথও এই পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন ; কিন্তু তিনি নিজে যে নৈতিক স্তরে নামিয়া গেলেন, তাহা হইতে তাঁহার আর উদ্ধার পাইবার কোন উপায় রহিল না। গীতিকার কবিগণ দেবদেবীর প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধাবোধ করিতেন না ; কারণ তাঁহাদের কোন পরিচয় তাঁহাদের জানা ছিল না, বরং তাঁহাদের পরিবর্তে পার্থিব নরনারীই তাঁহারা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের মহিমাই সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন—সেইজন্য গীতিকায় দেব-চরিত্র অপেক্ষা মানবচরিত্রই অধিকতর মহিমামণ্ডিত হইয়াছে।"[১] 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের আরও দুটি নারীচরিত্রে স্বাভাবিকতার আভাস পাওয়া যায়। এবার তাদেরই উল্লেখ করব।

কদলীরাজ্যে গোরক্ষনাথের প্রথম প্রবেশের সময় যে অজ্ঞাতনাম্নী নারী গোরক্ষনাথকে প্রেম নিবেদন করেছিল, এই প্রসঙ্গে তারই কথা প্রথমে মনে আসে। এই মেয়েটির কাঁখে কলসী ছিল—এটি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমিকাদের আদর্শে কবি পরিকল্পনা করেছেন কিনা জানিনা।

গোরক্ষনাথের রূপে মুগ্ধ হয়ে এই নারী মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে ভালবেসে ফেলল। তিনি মীননাথের পুরীতে প্রবেশ করতে চান শুনে সে এরকম চেষ্টা করতে নিষেধ করল। এই অসমসাহসিক কাজ করলে কি সাংঘাতিক ফল হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সে বলল,

"আমি তোমা কহি দড় আমার বচন ধর
চল যোগী আমার যে বাড়ী।
এথাতে থাকিয়া যবে কোন জনে দেখে তবে
ঝুলি কাথা সব নিব কাড়ি॥
আঞ্চলে ঢাকিয়া লিমু মণ্ডবেতে বাস দিমু
খাবরী ভরিয়া দিমু ভাত।
নিতি নিরামিষ্য খাই ব্রাহ্মনী যোগিনী হই
চল যোগী আমার বাসাত॥"

শেষ ছত্রটিতে চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। এই নারী এক অপরিচিত যোগীর প্রেমে বিহ্বল হয়ে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হতে বসেছে। সে কোন্ জাতের লোক না জেনেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছে, তবুও তার নিজের জাত্যভিমান বিচলিত হয়নি। শরৎচন্দ্রের টগর বামনীর কথা এখানে স্বতঃই মনে পড়ে।

১ বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৫৭-৫৮

এই স্ত্রীলোকটি বারবার গোরক্ষকে আশ্বাস দিতে লাগল,

"যোগীর বাড়িত যোগী যাইবা অন্নজল স্থিতি পাইবা
কার কিছু না হইব ভয়ে।"

শুধু এতেই সে ক্ষান্ত নয়, সুখের এক পরম লোভনীয় চিত্র সে গোরক্ষনাথের সামনে তুলে ধরল,

"আহ্মারে কাটিমু সুতি তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি।
দিনে দিনে বেশ হইব সমপতি বাড়িয়া যাইব
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি॥"

কেবল সুখ নয়, তার সঙ্গে সম্মানও আছে,

"যখনে সমাজে যাইবা মৈত্ত ঘটি মান্য পাইবা
কথা কৈবা দুই হাত নাড়ি।
নয়ানে নয়ানে চাএ ঠার দিয়া কথা কএ
চল যোগী আমার যে বাড়ী॥

গোরক্ষনাথের প্রতি এই নারীর প্রেম সম্পূর্ণ আন্তরিক, ছলনাবর্জিত। সে গোরক্ষনাথের অনিষ্ট সাধন করবার জন্য তাঁকে প্রলোভিত করেনি। বরং তাঁকে মীননাথের প্রাসাদে প্রবেশের উপায় বলে দিয়ে তাঁর উপকারই করেছে। যে সব কথা বলে সে গোরক্ষনাথকে প্ররোচিত করেছে, তার মধ্য দিয়ে তার নিরতিশয় সরলতা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। এক সরলা গ্রাম্য নারীর মন এবং প্রেমকে কবি যে রকম স্বাভাবিকভাবে প্রতিবিম্বিত করেছেন, তা 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যে একটি অভিনব সুষমা আরোপ করেছে। কদলীরাজ্যে যে কেবল মায়াবিনীরাই বাস করত না, এই নারী তাই প্রমাণ করেছে।

এই কাব্যখানিতে আর যে নারীচরিত্রটির মধ্যে সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতার ছাপ আছে, সে হচ্ছে মীননাথের অন্যতম পাটরানী মঙ্গলা। কবি যদিও কুহকিনী রাক্ষসী বলে তার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তার মুখে যে উক্তি তিনি আরোপ করেছেন, তা একেবারে সাধারণ বাঙালী সংসারের গৃহিনীর মুখের কথা। মীননাথ যখন শেষ পর্যন্ত কদলীর রাজপাট ছেড়ে শিষ্যের সঙ্গে গিয়ে যোগ-অভ্যাস করতে মনস্থ করলেন, তখন মঙ্গলা তাঁকে কাতর মিনতি করে বলল,

"প্রভাত হইলে প্রভু তোমার লাগে ভুখ।
ক্ষুধায়ে না পাইলে অন্ন পাইবা বড় দুঃখ॥
নিতি নিতি খাও প্রভু পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
পঞ্চাশ অমৃত যোগাই তোহ্মার ভোজন॥
সুধা-অন্ন তাহাতে আহুনি কচুর শাগ।
স্বপ্নে হ রাজভোগ না পাইবা লাগ॥
যত কিছু লোক সব তোমার কুর্পর।

তোমার উপরে ধরে ধবল ছত্তর।
যোগী হইলে পিন্ধিবা গাছের বাকল॥
...
যোগী হইলে বিছান পাইবে কোন স্থান।
শয়নের লাগি প্রভু পাইবা অপমান॥
...
উত্তম পরিধান বস্ত্র শরীর ছুখাএ।
খাঁতার উলসে (কাঁথার ছারপোকা) তোমার খাইব সর্ব্ব গাএ॥"

বহুনিন্দিতা মঙ্গলার এই কথাগুলি আমাদের নিত্য পরিচিত সেইসব বাঙালী স্ত্রীকেই মনে করিয়ে দেয়, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যাদের সদাজাগ্রত দৃষ্টি, স্বামী প্রবাসে যাত্রা করলে তাঁর কষ্ট হবার সম্ভাবনায় যাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মঙ্গলা গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকার অদুনা-পদুনার নিকট আত্মীয়। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহনের সময় অদুনা-পদুনাও ঠিক এইভাবে অনুনয় করে তাঁকে সন্ন্যাসে যেতে নিষেধ করেছে।

গোরক্ষবিজয়-রচয়িতা নারীবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও নারীচরিত্র সৃষ্টিতে আংশিক সাফল্য লাভ করেছেন, এর পিছনে একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। যদিও এই কবি নাথধর্মের শিক্ষার ফলে নারীকে ঘৃণা করতে এবং জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করতে শিখেছিলেন, তবুও তাঁর অন্তরের সহজাত কবিধর্ম তাঁকে আবার জীবনের রূপরসমাধুরীর দিকেই আকৃষ্ট করেছে। এইজন্য সাংসারিক জীবনকে হেয় করতে গিয়েও তিনি স্থানে স্থানে সাংসারিক জীবনের আলেখ্য অত্যন্ত মধুর করে এঁকেছেন। তাই দেখতে পাই বহুধিকৃত কদলী-রাজ্যের বর্ণনার মধ্যে এক জায়গায় তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন চমৎকার একটি শান্ত সুন্দর পল্লীচিত্র,

"উত্তম পুষ্কর্ণী দেখে সুনির্ম্মল জল।
হংস চক্রবাক তাতে পঙ্কজ উৎপল॥
চারি পাড়ে নানা তরু পরম সুন্দর।
আম কাঠোয়াল আর গুয়া নারিকল॥
তাল খাজুর আর নানাবর্ণ ফুল।
তাহার দক্ষিণ পাড়ে উত্তম বকুল॥
বকুলের তলে দেখে নির্ম্মল আছে স্থল।
আসন নামাইয়া বৈসে বকুলের তল॥"

কদলী রাজ্যের যে কলুষিত আবহাওয়ার কথা 'গোরক্ষবিজয়ের' মধ্যে বারবার প্রবলভাবে বলা হয়েছে, তার কণামাত্রও কি এই অংশটুকুতে পাওয়া যায়?

আসলে 'গোরক্ষবিজয়' রচনার সময় লেখকের মনে আগাগোড়া একটা দ্বৈধ চলেছিল। নাথ-পন্থীরা প্রবৃত্তিমার্গকে শুষ্ক করে ফেলেন বলে জীবনের সব কিছু ভোগের উপাদানই তাঁদের কাছে কুৎসিত,

বিষাক্ত, ঘৃণ্য। কিন্তু সত্যকার কবিচিত্ত কখনও পার্থিব জীবনের প্রতি বিমুখ হতে পারে না। আমাদের লেখক সজ্ঞানে নাথ আদর্শেরই পতাকা তুলে ধরেছেন। কিন্তু নিজ্ঞানে সর্বকালের কবিদের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি জীবনের পূজা করেছেন।

এইবার 'গোরক্ষবিজয়ে'র ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। এর ভাষা আবেগসংস্পর্শশূন্য শাণিত, সংক্ষিপ্ত সংযত ও অর্থগূঢ়। ছোট ছোট উক্তির মধ্যে দিয়ে কবি যে শব্দচিত্র সৃষ্টি করেছেন সোজা তা আমাদের মনের মধ্যে এসে আঘাত করে। এই আপাতশুষ্ক ভাষার মধ্য দিয়ে কাব্যরস সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অভ্রান্ত শিল্পবোধের ফলে 'গোরক্ষবিজয়'রচয়িতা এই কাজে সাফল্য লাভ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে এই রচনারীতি অবলম্বনে কবিতা লেখায় চরম সার্থকতা অর্জন করেছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সমগ্র বিশ্বে এই রচনারীতির শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রাউনিঙ। এই নিরাবেগ ভাষার মধ্য দিয়ে কাব্যরস কতখানি ঘনীভূত হয়েছে, তার নিদর্শন হিসাবে 'গোরক্ষবিজয়' থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,

"অজ্ঞান হইলা গুরু কৈলা কুকাম।
অনন্ত সিধাএ শুনি ঘোষিব কুনাম॥
জ্ঞান এড়ি পাইলা গুরু ভুল কদলীত
আগে মিঠা লাগে গুরু পরে লাগে তিত॥
কামেতে পীড়িত হইয়া সব হইল দোষ।
জীবন তরীতে এবে হইল কসাকস।
আখি হতে লোট গলে কর্ণ হতে পুঁজ।
মেরুদাড়া ভাঙ্গি গুরু নিকলিছে গুজ॥
হিয়া লড়থর মাথা বগুলার পাখি।
গলিত হইলা গুরু ঘোলবর্ণ আঁখি।
মাতইল খসিল গুরু ঘুণে খাইল পালা।
ভাঙ্গা ঘরখানি গুরু কত হইব ভালা॥"

এই আপাতকর্কশ ভাষা এবং সংক্ষিপ্ত সংযত বর্ণনার মধ্যে দিয়েও যে প্রসাদগুণ স্ফূর্ত হতে পারে, কাব্যের প্রায় সর্বত্র কবি তার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের কতকগুলি বর্ণনা কাঠিন্যের মধ্যে সরসতার অপূর্ব নিদর্শন। এই অংশগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, কবি বাইরে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেও তাঁর শাণিত ওষ্ঠাধরে একটি চাপা হাসি খেলছে। তা না হলে যেখানে তিনি কদলীর রাণী মঙ্গলার হাতে যোগীদের ভয়াবহ নির্যাতনের ছবি তুলে ধরেছেন, সেই অংশটি পড়ে আমরা মনের মধ্যে বিভীষিকার শিহরণ বোধ করার বদলে কৌতুক অনুভব করি কেন?

"মঙ্গলা কমলা দুই রাজ পাটেশ্বরী।
তাহার সেবক হএ ষোল শত নারী॥

বুড়া যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল।
গাভুর যোগী পাইলে তুলিয়া দেয় শাল॥
আধাবসের যোগী পাইলে কোমরে তুলি কাটে।
পোলা বস্থা পাইলে পাটাতে তুলি বাটে॥"

'গোরক্ষবিজয়' কারের প্রকৃত ব্যঙ্গশিল্পীর দৃষ্টি ছিল, তাই তিনি মানুষের চরমতম দুর্দশার বর্ণনাও করেছেন পরিহাসের ভঙ্গীতে।

'গোরক্ষবিজয়ে'র এই বাহুল্যবর্জিত বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অতিপল্লবিত উপমারূপকভারাক্রান্ত বর্ণনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর। একমাত্র চর্যাপদ ভিন্ন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্য কোথাও বর্ণনার ভাষা এমন সংক্ষিপ্ত ও অর্থগূঢ় নয়।

অবান্তর বর্ণনা এবং অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসের অভাব কাব্যটিকে স্বল্পায়তনবিশিষ্ট করে তাকে একটি ঘনপিনদ্ধ গঠনসৌষ্ঠব দান করেছে। 'গোর্খবিজয়ে'র শুষ্ক ভাষা এবং দৃঢ়বদ্ধ অবয়ব যেন কায়াসাধনেরই প্রতিচ্ছবি। কায়াসাধনে দেহকে যোগ-বলে অজর অমর করে রাখা হত, কিন্তু সেই দেহে মানবশরীরের অবান্তর অংশ, জলীয় পদার্থজনিত স্ফীতি নিশ্চয়ই থাকত না। 'গোরক্ষবিজয়ে'ও তা নেই, এইজন্যে এই কাব্য কায়াসিদ্ধ যোগীরই মত বাংলা সাহিত্যে এখনও বেঁচে আছে।

অলঙ্কার সম্পদে সমৃদ্ধি কাব্যের উৎকর্ষ লাভের একটি প্রধান উপাদান বলে গণ্য করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ"। কিন্তু এই অলঙ্কার যদি কাব্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা কাব্যের শোভাবৃদ্ধি না করে তার পক্ষে ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ অনেক সংস্কৃত কাব্য এবং আমাদের মঙ্গল কাব্যের কবিরা এই ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করেছেন। ফলে তাঁদের রচিত কাব্য শ্লথমন্থরগতি এবং কৃত্রিমতাদুষ্ট হয়ে পড়েছে। অলঙ্কার যেখানে কাব্যের প্রয়োজনে কোনরকম প্রযত্ন ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়, সেইখানেই তা কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধিত করে তোলে। 'গোরক্ষবিজয়ে' অলঙ্কার প্রয়োগের এই আদর্শ রক্ষিত হয়েছে। এই কাব্যে কবি কেবলমাত্র যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন এবং এই অনায়াসসিদ্ধ অলঙ্কারগুলি বৈশিষ্ট্যে ও মৌলিকতায় উপভোগ্য হয়েছে। উৎপ্রেক্ষাই 'গোরক্ষবিজয়ে'র প্রধান অলঙ্কার। এই উৎপ্রেক্ষাগুলির পরিকল্পনা ও প্রয়োগে অনেক জায়গায়ই অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কবি স্বল্প আয়তনের ভিতর গভীর ও ব্যাপক ইঙ্গিত দিয়েছেন।

"দেখিলাম মীননাথের বল শক্তি নাই
বগুলাটি ঝুরে যেন আহার ধেয়াই॥" ('বগুলা'র অর্থ বক)
অথবা "নাপিতের শিঙ্গাএ যেন চুমুকে আনে টানি।
ইন্দ্রনালে শোধ গুরু আচাভুয়া পানি॥"

প্রভৃতি উৎপেক্ষা কবির ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় বহন করছে।

২৩

উৎকৃষ্ট উপমা অলঙ্কারের দু একটি নিদর্শনও এর মধ্যে পাওয়া যায়। যথা,

"আমার বচন গুরু তোমার নাই মন।
অশথের গাছে যেমন কহিএ সর্পন ॥"
"চর্ম্ম দড়ি হইলা গুরু নাই চায় ভাবি।
নীহারের জল যেমন হরি নিল রবি ॥"
"মূর্খেরে অক্ষর দেখাইলে নাই ফল।
তেনমতে কহি আহ্মি তোমাতে নিষ্ফল ॥"

নিদর্শন অলঙ্কারের অনেকগুলি সুন্দর উদাহরণও গোরক্ষবিজয়ে পাই। নিম্নোদ্ধৃত অংশটি অসম্ভব-সম্বন্ধ নিদর্শনা অলঙ্কারের উদাহরণ,

"শিকড় কাটিলে বাএ উফারএ গাছ।
বিনি জলে কোথাতে প্রাণে জীয়ে মাছ ॥"

এক জায়গায় একটি দীর্ঘায়ত নিদর্শনা অলঙ্কারের উপভোগ্য উদাহরণ মেলে। সেই অংশটি আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি,

"বৈরীর হাতেতে তুমি সপিলা ভাণ্ডার।
শঠের হাতেতে তুমি সপিলা কাণ্ডার ॥
মৎস্যের প্রহরী তুমি রাখিয়াছ উদ।
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ ॥
বাটইর কুঠারে গুরু সপিয়াছ তরু।
ব্যাঘ্রের মুখে তেন সপিয়াছ গরু ॥
ডাকায়িতের হাতে যেন সপিয়াছ ধন।
সর্পের মুখেতে ভেক কৈলা সমর্পণ ॥
শূকরের মুখে তুমি দিয়া আছ গেজা।
মানকচু প্রহরী থুইয়া আছ সেজা ॥
ধান্য প্রসরি তুমি রাখিছ উন্দুর।
পাকনা কদলী দিলা শৃগাল প্রচুর ॥
সায়চান শকুনেত কৌতর সপিয়াছ।
আনলেতে সপিয়াছ শুখনা যে গাছ ॥"

এটি শব্দশক্তিমূলক বস্তুধ্বনিরও একটি সুন্দর উদাহরণ।

অবশ্য এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। উপরে উদ্ধৃত উদাহরণটির কিয়দংশ ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ভবানীদাসের লেখা গোপীচাঁদের পাঁচালীতেও মেলে। কিন্তু ভবানীদাসের বই গোরক্ষবিজয়ের পরে রচিত হয়েছিল বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। ভবানীদাসের রচনার যে ক'খানি পুঁথি আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তাদের সবগুলিই গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম পুঁথির তুলনায়

অর্বাচীন। ভবানীদাসের রচনার মধ্যে কবিত্বশক্তির পরিচয় এত অল্প যে তাঁকে উপরোক্ত অংশের লেখক বলে গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। আসলে এই অংশটি গোরক্ষবিজয় থেকেই ভবানীদাসের রচনায় গিয়ে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয়।

গোরক্ষবিজয়ের মধ্যে নাথ দর্শনের তত্ত্বকথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই তত্ত্ববর্ণনার অংশেই উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী। উপমাদি অলঙ্কারের সাহায্যে তত্ত্বকে বিবৃত করার প্রথা সেযুগে অত্যন্ত সুপ্রচলিত ছিল। গোরক্ষবিজয়ে সেই প্রথাই অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এই অলঙ্কারগুলি আর একটি উদ্দেশ্য সাধন করেছে। তত্ত্বকথার মধ্যে স্বভাবতই একটা নীরসতা থাকে। এর ফলে তত্ত্বাংশগুলির কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সুনির্বাচিত অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে গোরক্ষবিজয়ের তত্ত্বাংশে নীরসতা ও আড়ষ্টতা দোষ প্রবেশ করতে পারেনি।

তারপর, যে সমস্ত প্রতীকের মধ্য দিয়ে ধর্মতত্ত্ব পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে, সেগুলি উল্টো ধরণের। এতে যেমন "উল্টা সাধনে"র মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে সুন্দর বিরোধ অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়ে সাধারণ পাঠকদের মনোরঞ্জন করেছে। এর দু'একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন,

"পুকুরেতে জল নাই পাড় কেনে বোড়ে।"
"নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চালে।"
"উছ নীছ ভূমিখানি তাত কৃষি হএ।"

আমরা একটু আগে তত্ত্ববর্ণনায় সরসতা সৃষ্টিতে রচয়িতার সাফল্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছি। এখন তার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করছি। গোরক্ষবিজয়-রচয়িতার কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই কারণে যে তাঁর সামনে এক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল। একদিকে যেমন ধর্মের তত্ত্ব পরিস্ফুট করে তুলতে হবে, অপরদিকে তেমনি সাধারণ লোকে যাতে নিগূঢ় তত্ত্বগুলি বুঝতে না পারে তার জন্যে তাকে সাঙ্কেতিক ভাষার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করে রাখতে হবে, সেই সঙ্গে বর্ণনার মধ্যে সরসতা সৃষ্টি করতে হবে। অভ্রান্ত শিল্পবোধের ফলে লেখক এই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। নাথ ধর্মমতের রূপায়ণে তিনি অনেকখানি কলাকৌশল দেখিয়েছেন। যেমন, মীননাথের প্রতি গোরক্ষনাথের একটি অনুযোগের মধ্য দিয়ে তিনি সুকৌশলে নাথযোগীর বেশভূষার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। গোরক্ষনাথ মীননাথকে বলেছেন,

মেখলি এড়িয়া তুমি পাইলা সুন্দরী।
আদারি এড়িয়া পাইলা উআরি মেহারি॥
চাপড়া এড়িয়া পাইলে এ খাট বিছান।
চক্র এড়িয়া পাইলা এ তিন কামান॥
সোনার পাইলা খড়্গ ভাঙ্গা লাঠি এড়ি।
রত্নের কুণ্ডল পাইলা তেজি শঙ্খ কড়ি॥

ফাড়া পাতা এড়ি পাইলা সুবর্ণের থালা।
রত্নমালা পাইয়া গুরু রুদ্রাক্ষ ত্যজিলা ॥"

মেখলি বা কটিসূত্র, আদারি বা কাঁথা, চাপড়া বা চর্মখণ্ড, চক্র, ভাঙা লাঠি, শঙ্খ, কড়ি, ছেঁড়া পাতা, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি যোগীর নিত্যব্যবহার্য জিনিস ছিল, তা আমরা উদ্ধৃত অংশ থেকে জানতে পারি, কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে তথ্যবিবৃতির নীরসতা নেই।

এ তো গেল ধর্মের বহিরঙ্গ বিষয়ের কথা। গভীর তত্ত্বের বর্ণনাতেও রচয়িতা শিল্পকৌশল দেখিয়েছেন। গূঢ় তত্ত্বগুলি প্রায় সবই সন্ধা ভাষাতে বর্ণিত হয়েছে। সন্ধা ভাষা রচনার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হলে তা রচনার সার্থকতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। যদিও সন্ধা ভাষা ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য তত্ত্বকে আবৃত করে রাখা, রচনার কাব্যোৎকর্ষ সম্পাদন করা নয়, তবুও কোন রচনার অংশবিশেষ সুনির্বাচিত শব্দপূর্ণ সন্ধা ভাষায় রচিত হলে তার আকর্ষণীয়তা অনেক বৃদ্ধি পায়। চমৎকারিত্ব, রহস্যময়তা, বাচ্যার্থের অন্তরালে ব্যঙ্গার্থের দ্যোতনা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রধান ধর্মসমূহের অন্যতম। সন্ধা ভাষার মধ্যে এই সমস্ত গুণ আছে বলে যে রচনায় সন্ধা ভাষা যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, তার মধ্যেও এই গুণগুলি প্রবেশ করে।

গোরক্ষবিজয়ের মধ্যে সন্ধা ভাষায় রচিত যে অংশগুলি রয়েছে, তারা এই আখ্যায়িকার রমণীয়তা বাড়িয়ে তুলেছে। গুরুর প্রতি গোরক্ষনাথের উক্তি থেকে আমরা এইরকম একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

"গুরু চারি চন্দ্র হয়ে শরীর ব্যাপিয়া রয়ে
তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ।
আদি চন্দ্র নিজ চন্দ্র উনমত্ত গরল চন্দ্র
এই চারি শরীর ব্যাপন ॥
আদি চন্দ্র করি স্থিত নিজ চন্দ্র সহিত
উনমত্ত করিয়া সন্ধান।
তিন চন্দ্র সম্বরিয়া আপনাকে ভার দিয়া
গরল চন্দ্র সব করে পান ॥
চারি চন্দ্র সম্বরিয়া ভবসিন্ধু তর গিয়া
তবে সে সকল রক্ষা পায়ে।
হেন কর্ম না করিলা সব তুমি বিস্মরিলা
কহ গুরু কেমত উপায়ে ॥"

উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে একটি অজ্ঞাত রহস্য, অস্ফুট ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হয়েছে। এইগুলি সার্থক কাব্যের প্রধান উপাদান। অতএব সন্ধা ভাষা গোরক্ষবিজয়ের কাব্যগুণ স্ফূর্তির সহায়ক হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মীননাথের প্রতি গোরক্ষনাথের উপদেশের শেষের দিকে সন্ধা ভাষার নিগূঢ় সাঙ্কেতিকতা, অর্ধস্ফুট কুহেলীভরা ভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হয়েছে। এই অংশটিতে যে সমস্ত প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে, তারা সমষ্টিগতভাবে এমন একটা রহস্যঘন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যে আমরা কিছু বুঝি বা না বুঝি, আমাদের মনে একটা অস্পষ্ট থম্‌থমে ভাবের সৃষ্টি হয়। এর কিছু উদাহরণ দিচ্ছি,

"ঝিম যাউক বরিষা তলে যাউক মীন।
ঝাপিয়া পড়িতে পারি সমুদ্র গহিন॥
...
প্রথম প্রহর রাত্রি গুরু আলসিত বড।
যাহার কারণে নিদ্রা হইয়া যায় দড॥
...
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কালনিদ্রা ঘোর।
উজানে রসের মাপি রোজ নিরন্তর॥
...
তৃতীয় প্রহর রাত্রি অতি নিদ্রা ঘোর।
তখনে বুঝিতে পারে জ্ঞানের প্রসর॥
...
চতুর্থ প্রহর রাত্রি নিশি অবশেষ।
কর্ম্ম চিন্ত গুরু জাগ হইয়া বিশেষ॥
...
নিবিত না দিয় বাত্তি জাল ঘনঘন।
অছকা ছাপাইয়া রাখ অমূল্য রতন॥

আমরা প্রবন্ধের সূচনাতেই বলেছি, প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে চর্যাপদের সঙ্গে গোরক্ষবিজয়ের সাধর্ম্য রয়েছে। 'গোরক্ষবিজয়ে'র এই সন্ধাভাষায় রচিত অংশগুলি চর্যাপদের সঙ্গে একটি সুনিবিড় যোগসূত্রের নিদর্শন বহন করছে। দার্শনিক পটভূমিকার দিক দিয়েও চর্যাপদের সঙ্গে গোরক্ষবিজয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, নাথদর্শনে বৌদ্ধ সহজিয়াদের দর্শন খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে।

ভাষার দিক দিয়ে যেমন, ছন্দের দিক দিয়েও তেমনি 'গোরক্ষবিজয়'কার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'গোরক্ষবিজয়'-রচয়িতার অভ্রান্ত ছন্দোবোধ অধিকাংশ স্থানেই ভাব ও ছন্দের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। রাজসভায় নর্ত্তকীবেশী গোরক্ষনাথের নৃত্য বর্ণনার সময় ছন্দ এতখানি নিখুঁত হয়েছে যে পড়বার সময় সমস্ত চিত্রটি যেন আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

"লঙ্গ মহালঙ্গ ছুই দুতে বাহে তাল।
ঝমকে ঝমকে শব্দ উঠে অতি ভাল॥

নাচন্ত যে গোর্খনাথ তালে করি ভর।
শূন্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব নর॥
নাচন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে॥

নিপুণ শিল্পীর হাতে পড়লে পয়ার ছন্দও যে কতখানি সুষ্ঠু ও ভাবপ্রকাশক্ষম হয়ে উঠতে পারে, উদ্ধৃত অংশটি থেকে তা প্রমাণিত হচ্ছে। এই অংশটি পড়লে আমাদের মনে হয় নৃত্যরত নারীবেশী গোরক্ষনাথের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর মাদলের ধ্বনি আমাদের কানে আসছে। ছন্দের সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে বিচার করলে অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের তুলনায় 'গোরক্ষবিজয়ে'র সাহিত্য-আসরে পাংক্তেয় হবার দাবী অনেক বেশী প্রতিপন্ন হয়।

এবারে কাব্যের অন্যান্য দিকগুলি সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলব।

এই কাব্যে এমন অনেক ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে, যা আধুনিক যুগের শিক্ষিত পাঠকের মার্জিত রুচিকে আঘাত করে, যেমন দেবী গৌরীর লজ্জার সর্বশেষ সীমা অতিক্রম করে গোরক্ষনাথকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস, মাছি হয়ে তাঁর গোরক্ষের উদরে প্রবেশ ও মার্গপথে নির্গম লাভ এবং গোরক্ষের কৌপীন ধোয়া জল পানে তাঁর প্রত্যাখ্যাতা স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার। একদিকে নারীর ছলনার স্বরূপ উদঘাটন অপরদিকে সংযম ও ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের জন্য রচয়িতা এই দৃষ্টান্তগুলি নগ্ন ভাবে প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ভাষায় তিনি আশ্চর্য আশ্চর্য সংযম রক্ষা করেছেন, কোথাও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেননি। এমন কি গৌরীও কদলী-নারীদের ছলনা বর্ণনার সময় যেখানে তাঁর পদস্খলনের পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, সেখানেও তিনি সংযমের আদর্শ থেকে একটুও বিচলিত হননি। তাঁর ভাষা সর্বত্রই শোভন ও মার্জিত। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবিই ভব্যতার আদর্শে 'গোরক্ষবিজয়' কারের অনেক পিছনে পড়ে আছেন।

মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত কাব্যেই অলৌকিক ঘটনার আতিশয্য। ধর্মমূলক কাব্যগুলির তো কথাই নেই, মুষ্টিমেয় যে কখানি ধর্ম-অসম্পৃক্ত রচনার নিদর্শন মেলে, তাদের মধ্যেও অতিপ্রাকৃত উপাদান অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। 'গোরক্ষবিজয়ে'ও উদ্ভট অনৈসর্গিক ঘটনা কাব্যের একটি বিশিষ্ট অংশ অধিকার করে আছে। কিন্তু কবির সংক্ষিপ্ত সংযত বর্ণনার রীতি অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিন্যাসের মধ্যেও একটি শিল্পোচিত শোভনতা রক্ষা করেছে। অনেক মঙ্গলকাব্যের মত 'গোরক্ষবিজয়ে' স্থূল অলৌকিক ঘটনার ভারে সাহিত্যের শ্বাস রুদ্ধ হয়নি।

জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও গভীর সংযোগ সার্থক সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান। সাহিত্য বিরাট বনস্পতির মত ভাবের ঊর্ধ্বগগনে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে, কল্পনার বিচিত্র নয়নাভিরাম ফুলে ফুলে হয় সুসজ্জিত। কিন্তু তার মূল প্রোথিত থাকে জীবনেরই মধ্যে। জীবনের অন্তস্তল থেকে প্রাণরস আকর্ষণ করেই সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করে। জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক রচনার মধ্যে যতই লালিত্য সঞ্চারের চেষ্টা করা হোক্ না কেন, তা প্রাণহীন পুতুলের মত, সাহিত্য-আত্মার অধিষ্ঠান তাতে হয় না। সমসাময়িক জীবন প্রবাহের প্রতিচ্ছবি বুকে ধারণ করে সাহিত্য প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যের এই বিশিষ্ট লক্ষণ 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে পাওয়া যায়। জাতীয় জীবন ও জাতীয় ভাবধারার বহু নিদর্শনই

এর মধ্যে পাওয়া যায়। মুন্সী আবদুল করিম ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল এই সমস্ত উদাহরণগুলি বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করে এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এই দৃষ্টান্তগুলির পুনরুল্লেখ করতে চাই না। এইটুকু মাত্র আমরা বলতে চাই যে 'গোরক্ষবিজয়ে'র অপরূপ আবেদনপূর্ণ কাহিনীটি বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর ভাবকল্পনারই বৈশিষ্ট্য বহন করছে। বাঙালী-হৃদয়-মণ্ডিত উপলব্ধি এই গ্রন্থে মণ্ডিত হয়ে আছে। জীবনের সঙ্গে এই সুনিবিড় যোগ 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাব্যপদবাচ্য হবার দাবীকে অনেক বাড়িয়েছে।

কাব্যের বিভিন্ন উপাদান যে 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে আছে, আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় তা প্রতিপন্ন হয়েছে। বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করে আমরা এর নানা দিকে উৎকর্ষের পরিচয় পেয়েছি। অবশ্য কোন রচনা কাব্যের পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে কিনা তার বিচারের জন্য শুধুমাত্র তার মধ্যে কাব্যের বিভিন্ন উপাদানের সদ্ভাবই একমাত্র দ্রষ্টব্য নয়, সামগ্রিক সংহতির প্রশ্নও বিবেচ্য। কিন্তু 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে এই গুণও আছে। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় 'গোরক্ষবিজয়ে'র সংহতি অনেক বেশী; আগেই আমরা বলেছি, এর মধ্যে অবান্তর বর্ণনা অপেক্ষাকৃত বিরল। সুতরাং এখন এই রচনাটিকে 'কাব্য' আখ্যায় অভিহিত করলে কোন অন্যায় হবেনা বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

কিন্তু শুধুমাত্র কাব্য বললেই এই প্রাচীন রচনাটির প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, তার শ্রেণী ও গোত্রও নির্ণয় করা দরকার। প্রথমে আমাদের দেখতে হবে 'গোরক্ষবিজয়' কোন রসাত্মক কাব্য, অর্থাৎ এর মধ্যে কোন্ রস প্রধান হয়ে উঠেছে। তারপর আনুষঙ্গিক রস নিরূপণ করতে হবে।

গোরক্ষবিজয়ের মধ্যে নানা রসের একত্র সম্মিলন দেখা যায়। কাহিনীটি শৃঙ্গার রস সৃষ্টির অনুকূল না হলেও কদলী-নারীদের হাবভাব ও প্রেম-নিবেদনের মধ্যে শৃঙ্গার রসের সামান্য নিদর্শন মেলে। হাস্যরস সৃষ্টিতে কবির দক্ষতা সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। রৌদ্র রসের দৃষ্টান্ত আমরা পাই যমপুরীতে গোরক্ষনাথের বিক্রমপ্রকাশের দৃশ্যটিতে। কামোন্মত্ততার বিষময় পরিণামের যে চিত্র গোরক্ষনাথ তুলে ধরেছেন তার মধ্যে ভয়ানক ও বীভৎস উভয় রসেরই উদাহরণ মেলে। গোরক্ষনাথ যে সব নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের দীর্ঘশ্বাসে এবং মীননাথের বিচ্ছেদাশঙ্কায় জর্জরিতা রাণী মঙ্গলার কাকুতি মিনতিতে করুণ রসের আভাস সূচিত হয়েছে। গোরক্ষনাথ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে যে সব কাজ করেছেন তাদের চমকপ্রদ বর্ণনায় অদ্ভুত রসের স্ফূর্তি হয়েছে। সেইরকম গোরক্ষনাথ যেখানে সাংসারিক ভোগসুখের অনিত্যতা ও অসারতা প্রদর্শন করেছেন সেখানে শান্ত রস সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে এই রসগুলির কোনটিই 'গোরক্ষবিজয়ে'র অঙ্গী বা প্রধান রস বলে গণ্য হতে পারে না। শৃঙ্গার, করুণ, ভয়ানক ও বীভৎস রসের স্থান কাব্যে এত অকিঞ্চিৎকর যে তাদের বাদ দেওয়া যেতে পারে। কাব্যের প্রকৃতি এবং পরিণাম গম্ভীর, সুতরাং হাস্যরসের নাম এই প্রসঙ্গে উঠতেই পারে না। অবশিষ্ট রসগুলির সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় সমগ্র কাব্যে তাদের কোনটির প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন নেই। বিশেষ করে কাব্যের নায়ক গোরক্ষনাথের কার্যকলাপ সমগ্রভাবে ধরলে তার মধ্যে রৌদ্র রসের স্থায়ীভাব ক্রোধ, অদ্ভুত রসের স্থায়ীভাব বিস্ময় বা শান্ত রসের স্থায়ীভাব নির্বেদ কোনোটিরই পরিপূর্ণ অস্তিত্বের নিদর্শন মেলে না। কাব্যের নায়কই হয়

কাব্যের মূল রসের আলম্বন বিভাব। এই কাব্যের নায়ক গোরক্ষনাথের চরিত্র রৌদ্র, অদ্ভুত বা শান্ত রসের আলম্বন বিভাব নয়, কারণ গোরক্ষনাথের সমস্ত অভিযান, তার দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা, পর্বতপ্রমাণ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ—এর উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা সমগ্রভাবে আমাদের মনের যে অনুভূতিটিকে দোলা দেয় তা ক্রোধ, বিস্ময় বা নির্বেদ নয়; সে অনুভূতি হচ্ছে উৎসাহ। কাব্যের শেষ দৃশ্যটিই তার চরম মুহূর্ত— সমগ্র কাব্যের রস এই দৃশ্যটিতে এসে ঘনীভূত হয়েছে। মোহমগ্ন গুরুকে উদ্ধার করতে গোরক্ষনাথের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সংযমের অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে—কিন্তু তাঁর মনের লৌহকঠিন দৃঢ়তা তাঁকে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত করেছে। গোরক্ষের এই চরম বিজয়ের বর্ণনার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী আছে উৎসাহের ব্যঞ্জনা। কাব্যের শেষে কবির উক্তি,

"জোগ সাধে মীননাথে স্থির কৈল কায়।
স্থন স্থন গুণিজন গোর্খের বিজয়॥"

আমাদের উৎসাহের বহ্নিকে লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত করে। সুতরাং উৎসাহই যে গোরক্ষবিজয়ের স্থায়ীভাব এবং কাব্যখানি যে বীররসাত্মক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা। অদ্ভুত এবং রৌদ্র রস অঙ্গী বীররসের প্রধান ব্যভিচারী রস।

'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীর গোত্রনির্ণয় সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কোন কোন সমালোচক একে 'ঐতিহাসিক কাহিনী' বলতে পশ্চাৎপদ হননি। তাঁরা মনে করেন অতিপ্রাকৃত ঘটনার আবরণের অন্তরালে যে মূল বিষয়টি—গুরু মীননাথের অধঃপতন এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁকে উদ্ধার—এর একটা বাস্তব ভিত্তি আছে, কদলী দেশ যে সত্যিই ছিল, কল্পনার রাজ্যে যে তার সৃষ্টি নয়, এও তাঁরা নানা তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মত সমর্থন করেন না। অনেকে গোরক্ষনাথ-মীননাথের ঐতিহাসিকত্বেই বিশ্বাস করেন না। আবার অনেকে মনে করেন মীননাথ ও গোরক্ষনাথ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও সমসাময়িক ছিলেন না, তাঁরা যথাক্রমে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশে বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হয়ে ছিলেন, তাঁরা প্রথমে বিভিন্ন দুই ধর্মগোষ্ঠীর আদিগুরু ছিলেন, পরে উভয় গোষ্ঠী একত্রে সম্মিলিত হলে মীননাথ গোরক্ষের গুরুপদে অভিষিক্ত হলেন, অবশ্য চরিত্রমাহাত্ম্যে ও সাধনসিদ্ধিতে গোরক্ষেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হল। এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে কোনটি সত্য, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে কোন সিদ্ধান্ত করা করা যায় না। তবে কাব্যের মধ্যে আমরা যে আকারে কাহিনীটি পাই, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু থাকলেও কল্পনার বিচিত্র বর্ণে তা এমনভাবে রঞ্জিত হয়ে গেছে যে তাকে চেনবার উপায় নেই। সুতরাং একে ঐতিহাসিক কাহিনী আখ্যা দেওয়া নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল 'গোরক্ষবিজয়'-কাহিনীকে 'রূপক-কাহিনী' আখ্যায় বিশেষিত করেছেন (দ্রষ্টব্য—"গোর্খ-বিজয়ে অনুস্যূত রূপক-কাহিনীতে বাঙ্গালীর নানা ঐতিহ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে"—গোর্খবিজয়, ভূমিকা পৃঃ ছ-৭)। 'রূপক-কাহিনী'র যে সংজ্ঞা আমাদের কাছে সুপরিচিত, তা এই কাহিনীর উপর প্রয়োগ করলে এর মধ্যে সেসব লক্ষণ দেখতে পাই না। কারণ রূপক-কাহিনী (allegory) একটি গল্পের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ সত্যকে ফুটিয়ে তোলে। তার পাত্রপাত্রীরা

প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃত রূপক-কাহিনীর ক্ষেত্রে বাইরের আবরণ উন্মুক্ত করে অন্তর্নিহিত'অর্থটি আবিষ্কার করা, প্রস্তুতকে অপ্রস্তুতের ভাষায় অনুবাদ করা খুব সহজ। কিন্তু গোরক্ষবিজয়-কাহিনীর গূঢ় অর্থ বিশেষ চেষ্টা করেও উপলব্ধি করা যায় না। এর রূপক-ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলে এইরকম বলতে হয়, কদলীরাজ্য পার্থিব ভোগসুখের প্রতীক, মীননাথ বিষয়ী মনের প্রতীক আর গোরক্ষনাথ বিবেক বা পরমার্থপিপাসার প্রতীক। আমাদের মন যখন পার্থিব জগতের আকর্ষণে ভুলে জাগতিক ভোগসুখে নিমজ্জিত হয়ে যায়,—তখন মন থেকেই যার সৃষ্টি, সেই বিবেক বা পরমার্থপিপাসা মোহিত মনের চৈতন্যসম্পাদন করে আবার তাকে ভগবানের দিকে, সাধনার পথে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু নাথধর্ম ও নাথদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাখ্যা খুব উপযোগী নয়, কারণ এই ধর্মের মূল কথা কায়াসাধন, দেহের সাধনা। দেহের সীমা অতিক্রম করে আত্মার বা মনের সাধনার রাজ্যে নাথদর্শন পদার্পণ করেনি। তাছাড়া মীননাথ ও গোরক্ষনাথকে একই দেহের অভ্যন্তরে দুটি বৃত্তির প্রতীক-রূপে কল্পনা করায় ঘোরতর বাধা আছে। কারণ, কাব্যের মধ্যে মীননাথের কামকেলির কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে। অথচ নাথধর্মের অমোঘ অনুশাসনই যে,—সাধনার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য অভ্যাস। সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করলে 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীকে 'রূপক-কাহিনী' আখ্যা দেওয়া যায় না, এই সিদ্ধান্ত করতে হয়।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'গোরক্ষবিজয়'-কাহিনীকে ঐতিহাসিক কাহিনী বা রূপক কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। আবার একে সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনীও বলা চলে না। কাব্যটি নাথ সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রয়োজনেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু আদ্যন্ত কল্পনাপ্রসূত এই ধরণের একটি কাহিনী তাঁদের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে? কাহিনীটিকে কাল্পনিক বললে তার ঘটনাধারার বিশেষ কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে নাথদর্শনের তত্ত্ব বর্ণিত হলেও সমগ্রভাবে কাহিনীটির মধ্য দিয়ে কোন তত্ত্ব প্রতিপাদিত হচ্ছে না, তা আমরা উপরে আলোচনা করে দেখিয়েছি। আসলে এই কাহিনীর উদ্দেশ্য নাথ সিদ্ধাদের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করা। এই কাব্য সিদ্ধাদের আবির্ভাবের বহুশত বৎসর পরের রচনা; তখন দীর্ঘকালের ব্যবধানে সিদ্ধাদের প্রকৃত জীবনকাহিনী সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, শুধুমাত্র কয়েকটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেই কিংবদন্তীর উপর কল্পনা আরোপ করে এবং মধ্যযুগের প্রথা অনুযায়ী অতিপ্রাকৃত উপাদান সংযোগ করে কাহিনীটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতএব এই কাহিনীকে কিংবদন্তীমূলক বললেই তার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। যেহেতু কিংবদন্তীরও ভিত্তিস্বরূপ একটা সত্য থাকে, এই কাহিনীটির মূলেও তেমনি খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে—আর কিছুর মধ্যে না থাক্ অন্ততঃ সিদ্ধাদের নামগুলির মধ্যে। তাঁদের বর্ণনাকে আমরা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু তাঁদের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে বিশ্বাস না করার কোন হেতু নেই।

'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের বিচার শেষ হল। এইবার গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকার আলোচনা সুরু করা দরকার। কিন্তু তার আগে একটি উক্তির বিচার করা উচিত। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বলেছেন, "গোরক্ষবিজয় গ্রন্থখানিকে ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গানের ··পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করা হয়।" কিন্তু এই অভিমত আমরা স্বীকার করতে পারি না। 'গোরক্ষবিজয়' ও 'গোপীচাঁদের পাঁচালী'

কেউ কারও পরিশিষ্ট নয়, মূলে এরা নাথসম্প্রদায়ের দুটি বিভিন্ন শাখার সাহিত্য ছিল, পরে এই দুই শাখা মিলে গেলে দুটি রচনার মধ্যে যোগসূত্র রচিত হয়েছে। বরং 'গোপীচাঁদের পাঁচালী'র কাহিনীর অংশবিশেষের পূর্ব-ইতিহাস জানবার জন্যে 'গোরক্ষবিজয়ে'র সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু 'গোরক্ষবিজয়ে'র কোন অংশ বোঝবার জন্য 'গোপীচাঁদের পাঁচালী'র সাহায্য দরকার হয় না। সুতরাং 'গোরক্ষবিজয়'কে 'গোপীচাঁদের পাঁচালী'র পূর্বখণ্ড বলা যেতে পারে, পরিশিষ্ট বলার কোন অর্থই হয় না। নাথসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁর সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়ে'র ভূমিকায় বলেছেন, "সমালোচ্য পুঁথিখানিকে 'ময়নামতীর পুঁথি' (গোপীচাঁদের পাঁচালী)র আদিকাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"

'গোরক্ষবিজয়ে'র সমালোচনা করবার সময় লেখকের ব্যক্তিগত কৃতিত্বই আমাদের বেশী করে চোখে পড়েছে। এর কাহিনীর পরিকল্পনা অবশ্য নাথসম্প্রদায় সমবেতভাবেই করেছেন, রচনাটির মধ্যেও নাথ সমাজের পরিবেশ ছায়ার মত বিরাজ করেছে, কিন্তু রচনাটি যে প্রধানতঃ একজন লোকেরই লেখনীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁর চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত, রূপায়ণের অনেকখানি বৈশিষ্ট্যই যে তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কিন্তু নাথদের অপর সাহিত্যসৃষ্টি 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে না। এর মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের একক শক্তির নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায় না। সমস্ত নাথ-সমাজের ধারণা-ভাবনা-কল্পনা একসঙ্গে মিশে এই বিচিত্র আখ্যায়িকার সৃষ্টি করেছে। এইজন্যে বলা চলে 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'ই নাথসম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক সাহিত্য। অবশ্য নাথসমাজ এই মধুর আখ্যায়িকাটি স্বার্থপরের মত নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখেন নি, সমগ্র জাতিকে দান করে দিয়েছেন। এর প্রসারক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে হতে সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তার ফলে সমস্ত জাতির চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা এর প্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে। অখিল ভারতের অগণিত নরনারী আজও পর্যন্ত এই কাহিনী গানের মধ্য দিয়ে শোনে, শুনে মুগ্ধ হয়। এরকম জনপ্রিয় রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান পাবার অধিকারী।

'গোরক্ষবিজয়' নাথসম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ, আর 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' তাঁদের মহাকাব্য। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ, ধ্যান-ধারণা-সংস্কার এর মধ্যে নিঃশেষে প্রতিফলিত হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ ছিল নিরক্ষর তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত, তাদের চিত্তে 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র ছিল অবাধ আধিপত্য। 'গোরক্ষবিজয়ে'র চেয়েও 'গোপীচাঁদ আখ্যায়িকা' তাদের বেশী প্রিয় ছিল, কারণ 'গোরক্ষবিজয়ে' তত্ত্বাংশ অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে যা তাদের ভক্তি আকর্ষণ করতে পারে, প্রীতি আকর্ষণ করতে পারে না; কিন্তু 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র মধ্যে তত্ত্বাংশের স্থান গৌণ, গল্পাংশই সেখানে প্রধান, লোকের মনে গল্পের যে চিরন্তন পিপাসা থাকে, এই কথিকা তা মিটিয়েছে। 'গোরক্ষবিজয়ে'র ভাষার মধ্যে পাণ্ডিত্য ও প্রসাধনকলার চিহ্ন রয়েছে বলে এই ভাষা সব সময় তাদের কাছে সহজগ্রাহ্য মনে হত না, এবং 'গোরক্ষবিজয়' শাস্ত্রগ্রন্থ বলে তার ভাষার কোনরকম পরিবর্তন তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' শাস্ত্র নয় বলে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন

ভাবে গীত রচনা করেছে, সাধারণ লোকে নিজেদের ভাষায় মুখে মুখে গান করেছে, এমনকি কাহিনীরও যে যেমন খুশী পরিবর্তন করেছে। 'গোরক্ষবিজয়'কে কতক বুঝে কতক না বুঝে ধর্মভীরু সাধারণ লোক ভক্তিভরে পাঠ করেছে, আর 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' শুনে তারা অনাবিল আনন্দরস আস্বাদন করেছে।

গোপীচাঁদের কাহিনীর অন্তর্নিহিত আবেদনও সামান্য নয়। এই কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, এর আবহাওয়া একান্তভাবে মানবীয় জীবনের। মানুষের সাধারণ সুখদুঃখ, স্বাভাবিক দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিপূর্ণ নিদর্শন এর মধ্যে পাওয়া যায়। 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীর তুলনায় এই কাহিনীর মানবিক আবেদন অনেক বেশী। 'গোরক্ষবিজয়ে'র পটভূমি উত্তুঙ্গ আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবিত। তার নায়ক গোরক্ষনাথ একজন অতিমানব—আদর্শের বিগ্রহ—সংযম ও কর্তব্যনিষ্ঠার অবতার। গোপীচাঁদের কাহিনীর মধ্যেও আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে—মাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, সংযম, ত্যাগ, সব রকম আদর্শের মূর্ত প্রকাশ এতে দেখা যায়, কিন্তু তার মধ্যে অতিমানবীয় চমৎকারিত্ব নেই—আছে সরলতা স্বাভাবিকতা স্বচ্ছন্দতা। এই ধরণের আদর্শই জনসাধারণের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করে, এরই দৃষ্টান্তে মানুষ জীবন গঠন করে। আখ্যায়িকার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আদর্শের পাশাপাশি মনুষ্যোচিত দুর্বলতাও ফুটে উঠেছে। এমন কি অসীম অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ হাড়িপার মধ্যেও সে দুর্বলতা দেখানো হয়েছে—তাঁর সংযমচ্যুতি ও পতনের ইতিহাসও এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে। 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বাভাবিক মানুষ। অতিপ্রাকৃত ঘটনার অনেক দৃষ্টান্তই এর মধ্যে মেলে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত মানবীয় সুরটি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি।

শুধু তাই নয়, আর একটি দিকে 'গোরক্ষবিজয়ে' যে অপূর্ণতা রয়েছে, 'গোপীচাঁদ আখ্যায়িকা'তে তা নেই। 'গোরক্ষবিজয়ে'র মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ নারীচরিত্র নেই। 'গোপীচাঁদ আখ্যায়িকা'র নারীচরিত্রগুলি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে এবং আখ্যায়িকার মধ্যে ন্যায়সঙ্গত স্থান লাভ করেছে। রাণী ময়নামতী এবং গোপীচাঁদের মহিষীদের মত উজ্জ্বল সজীব নারীচরিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী মেলেনা।

অতএব 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র মধ্যে একটি স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের প্রতিচ্ছবিই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু নাথসম্প্রদায় সংসারবিরক্ত ছিলেন, তাঁদের এই সাহিত্যে জীবনের পরিপূর্ণ মর্যাদা কেমন করে রক্ষিত হল? এর উত্তরে বলা চলে, নাথসম্প্রদায় প্রথমে দুই শাখায় বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে একটি শাখা ছিল সম্পূর্ণরূপে নারীসঙ্গ-বিবর্জিত যোগমার্গাবলম্বী—গোরক্ষবিজয় ছিল তাঁদেরই সাহিত্য। দ্বিতীয় শাখাটির লোকেরাও যোগমার্গের পথিক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে নারী সাধিকার স্থান ছিল, এবং গৃহস্থ সমাজের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। 'গোপীচাঁদ আখ্যায়িকা' গোড়ায় তাঁদেরই সাহিত্য ছিল, এই জন্য তাতে নারী চরিত্রগুলি সহৃদয়তা লাভ করে বিশদ ভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং তার মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক প্রতিফলনও সম্ভব হয়েছে। পরে নাথসম্প্রদায়ে গৃহস্থ লোকেরাও স্থান পেয়েছে, তখন তারা গোপীচাঁদের পাঁচালীকে নিজেদের সাহিত্য বলেই গ্রহণ করেছে, তাদের রুচি ও সংস্কারের প্রভাবে তখন 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' অধিকতর পরিমাণে জীবনরসে অভিষিক্ত হয়েছে। আরও পরে এই আখ্যায়িকা সারা দেশের লোকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, তখন এর মধ্যে মানবীয় রস আরও

নিবিড়ভাবে পরিস্ফুর্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি স্তরেই কাহিনীর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রত্যেক বারের পরিবর্তন বৃহত্তর জনসমষ্টির রুচিকে চরিতার্থ করেছে।

'গোরক্ষবিজয়ে'র মত গোপীচাঁদের কাহিনীরও ভিত্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি কিংবদন্তী। এর পাত্রপাত্রীদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কল্পনার বিরাট স্তূপের নীচে পড়ে সমাধিস্থ হয়েছে।

'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র প্রধান ঐশ্বর্য তার চরিত্রগুলি। এর বিরাট পরিধিতে বহু চরিত্রই স্থান পেয়েছে। তাদের অনেকেই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—আমাদের মনে তারা স্থায়ী আসন অধিকার করে নেয়। তাদের পরিকল্পনায় স্বাভাবিকতার মাত্রা যেমন রক্ষিত হয়েছে, অপরদিকে বিবিধ দ্বন্দ্ব সংঘাত, বিভিন্ন বিরোধী চিত্তবৃত্তির সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের ভিতর জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই রকম জটিল চরিত্রই সাহিত্যের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে।

এই আখ্যায়িকার মধ্যে সব চেয়ে বিশিষ্ট চরিত্র রাণী ময়নামতী। আধুনিক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নারী চরিত্রের তুলনায় ময়নামতীর চরিত্র পরিকল্পনা অত্যন্ত অভিনব। চরিত্রটি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির। যোগ্য লেখকের হাতে পড়লে এই চরিত্রটি অবলম্বনে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হত। চরিত্রটি অবশ্য কাব্যের চেয়ে উপন্যাস বা নাটকের পক্ষেই বেশী উপযোগী।

ময়নামতীর মধ্যে দুই বিরোধী শক্তির সংঘাত দেখা যায়। একদিকে তিনি নিজে একজন সিদ্ধা, নাথধর্মের মাহাত্ম্য তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। তিনি জেনেছেন কায়াসাধনে সিদ্ধিলাভ করলে অমরত্বের অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং তিনি স্বামী, পুত্র সকলকেই যোগী হতে বলবেন, এ'ই পরম স্বাভাবিক। বিশেষ করে যখন স্বামীপুত্র আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন, তখন তাদের এইরকম অনুরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি নারী, তার উপর সন্তানের জননী। তাঁর সন্তান যখন যোগী হওয়ার অনিবার্য ফল স্বরূপ নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে, তখন তাঁর মাতৃহৃদয় বেদনায় নিষ্পেষিত হয়েছে। আলোচ্য পর্যায়ের রচনাগুলিতে ময়নামতীর সিদ্ধাসত্তার পাশাপাশি তাঁর পত্নীসত্তা ও মাতৃসত্তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আর সব কিছুর উপরে তাঁর চরিত্রের যে সর্বপ্রধান লক্ষণটি উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, সে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব। এরকম প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। তাঁর প্রচণ্ড 'হুঙ্কার' বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অতঃপর এই আখ্যায়িকার নায়ক গোপীচাঁদের চরিত্রের উল্লেখ করতে হয়। কোন কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্রই প্রকৃত নায়কপদবাচ্য। গোপীচাঁদ এই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু গোপীচাঁদের চরিত্রে সক্রিয়তার অভাব, অপর চরিত্রগুলি তার উপর ক্রিয়াশীল, তাদের কার্যকলাপ দ্বারা তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। গোপীচাঁদকে আমরা বলতে পারি নিষ্ক্রিয় নায়ক—ইংরেজী অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাষায় "more acted upon than acting"। বাইরের কয়েকটি শক্তি গোপীচাঁদের ভাগ্য নিয়ে যেন নিষ্ঠুর ভাবে খেলা করেছে। দেবতারা তার জন্য স্বল্প পরমায়ু নির্দিষ্ট করেছে, মা ময়নামতী তাকে যোগী হবার জন্যে ক্রমাগত চাপ দিয়েছেন—এবং গুরু হাড়িপা তাকে পরীক্ষা করবার জন্যে চরম দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। বিনা অপরাধে বেচারা গোপীচাঁদের এই সমস্ত দুর্ভোগ! এই সব কিছুর মাঝখানে পড়ে তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠেছে—তার অসহায় ভাব আমাদের মনে অপরিসীম বেদনার সঞ্চার করে।

এই রকম অসাধারণ অবস্থার মধ্য দিয়ে যে চরিত্রের বিকাশ হয়, তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা এসে পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আলোচ্য পর্যায়ের প্রত্যেকটি রচনাতেই গোপীচাঁদ-চরিত্রে স্বাভাবিকতার মাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

মার প্রতি গোপীচাঁদ খুব প্রসন্ন হতে পারেনি। না হওয়াই স্বাভাবিক। আঠারো বছর বয়সের একজন নববিবাহিত তরুণকে যদি রাজ্য, সংসার এবং নবপরিণীতা স্ত্রীদের ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বলা হয়, তবে সে অসন্তুষ্ট হবেই। মার নির্মমতার জন্য সে অনুযোগ করেছে এবং শেষে ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে মাকে কটূক্তি করেছে। তাঁর মানসিক অবস্থা বুঝে এই মাতৃদ্রোহিতার জন্য আমরা তার উপর দোষারোপ করতে পারি না।

বৈরাগ্যগ্রহণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য গোপীচাঁদ নানারকম যুক্তি ও কৌশল অবলম্বন করেছে। এইগুলির মধ্যেও তার চরিত্র মানবতার বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রথমে সে হাড়িপাকে গুরুপদে গ্রহণ করতে আপত্তি জানিয়েছে। হাড়ি কেমন করে মহাজ্ঞান লাভ করতে পারে, সে বিষয়েও তার ঘোরতর অবিশ্বাস। তার এই জাত্যভিমানের মধ্য দিয়েই তাকে মানুষ বলে চেনা যায়। তারপর গোপীচাঁদ রাজপাট এবং মহিষীদের ছেড়ে যেতে অসম্মতি জানিয়েছে। তরুণ বয়সে মানুষের এই ভোগাসক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। স্ত্রীদের প্রতি তার গভীর প্রেমও তার দু একটি কথার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোপীচাঁদ মীননাথের মত কামুক নয়, সে আর পাঁচজন মানুষের মত পরম নিষ্ঠাভরে সংসারধর্ম পালন করতে চায়। পরনারীকে সে মাতৃবৎ দেখে। হীরা বেশ্যা তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সে হীরাকে মাতৃসম্বোধন করে তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে। হাড়িপার নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার ধৈর্য ও সংযমের চূড়ান্ত পরিচয় মিলেছে।

গোপীচাঁদের পর তার দুজন প্রধানা মহিষী অদুনা এবং পদুনার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে শুধু যে সজীবতা ও স্বাভাবিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাই নয়, এরা পরিপূর্ণভাবে মানবিকতার জয় ঘোষণা করেছে। এই দুই নারীচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য একনিষ্ঠ পতিভক্তি। তাদের পতিভক্তি সীতা বা সাবিত্রীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

স্বামীই হিন্দু নারীর অঞ্চলের নিধি। তিনি যাতে সন্ন্যাসে না যান, তার জন্যে রাণীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। স্বামীকে তারা বৈরাগ্য গ্রহণের বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি জুগিয়ে দিয়েছে। ময়নামতী এবং হাড়িপা গোপীচাঁদকে সন্ন্যাসগ্রহণে প্ররোচিত করেছেন বলে রাণীরা তাঁদের উপর ক্রোধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে, তাদের ক্রোধ এমন চরম সীমায় পৌঁছেছে যে তারা এই দুজনের প্রাণনাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হলে রাণীরা কাকুতিমিনতি করে রাজাকে যেতে নিষেধ করেছে। রাজা তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তারা রাজার সঙ্গে যেতে চেয়েছে। তাদের আকুতির মধ্যে হিন্দু কান্তার আত্মবিস্মৃত পতিপ্রেম জ্বলন্ত অক্ষরে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু তাদের এত দুঃখের মধ্যে স্বামী আর এক মর্মান্তিক আঘাত দিয়ে বসলেন। তিনি খেতু নামে রাজপরিবারের একজন আশ্রিত যুবককে পতিরূপে গ্রহণ করবার জন্যে রাণীদের অনুরোধ করলেন। রাণীরা এই প্রস্তাব তীব্র ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে রাজার এই অশোভন কথার জন্যে তাঁকে ধিক্কার

দিল। তারা খেতুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করলে সমাজ বা শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘিত হত না, কিন্তু তবুও তারা তাতে রাজী হয়নি, এর থেকেই প্রতিপন্ন হচ্ছে তাদের পতিভক্তি কত একনিষ্ঠ। এ সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, "রাজবাড়ীর প্রথা অনুসারে অদুনা অনায়াসে খেতুকে স্বামীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারিত। ইহাদের সমাজে বিবাহ-প্রথা একান্ত শিথিল ছিল।...যাহাকে সমাজ কড়াকড়ি করিয়া বিবাহ-পীঠে বাঁধে নাই, তাঁহারা একি অপূর্ব বন্ধন স্বীকার করিয়া আত্মবলি দিয়াছেন।...ইহারা দেখাইয়াছেন প্রেমের মত ধর্ম নারীর আর নাই।...এই সংসার সমুদ্রের দিশাহারা পান্থ,—পথভ্রষ্ট নাবিক যদি কোন আলোকস্তম্ভের উপর নির্ভর করিয়া পথ দেখিতে চায়, তবে অদুনা ও তাঁহার শ্রেণীরা সেই পথ দেখাইবেন।"

রাণীদের মিনতি উপেক্ষা করে গোপীচাঁদ চলে গেলেন। দীর্ঘকাল তাঁর কোন সংবাদ নেই। রাণীরা তখন শুক-সারী পাঠিয়ে গোপীচাঁদের সন্ধান করল। ফলে হীন বন্দী দশা থেকে গোপীচাঁদের উদ্ধারসাধন সম্ভব হল। এর পরবর্তী অংশ বিভিন্ন রচনাতে বিভিন্ন ধরণের। কিন্তু রাণীদের অবিচল পতিভক্তি সব কটি রচনাতেই শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখতে পাই।

এখানে একটা কথা উঠতে পারে। গোপীচাঁদের অদৃষ্টে তরুণ বয়সে মৃত্যুযোগ লেখা ছিল, একমাত্র সন্ন্যাসগ্রহণেই যার প্রতিকার হওয়া সম্ভব—এই কথা ভবানী দাস ও সুকুর মহম্মদ বিরচিত পাঁচালীতে এবং উত্তর বঙ্গের প্রচলিত ছড়াতে বলা হয়েছে। এ কথা জেনেও পতিব্রতা রাণীরা রাজাকে সন্ন্যাসগ্রহণে বাধা দিয়েছিল কেন সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাদের এই আপাত-অসঙ্গত কাজের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে যে তারা ঘোরতর বাস্তববাদী ছিল এবং অদৃষ্টের লিখনে বিশ্বাস করত না। অবশ্য গোপীচাঁদের মৃত্যুযোগের প্রসঙ্গটি মূল কাহিনীতে ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ আলোচ্য পর্যায়ের এযাবৎ প্রাপ্ত মৃত্যুযোগের রচনাগুলির মধ্যে কালের দিক দিয়ে যে দুটি সবচেয়ে প্রাচীন সেই 'গোপীচন্দ্র নাটক' ও 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' এই প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নেই।

অদুনা ও পদুনার চরিত্রের পার্থক্যও ফুটে উঠেছে। অদুনা অত্যন্ত তেজস্বিনী, স্বামীর সঙ্গে তর্কবিতর্কের সময় সেই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। পদুনা স্বল্পভাষিণী, কিন্তু যে দু একটি কথা সে বলে, তাইতেই তার মনের পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উভয়ের মধ্যে মর্যাদাগত প্রভেদ রয়েছে। অদুনা গোপীচাঁদের বিবাহিতা স্ত্রী। পদুনা অদুনার ছোট বোন, তাকে পিতা অদুনার বিবাহ উপলক্ষ্যে যৌতুকস্বরূপ গোপীচাঁদকে দান করেছিলেন। পদুনার মনে স্বামীর বিবাহিতা পত্নী না হওয়ার জন্যে যে গ্লানি ছিল, তা নিয়ে সার্থক করুণরস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। একমাত্র সুকুর মহম্মদের রচনাতেই এই সম্ভাবনা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হয়েছে, সেখানে পদুনা তার সমস্ত আক্ষেপ ও অভিযোগ ভাষায় ব্যক্ত করেছে।

রাজা মাণিকচাঁদের স্থান সমগ্র কাহিনীর মধ্যে খুব অল্প হলেও তার মধ্যেই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পৌরুষ সত্যিই দৃপ্ত ও অনমনীয়। রানী ময়নামতী যখন তাঁকে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান শিক্ষা করে মৃত্যু জয় করার অনুরোধ জানালেন, তখন মাণিকচাঁদ দম্ভের সঙ্গে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তিনি প্রাণ দেবেন—তবু স্ত্রীর কাছ থেকে জ্ঞান শিক্ষা করবেন না। তিনি তাঁর কথা থেকে শেষ পর্যন্ত তিলার্ধও বিচলিত হলেন না, প্রাণ বিসর্জন দিয়েও স্বামী-অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে হাড়িপা ও খেতু পূর্ণ-বিকশিত না হলেও তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। হাড়িপা সিদ্ধ হলেও অত্যন্ত চতুর, শিষ্যকে জব্দ করবার জন্যে তিনি নানারকম কূট পরিস্থিতির অবতারণা করেছেন। খেতু কতকটা দুমুখো চরিত্র, তার কাজ দু পক্ষেরই সঙ্গে যোগ দিয়ে বাইরে অজ্ঞতার অভিনয় করা। খেতুর চরিত্রবৈশিষ্ট্য সুকুর মহম্মদের রচনায় এবং উত্তর বঙ্গে প্রচলিত ছড়াতে খানিকটা ফুটেছে।

সাহিত্যের সমাজ যেমন বিপুলায়তন, তেমনি তার মধ্যে নানারকম জাতিভেদ রয়েছে। গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত, তা নিরূপণ করা দরকার। এর বর্ণনাগুলির প্রকৃতির দিকে তাকালেই এ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। এর মধ্যে অতিপ্রাকৃত বর্ণনারই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। এই বর্ণনাগুলি সমস্ত অবাস্তবতা সত্বেও আমাদের মনকে একটি সহজ তৃপ্তিতে ভরে দেয়। এই বৈশিষ্ট্যটি সাধারণতঃ রূপকথার বর্ণনাতেই মেলে। এই কারণে বলা যায়, আলোচ্য আখ্যায়িকাটি রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। রূপকথার মত অলৌকিক অসম্ভাব্য ঘটনা, বাধাবন্ধহীন কল্পনার অবাধ গতির নিদর্শন যেমন এই আখ্যায়িকাতে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, তেমনি অলৌকিক ঘটনাসর্বস্ব হওয়া সত্বেও যে কারণে রূপকথা সাহিত্য বলে স্বীকৃত হয়, সেই কারণে এই আখ্যায়িকাও সাহিত্য স্বরূপে গণ্য হবার যোগ্য। সে কারণটি আর কিছুই নয়, রূপকথার অনৈসর্গিক ঘটনাগুলির বর্ণনার মধ্যে এমন একটি মাদকতাপূর্ণ মনোহর আবহাওয়া সৃষ্টি হয় যে তা বয়স্ক পাঠকের গম্ভীর সমস্যাজর্জরিত মনেও অপরূপ স্বপ্নমোহের মায়া-আবেশ রচনা করে। রূপকথার অলৌকিক ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, তাদের বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তোলবার কোন প্রচেষ্টাই করা হয় না, তাদের মধ্যে কোন তত্ত্ব বা রূপকার্থ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান থাকে না। এই অসংকোচ উন্মুক্ততার জন্যেই তারা আমাদের মনে অবাধ প্রবেশাধিকার পায়।

এককথায়—মাদকতা, মনোহারিত্ব ও উন্মুক্ততাই রূপকথার অতিপ্রাকৃত বর্ণনাকে কাব্যগুণমণ্ডিত করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অভাবের জন্যই অনৈসর্গিক বর্ণনাপূর্ণ অন্যান্য রচনা, বিশেষতঃ তত্ত্বমূলক রচনাগুলি সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকাতে যে সমস্ত অতিলৌকিক উপাদান রয়েছে, সেগুলি উদ্ভটতায় ও বিচিত্রতায় যে কোন মধ্যযুগীয় কাহিনীকে হার মানায়, কিন্তু তবুও তারা কাব্যোপযোগী হয়েছে, কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে এই মায়াবেশের পেলব স্পর্শ। আমাদের সমস্ত প্রবীণতা ও অভিজ্ঞতার অন্তরালে যে একটি স্বপ্নরসপিপাসু মন রয়েছে, এই বর্ণনাগুলি তাকে পরিতৃপ্ত করে।

অবশ্য রূপকথার আরো দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ রূপকথা কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয় বা লিখিত সাহিত্যও নয়। মানবজাতি তার অস্ফুট শৈশবে কল্পনা দিয়ে বিশ্বজগতের সমস্ত রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করত। সেই সময় থেকেই রূপকথার সূত্রপাত, তখন থেকে সুরু করে পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রূপকথাগুলি বর্তমান দিনে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। লোকসাহিত্যের বিকাশও এইভাবেই হয়। রূপকথা পরিপূর্ণরূপে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ রূপকথার কাহিনী সব সময়েই হয় মিলনান্ত, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বিচ্ছেদ অতিক্রম করে এসে শেষকালে রূপকথার পাত্রপাত্রীরা অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্পদ ও মিলনানন্দের অধিকারী হয়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা পর্যায়ের অন্য রচনাগুলির মধ্যে মেলেনা; একমাত্র উত্তর

বঙ্গে প্রচলিত ছড়াতে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়; ছড়াটি খাঁটি লোকসাহিত্য এবং তার পরিণামও সম্পূর্ণরূপে মিলনমধুর। বাকী রচনাগুলি লিখিত সাহিত্য, তাদের অধিকাংশেরই পরিসমাপ্তি হয়েছে রাজার সন্ন্যাস-গ্রহণের মধ্যে, কোন কোনটিতে তাঁর সংসারে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়। সুতরাং গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকাকে সমগ্রভাবে রূপকথার গণ্ডীতে ফেলা যায় না, তবে তার মধ্যে রূপকথার উপাদান খুব বেশী।

এই রূপকথাধর্মিতার জন্যেই গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকার মূল রস কি, তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। এর অনৈসর্গিক বর্ণনাগুলি আমাদের মনে উত্তরোত্তর বিস্ময়ের ভাবকেই ঘনীভূত করে তোলে। অতএব বিস্ময়ই এই আখ্যায়িকার স্থায়ী ভাব এবং বিস্ময় থেকে যে রস সৃষ্টি হয় সেই অদ্ভুত রসই এর প্রধান রস।

অদ্ভুত ভিন্ন অন্যান্য রসও এই আখ্যায়িকাতে রয়েছে। করুণ রসের প্রাধান্য অদ্ভুত রসের ঠিক পরেই। গোপীচাঁদের বিদায়ক্ষণে তাঁর রাণীদের আকুতি করুণ রসের অত্যন্ত মধুর ও স্মরণীয় নিদর্শন, এই আকুতি মনের মধ্যে প্রবেশ করে বেদনার নিভৃত উৎসে অতি সূক্ষ্ম আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই অংশটি সমগ্র আখ্যায়িকার প্রাণস্বরূপ, আকর্ষণের দিক দিয়ে অন্যান্য অংশগুলি সমবেতভাবেও এর কাছে দাঁড়াতে পারে না। রাণীদের মর্মভেদী বিলাপের অতি করুণ সুর আখ্যায়িকার শেষ অবধি মূর্ছিত হয়েছে। এই অত্যন্ত বিশিষ্ট অংশটি ছাড়া প্রবাসে গোপীচাঁদের দুঃখকষ্ট এবং জনৈকা বেশ্যার বাড়ীতে ক্রীতদাসরূপে বন্দী অবস্থায় তার দুঃসহ যন্ত্রণার বর্ণনাটিও করুণরসে পূর্ণ। কাহিনীর অন্যান্য কোন কোন অংশেও করুণ রসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং আখ্যায়িকার মধ্যে করুণ রসের স্থান অত্যন্ত বিশিষ্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু করুণ রস এই আখ্যায়িকার মূল রস স্বরূপে গণ্য হতে পারে না। কারণ সেই রসই কোন রচনার মূল রস যা রচনার সর্বত্রই কমবেশী পরিমাণে সঞ্চারিত হয়, প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফূর্ত না হোক, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আপনার অস্তিত্ব প্রচার করে, রচনার আদি ও অন্তে প্রাধান্য লাভ করে এবং রচনার সমস্ত অংশগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকাতে একমাত্র অদ্ভুত রসই এ'সমস্ত দাবী মেটাতে সক্ষম। করুণ রস আখ্যায়িকার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ অংশগুলিতে প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু সব অংশগুলিতে করেনি, আখ্যায়িকার সূচনার মধ্যে করুণ রস পরিস্ফুট হয়নি। অদ্ভুত রস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব অংশগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে, এবং সুদৃঢ় যোগসূত্র রচনা করে আখ্যায়িকার সমস্ত ঘটনাগুলিকে বেঁধে রেখেছে। আলোচ্য আখ্যায়িকার দুই গৌণ রস শৃঙ্গার এবং শান্ত। রাণীদের সঙ্গে গোপীচাঁদের প্রণয়ের বর্ণনাগুলিতে শৃঙ্গার রস স্ফূর্ত হয়েছে এবং যে অংশগুলিতে সংসারের অসারতা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে শান্ত রসের সৃষ্টি হয়েছে।

গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকার মধ্যে যেমন নানা রসের সমাবেশ হয়েছে, তেমনি তার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদানও রয়েছে। ময়নাবতীর জটিল চরিত্র, গোপীচাঁদের উভয়সংকট, রাণীদের প্রিয়বিরহবেদনা প্রভৃতি নাটকেরই উপজীব্য। এর কাহিনী বহুবার দিকপরিবর্তন করেছে, যার ফলে আমাদের মনে বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই কাহিনীর অফুরন্ত নাট্যসম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি, কোন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়নি। নেপালে প্রাপ্ত নাটপালা দুর্বল হাতের অপরিণত সৃষ্টি বলে তার বিশেষ কোন মূল্য নেই।

রসই সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু এই প্রাণ বেঁচে থাকে কয়েকটি অপরিহার্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল রুচি। মার্জিত রুচি ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট রস সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। নাথসাহিত্যের মধ্যে রসস্ফূর্তির মাত্রা সবক্ষেত্রে সমান নয়, কোথাও বেশী, কোথাও কম, কিন্তু রুচির অভাব তার মধ্যে প্রায় কোথাও নেই। বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়ে রস উৎসারণের পথ আগে থেকেই বন্ধ করে দেবার ধৃষ্টতা নাথসাহিত্যের লেখকেরা দেখাননি। 'গোরক্ষবিজয়ের' মধ্যে অপরুচিপূর্ণ বর্ণনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বললেই চলে। আমরা সে সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করে এসেছি। 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'তেও এর নিদর্শন খুব কমই মেলে। একমাত্র হীরা বেশ্যার আচরণ বর্ণনা করতে গিয়েই কোন কোন রচয়িতা ঈষৎ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। এছাড়া তাঁরা সর্বত্রই শোভনতার সীমা রক্ষা করেছেন।

অবশ্য আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র কতকগুলি ঘটনা বিসদৃশ ও রুচি-বিগর্হিত বলে মনে হয়। যেমন—স্বামীর কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে ময়নামতীর সন্তানলাভ এবং খেতুর হাতে অদুনা-পদুনার সমর্পণ। কিন্তু সহানুভূতি সহকারে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব, এগুলি বিকৃত রুচির নিদর্শন নয়।

স্বামীর কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে ময়নাবতীর সন্তানলাভ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমে একটি কথা বলে নিতে হয়। গোপীচাঁদের পাঁচালীর রচয়িতারা এই ব্যাপারে মহাভারত ও পুরাণের তুলনায় সংশোধিত রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারত ও পুরাণে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে স্ত্রী স্বামী-ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষের সহবাসে ক্ষেত্রজ সন্তান লাভ করছেন। কিন্তু এখানে ময়নামতীর সন্তানলাভে যেমন তাঁর স্বামীর কর্তৃত্ব দেখানো হয়নি, তেমনি অন্য পুরুষের কর্তৃত্বও দেখানো হয়নি। দেবতা বা সিদ্ধের বরে ময়নামতী অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভ করেছেন, এই কথাই বলা হয়েছে।

রংপুরের ছড়াতে দেখতে পাই, রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নাবতী তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্যে যমপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর মনোরথ পূর্ণ হয় না, তবে গুরু গোরক্ষনাথের[১] মধ্যস্থতায় তিনি নারদের কাছ থেকে পুত্রবর লাভ করেন। মাণিকচাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে ময়নামতী পুত্র প্রসব করেন।

১ 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা' পর্যায়ের প্রায় সমস্ত রচনাতেই বলা হয়েছে যে ময়নামতীর গুরু ছিলেন গোরক্ষনাথ। উত্তর বঙ্গের ছড়াতে দেখি ময়নামতী বলছেন,

"গোরকনাথ হয় গুরু হাড়ি ধম্মের ভাই।
...
গুরু গুরু বলিয়া মএনা বুড়ি কান্দিতে লাগিল।
কৈল্লাসেতে ছিল শিব গোরকনাথ আসন টলিল।"

দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রকে বলছেন,

"যে কালে জনক গৃহে আছিলাম আমি।
মোরে জ্ঞান দিয়াছেন গোক্ষনাথ মুনি।
পাটশালে পড়ি আমি জাই নিকেতন।
সোল শত জুগী লইয়া গোক্ষর গমন।"

শুকুর মহম্মদের পাঁচালীতে গোপীচাঁদ নিজেই তাঁর জন্মের কাহিনী বলেছেন,

"সেবক হইয়া মাতা জিজ্ঞাসে গুরুর স্থানে।
বিবাহ হইবে আমার কোন রাজার সনে॥
শুনিয়া মুনির কথা কহে হরিহর।
মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে বিভা হইবে তোমার॥
না হইবে কামভাব না হইবে রতি।
এহি কথা কয়েছিল গুরু গোর্খ যতি॥
...
পিতার চরণামৃত মাতায় খাইল।
যতি গোর্খের বরে আমার জনম হইল॥"

আসল কথা, নাথেদের মনে এই প্রবল সংস্কার ছিল যে সিদ্ধা ময়নাবতী কখনও প্রাকৃত নারীর মত স্বামী-সহবাস করতে পারেন না। তাঁর মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে তাঁরা গোপীচাঁদের জন্মের এই অনৈসর্গিক কাহিনী পরিকল্পনা করেছেন। বিভিন্ন কবিরা সম্ভবতঃ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র কাহিনী উদ্ভাবন করেছেন, কারণ বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে মিল নেই। দুর্লভ মল্লিক গোবিন্দচন্দ্রের জন্মে মাণিকচন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তা দেখাননি, তার কারণ সম্ভবতঃ তাঁর যুগসংস্কার ধর্মসংস্কারের উপর জয়ী হয়েছিল। তাই তিনি ময়নামতীর মুখ দিয়ে গোবিন্দচন্দ্রকে বলিয়েছেন,

ভবানীদাসের বইয়ে বলা হয়েছে গোরক্ষনাথ ময়নামতীকে শৈশবেই জ্ঞান দিয়েছিলেন এবং তিনিই তাঁর 'ময়নামতী' নাম রেখেছিলেন,

"বাপ মাহে নাম থুইল শিশুমতী আই।
গোর্খনাথে থুইল নাম সুন্দর মৈনাই।
শূন্যে নিয়াছিল গুরু শূন্যে আনি দিল।
বাপ মাএ কেহ মোর উদ্দেশ না পাইল॥
এরূপে পাইল জ্ঞান গোর্খনাথ স্থানে।"

শুকুর মহম্মদ লিখেছেন,

"গোর্ক্ষের নিজ নাম অন্তরে জপিয়া।
ধ্যানেত আছিল মুনি আনন্দিত হইয়া।
গোপ্তে আছিল মুনি গুরুর ধিয়ানে।
মুনির স্মরণে নাথ আইল আপনে।"

শুকুর বলেছেন গোরক্ষনাথেরই বরে গোপীচাঁদের জন্ম হয়েছিল।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে (২য় সং, পৃ ৭১২) দুর্লভ মল্লিক অনুসৃত কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দেবার সময় ডাঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "ময়নামতী বলিলেন, তিনি যখন পিতৃগৃহে ছিলেন তখন মীননাথকে ও তাঁহার ষোল শত যোগী-শিষ্যকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া মীননাথ তাঁহাকে মহাজ্ঞান দিয়া চারি যুগে অমর করিয়া দেন।" এখানে স্পষ্টতই 'মীননাথে'র জায়গায় 'গোরক্ষনাথ' হবে।

"তোর পিতা মোর ভয়ে কররে তরাস।
মোরে ছন্ন করি রাজা বঞ্চে গৃহবাস॥
তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমার প্রকাশ॥

এইভাবে দুর্লভ মল্লিক দুই পরস্পরবিরোধী সংস্কারের মধ্যে আপোষ করেছেন।

মহাপুরুষদের জন্মের সম্বন্ধে এইরকম অলৌকিক কাহিনী প্রচার সব জাতিরই স্বভাব। খ্রীষ্টানরা বলেন, যীশু খ্রীষ্টের জননী মেরী ঐশ্বরিক প্রভাবে সন্তানবতী হয়েছিলেন, কোন মানুষ তাঁর জনক নন। তাঁদের এইরকম বলার পিছনে যে মনোভাব বর্তমান ছিল, নাথসম্প্রদায়ও সেই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে গোপীচাঁদের জন্ম সম্বন্ধে এইসব অতিপ্রাকৃত কাহিনী প্রচার করেছিলেন, একে রুচির বিকার মনে করা যায় না বলেই আমাদের ধারণা।

খেতুর হাতে অদুনা-পদুনার সমর্পণ সম্বন্ধে বলা যায়, গোপীচাঁদ যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন, তখন স্ত্রীদের অন্যের হাতে সমর্পণ করে তিনি কোন রুচিবিগর্হিত কাজ করেননি, বরং শাস্ত্রসম্মত কাজ করেছেন। শাস্ত্রের নির্দেশ এই,

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

—পরাশর সংহিতা

'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এইবার বিভিন্ন রচনাগুলি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করব। যে সমস্ত বাংলা রচনার মধ্যে এই কাহিনী রূপায়িত হয়েছে, নীচে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হল।

(১) নেপালে রচিত ও প্রাপ্ত নাট-পালা 'গোপীচন্দ্র নাটক'। এর রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। ডাঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে (২য় সং, পৃঃ ৭৬৮–৭৭৪) এই নাটপালাটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এটি অবিমিশ্রভাবে বাংলা ভাষায় লেখা নয়, "মূল কবিতা অংশ বাঙ্গালায় লেখা আর অভিনয়ের নির্দেশ এবং গদ্য অংশ নেওয়ারীতে লেখা।"

(২) দুর্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'। শিবচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত।

(৩) ভবানীদাস রচিত "অপূর্ব কথন।" এর চার পাঁচখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। সবগুলিই খণ্ডিত। এই বই সর্বপ্রথম নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের সম্পাদনায় ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'ময়নামতীর গান' নামে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩৩১ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

(৪) সুকুর মহম্মদ রচিত "যোগান্ত পুঁথি" বা "যোগীর পুঁথি"। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' নামে বটতলা থেকে এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত করেন। পরে ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর একটি পুঁথি অবলম্বনে এই বইয়ের এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

(৫) উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়া। রংপুরের পল্লী অঞ্চলের কোন গায়েনের কাছ থেকে এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সংগ্রহ করে গ্রীয়ারসন সাহেব ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রথম প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ ছড়াটি বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

(৬) আর একটি পাঁচালী। পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত একটি পুঁথির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত পত্রে এর খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ রূপটি পাওয়া গিয়েছে। রচনা ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। ডাঃ সুকুমার সেন 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে (২য় সং, পৃঃ ১০৩৫-১০৪১) এই রচনাটির বিবরণ দিয়েছেন।

এদের মধ্যে নেপালের নাটপালাটি নেপাল-পাটনের রাজা সিদ্ধিনরসিংহদেবের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৬২০ থেকে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৭৬৮ দ্রষ্টব্য)। দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' এর পুঁথির লিপিকাল ১২০৬ বঙ্গাব্দ, সুতরাং রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে নয়। ভবানীদাস ও সুকুর মহম্মদ রচিত কাব্যের পুঁথি আরও কিছু পরবর্তীকালের। সুতরাং এই দুটি কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের ছড়াটির রচনাকাল সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। তালিকার সর্বশেষ রচনাটির রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু অনুমান করার উপায় নেই, তবে ভাষা দেখে এটিকে বিশেষ প্রাচীন বলে মনে হয় না।

এই রচনাগুলি বিভিন্নজাতীয়। নাটপালাটি নাট্যসাহিত্যের, ছড়াটি লোকসাহিত্যের এবং বাকী রচনাগুলি কাব্যসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং গোপীচাঁদের কাহিনীটি তিন জাতের সাহিত্যের উপাদান জুগিয়েছে। বাংলার আর কোন কাহিনী এই গৌরব দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ।

আরও একটি বিষয় দেখতে হবে। নাটপালাটি নেপালে, ছড়াটি উত্তরবঙ্গে রচিত হয়েছিল, দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস ও সুকুর মহম্মদ যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী। অসম্পূর্ণ পাঁচালীটিও পশ্চিমবঙ্গেই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলার এমন কোন অঞ্চলই ছিল না, যেখানে গোপীচাঁদের কাহিনী জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

আলোচ্য রচনাগুলির পরস্পরের মধ্যে অনেক বিষয়েই পার্থক্য রয়েছে। সিদ্ধ হাড়িপা বা জালন্ধরিপাদের কাছে গোপীচাঁদের যোগিরূপে দীক্ষাগ্রহণ সমস্ত রচনাতেই বর্ণিত হয়েছে, তার আগেকার কয়েকটি গৌণ বিষয়ে বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রভেদ থাকলেও মূলতঃ বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু গোপীচাঁদের দীক্ষাগ্রহণের পরে বিভিন্ন রচনার কাহিনীতে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রত্যেকটি রচনার পরিণতি স্বতন্ত্র ধরণের। নেপালে প্রাপ্ত নাটপালা দীক্ষার অব্যবহিত পরেই রাজার সংসারে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হয়েছে। উত্তর বঙ্গে প্রচলিত ছড়ার শেষে দীর্ঘকাল প্রবাসভ্রমণ ও নানা দুঃখকষ্টের পর গোপীচাঁদের দীক্ষালাভ এবং তার পরে নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন দেখানো হয়েছে। দুর্লভ মল্লিকের রচনায় রাজার প্রবাস ভ্রমণ, নির্যাতন লাভ প্রভৃতির পরে রাজ্যে প্রত্যাগমন দেখানো হয়েছে, কিন্তু কিছুকাল রাজ্য করার পর আবার তিনি হাড়িপার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করেছেন। সুকুর মহম্মদ রচিত পাঁচালীতে রাজার প্রবাস, নির্যাতন এবং দীক্ষালাভ পর্যন্ত

দেখানো হয়েছে, তাঁর রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের বিন্দুমাত্র আভাস দেওয়া হয়নি। ভবানীদাসের রচনার কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নি, খণ্ডিত পুঁথিতে রাজার প্রবাস ও নির্যাতন, অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দেখতে পাই।

রচনাগুলির উপসংহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের কেন, এ প্রশ্ন আমাদের মনে না উঠে পারে না; এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার আগে দেখতে হবে এদের মধ্যে কোন্‌টি আলোচ্য আখ্যায়িকার সঙ্গত পরিণতি বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

রাজার সন্ন্যাস থেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন কোন দিক থেকেই সঙ্গত নয়। ধর্মের দিক থেকেও নয়, সাহিত্যের দিক থেকেও নয়। ঘোর সংসারী বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী গোপীচাঁদ যোগী হওয়াতে নাথ ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হয়েছে। কিন্তু এই যোগী যদি আবার সংসারে ফিরে আসেন, তাহলে অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শ তাতে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সুতরাং নাথ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজার সংসারে প্রত্যাবর্তনের মত অবাঞ্ছনীয় বিষয় আর কিছু হতে পারেনা। সাহিত্যের দিক থেকেও রাজার পুনরাগমন আদৌ অভিপ্রেত নয়। তার কারণ, আলোচ্য কাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ রাণীদের কাছ থেকে গোপীচাঁদের বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটি। দয়িতের সঙ্গে বিচ্ছেদে অভাগিনী রাণীদের হৃদয় থেকে যে হাহাকার উত্থিত হয়েছে, তারই রেশ আমাদের মনের মধ্যে সারাক্ষণ ধ্বনিত হতে থাকে; কিন্তু রাজার প্রত্যাগমন রাণীদের বিরহ বেদনার অবসান করে কাহিনীর সমস্ত কারুণ্যকে লাঘব করে দেয়। ফলে একটি আবেগপ্রধান আখ্যানের মূল মাধুর্যটুকুই নষ্ট হয়ে যায়।

কেন বিভিন্নভাবে রচনাগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তার কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়। সেগুলির এবার উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমরা বিভিন্ন রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, একমাত্র উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়ার কাহিনীই পরিপূর্ণভাবে মিলনান্ত। নেপালে প্রাপ্ত নাটপালার কাহিনী মিলনান্ত কিনা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ভবানীদাসের খণ্ডিত পুঁথি রাজার পুনরাগমন দিয়ে শেষ হলেও সম্পূর্ণ পুঁথিতে কাহিনী মিলনান্ত ছিল বলে নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় না। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়াটির প্রচার ছিল সাধারণ লোকদের মধ্যে, যারা নিজেরা সংসারী, এবং বিয়োগান্ত কাহিনী যাদের প্রিয় হবার কথা নয়। এই কারণে রাজার সঙ্গে রাণী, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং প্রজাদের মধুর মিলন দেখিয়ে ছড়াটির পরিসমাপ্তি করা হয়েছে। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের মধ্যে শেষ হলে এ ছড়ার এত জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা থাকত না। নেপালে প্রাপ্ত নাটপালাটিও নিশ্চয় জনসাধারণের মধ্যে গীত হত। তার কাহিনীও যে মিলনের ইঙ্গিতে অবসিত, এর মূলেও সম্ভবতঃ এই একই কারণ ছিল; জনসাধারণের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখেই এইভাবে রচনা শেষ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

তারপর, নাথ সম্প্রদায় যদিও প্রথমে নৈষ্ঠিকভাবে সংসারবিরক্ত ছিলেন, তবুও কালক্রমে তাঁদের কঠোরতা অনেক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নাথধর্মের সঙ্গে গার্হস্থ্য ধর্মের আপোষ হয়েছিল এবং নাথসম্প্রদায়ের একাংশ গার্হস্থ্যমার্গ অবলম্বন করেও সমাজের মধ্যে স্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

উত্তরবঙ্গের ছড়াটি গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকার সর্বশেষ পরিণতি, তার মধ্যে একজন যোগীর সংসারাশ্রমে প্রত্যাবর্তন দেখিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম ও নাথধর্মের মধ্যে আপোষ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

আসল কথা, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস সম্বন্ধীয় যে কাহিনী নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যা পরে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল, তাকে সম্পূর্ণ আকারে সব রচনায় মধ্যে রূপায়িত করে তোলা হয়নি। একমাত্র দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে'ই সম্পূর্ণ কাহিনীটি মেলে বলে আমাদের ধারণা। এর মধ্যে যথাক্রমে এই ঘটনাগুলি পাওয়া যায়।

(১) ময়নামতীর গোপীচাঁদকে হাড়িপার কাছে দীক্ষাগ্রহণের অনুরোধ।

(২) গোপীচাঁদের হাড়িপাকে গুরুপদে বরণ।

(৩) রাণীদের কাছে গোপীচাঁদের বিদায়গ্রহণ।

(৪) গুরুর সঙ্গে গোপীচাঁদের বিদেশে যাত্রা।

(৫) অনৈকা বেশ্যার কাছে গোপীচাঁদকে বাঁধা রাখা।

(৬) গোপীচাঁদের উদ্ধার।

(৭) গোপীচাঁদের রাজ্যে প্রত্যাগমন।

(৮) কয়েক বছর গৃহি-জীবন যাপন।

(৯) আবার সন্ন্যাস ও প্রবাস।

বাকী রচনাগুলিতে কাহিনী এতদূর অগ্রসর হয়নি, তার আগেই তাদের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। নাটপালাতে (১) থেকে (৩) চিহ্নিত ঘটনা অবধি মাত্র পাওয়া যায়। সুকুর মহম্মদের রচনা (৬) চিহ্নিত ঘটনাতে এবং উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়া (৭) চিহ্নিত ঘটনাতে শেষ হয়েছে, ভবানীদাসের খণ্ডিত পুঁথিতেও (৭) চিহ্নিত ঘটনা অবধি পাওয়া যায়। মূল কাহিনী যে রাজার রাজ্যে প্রত্যাগমনের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়নি, তাঁর সন্ন্যাস ও প্রবাসের বর্ণনাতে শেষ হয়েছিল, এরকম ধারণার স্বপক্ষে একটি প্রমাণ আছে। সেটি এই যে, বাংলার বাইরে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস সম্বন্ধীয় যে সমস্ত কাহিনী পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এক মহারাষ্ট্র ভিন্ন আর কোন জায়গার কাহিনীতে রাজার প্রত্যাবর্তন দেখা যায় না ; যে সমস্ত রচনার মধ্যে এই কাহিনীগুলি পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে অনেকে বাংলা দেশে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন রচনার চেয়েও বেশী প্রাচীন। বাংলাদেশ থেকেই এই কাহিনী এইসব দেশে গিয়েছে। সুতরাং মূল কাহিনীর পরিণতি সম্বন্ধে এদের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য।

বিভিন্ন রচনাতে কয়েকটি চরিত্রের নাম নিয়ে প্রভেদ দেখা যায়। আখ্যায়িকার নায়কের নামই সব রচনাতে এক রকম নয়। নেপালে প্রাপ্ত নাটপালা এবং দুর্লভ মল্লিকের পাঁচালীতে তার নাম গোবিন্দচন্দ্র, ভবানী দাসের পাঁচালী ও উত্তরবঙ্গের ছড়াতে গোপীচাঁদ এবং সুকুর মহম্মদের পাঁচালীতে গোপীচন্দ্র। আমাদের মনে হয় মূলে রাজার নাম গোবিন্দচন্দ্রই ছিল, পরে তা 'গোপীচাঁদ' বা 'গোপীচন্দ্র' রূপ লাভ করেছে। এরকম অনুমানের কারণ, যে দুটি বাংলা রচনাতে 'গোবিন্দচন্দ্র' নাম পাই, অন্যান্য রচনায় তুলনায় সে দুটি প্রাচীনতর। শুধু তাই নয়, এদের চেয়েও প্রাচীন—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস বিষয়ক কাব্য উড়িষ্যাতে পাওয়া যায়—তাতেও রাজার

নাম গোবিন্দচন্দ্র। রাজা ছাড়া তাঁর প্রধানা মহিষীদের নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন রচনার মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়—তাদের নাম নেপালের নাটপালাতে উদনা ও পদুমা, দুর্লভ মল্লিকের পাঁচালীতে উদুনা ও পুদুনা এবং অন্যান্য রচনাতে অদুনা ও পদুনা। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মনে করেন রাণীদের নাম মূলে ছিল যথাক্রমে রোদনা ও পদ্মিনী।

খেতুর সঙ্গে রাজপরিবারের সম্পর্ক সম্বন্ধেও বিভিন্ন রচনার মতানৈক্য দেখা যায়। নেপালের নাটপালাটিতে বলা হয়েছে খেতু রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পাত্র এবং তাঁর রাণীদের বিশেষ প্রীতিভাজন। কিন্তু দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস ও সুকুর মহম্মদ রচিত পাঁচালীগুলিতে বলা হয়েছে খেতু রাজার নফর মাত্র। দুর্লভ মল্লিক বলেছেন গোবিন্দচন্দ্র তাঁর বিবাহের সময় গোলাম খেতুকে যৌতুক স্বরূপ পেয়েছিলেন,

"উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইলাম দান।
হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেতুয়া গোলাম॥"

কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়াটিতে গোপীচাঁদ জোরের সঙ্গে বলেছেন খেতু গোলাম নয়, রাণী ময়নামতীর পালিত পুত্র এবং তাঁর ভ্রাতৃতুল্য,

"গোলাম না কইস গোলাম না কইস হয় মোর ছোট ভাই।
একে দুধে পালন কৈচ্ছে ময়নামতি মাই॥"

যাহোক, এখন বিভিন্ন রচনার আলোচনা সুরু করা যেতে পারে। নেপালের নাটপালাটির রচনাকাল সবচেয়ে প্রাচীন বলে প্রথমে তার সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক্। অবশ্য নাটপালাটি এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় ডাঃ সুকুমার সেন প্রদত্ত বিবরণের মধ্যেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

এই নাটপালার মধ্যে দেখা যায় রাজার নাম 'গোপীচাঁদ' বা 'গোপীচন্দ্র' নয়—গোবিন্দচন্দ্র। অথচ নাটপালার নাম 'গোপীচন্দ্র নাটক' কেন হল, তা আমরা বুঝতে পারি না।

নাট-পালাটির কাহিনীতে কয়েক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন, এতে দেখি খেতু রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সেনাপতি হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, এবং রাণীরা তাকে প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা করছেন। অন্য কোন রচনায় এর আভাসমাত্র নেই, তাদের মধ্যে রাজার প্রতি খেতুর আন্তরিক প্রীতি ও আনুগত্য বর্ণিত হয়েছে এবং খেতুর প্রতি রাণীদের বিরাগ প্রদর্শিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য রচনাগুলিতে দেখতে পাই ময়নামতীর নির্বন্ধাতিশয্যেই গোপীচাঁদ হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগী হচ্ছেন। কিন্তু নাটপালাতে দেখি, ময়নামতী শুধুমাত্র "পুত্রকে বলিলেন, তাঁহার শুভ হইবে না। তখন গোবিন্দচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ময়নামতী বলিলেন, লোক পাঠাইয়া খুঁজিয়া পরম সিদ্ধ যোগী আনাও, তাহার উপদেশে তুমি অমর হইতে পারিবে" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন)। নাটপালাতে ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রকে যোগী হবার জন্যে চাপ দেননি, তিনি শুধুমাত্র উপদেশ দিয়েছেন, তারপর গোবিন্দচন্দ্র নিজেই গুরুর সন্ধানের ব্যবস্থা করেছে। তৃতীয়তঃ এর মধ্যে দেখা যায় যোগী হবার জন্যে গোবিন্দচন্দ্রের অসীম আগ্রহ, সিদ্ধ যোগী জালন্ধরি (হাড়িপার নামান্তর) তাঁকে নানাভাবে নিরস্ত করতে

চান, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরস্ত হন না। চতুর্থতঃ এতে বলা হয়েছে জালন্ধরি দিল্লীর রাজা ছিলেন, এটি সম্পূর্ণ নতুন তথ্য।

নাটপালার মধ্যে এমন কয়েকটি বিষয় দেখা যায়, যাদের সার্থকতা খুব সুস্পষ্ট নয়। যেমন এতে দেখি জালন্ধরি রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাছে সবিস্তারে নারীমোহের অসারতা ব্যাখ্যা করছেন। যে রাজা স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে স্ত্রী-সংসার-রাজ্য ত্যাগ করছেন, তাঁকে এরকম উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায় না। এর শেষ অংশ আরও দুর্বোধ্য। "রাজাকে বিধিমত বিভূতি-কন্থা-শৃঙ্গ-পাত্র-যষ্টি-মৃগচর্ম ইত্যাদি দান করা হইল। তাঁহার নাম হইল 'শৃঙ্গা।রয়া'। তাহার পর 'কুটুম্বযাত্রা' করিতে রাজা স্বগৃহে ভিক্ষা মাগিতে আসিলেন। ভিক্ষা দিতে গিয়া রাণীরা রাজাকে চিনিতে পারিল, বলিল,

কাহের তরে রাউল মুড়ায়িল মাথা
কাহের তরে রাউল গলে দিল কাঁথা।
হাথ পাও দেখো যোগী পদুমের ফুল
তুন্ধে যোগী আমি দেখিল রাজা সমতুল।

রাজা গুরুর নিকট ফিরিয়া গিয়া জানাইলেন যে উদনা-পদুমা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। জালন্ধরি তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে আজ্ঞা দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণে চলিয়া গেলেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)

এই পরিণাম সম্পূর্ণ আকস্মিক। বহু বাধা জয় করে গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাসী হওয়ার পর এত তুচ্ছ কারণে গুরু তাঁকে ঘরে ফিরতে আজ্ঞা দিলেন কেন, তা আমরা বুঝতে পারি না। যোগী হলে যে আত্মীয়স্বজনরা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাবে, এমন অসম্ভব ব্যাপার কল্পনা করা যায় না, আর ভুলে না গেলে সন্ন্যাস ত্যাগ করে যোগীকে সংসারে ফিরতে হবে, এও অদ্ভুত বিধান; তাছাড়া আগে এরকম সর্তের কোন আভাসই দেওয়া হয়নি। রাজার এত সাড়ম্বরে সন্ন্যাস গ্রহণের পরক্ষণেই গুরু এরকম আজ্ঞা দেওয়ায় সমস্ত ব্যাপারটা 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র মত হয়ে গেছে।

কাহিনীর অফুরন্ত নাট্যসম্ভাবনার প্রায় কিছুই আলোচ্য নাটপালাতে চরিতার্থ হয়নি। তবে এতে কাহিনীর বিকাশ বেশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। চরিত্রগুলির মধ্যে কেউই খুব একটা অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে ওঠেনি, কেবলমাত্র খেতু অন্য বাংলা রচনাগুলির তুলনায় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। তার বিশ্বাসঘাতকতা নাটপালাতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ময়নামতীর স্থান অত্যন্ত গৌণ, ছেলেকে যোগী হবার উপদেশ দিয়েই তিনি অন্তরালে সরে গেছেন; এর পরে একবার মাত্র তাঁর উল্লেখ পাই, গোবিন্দচন্দ্রের মাথা মুড়োনোর বর্ণনা দেবার সময় বলা হয়েছে, "মা ময়নাবতী কান্দে অন্তঃপুরে।"

গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের সময় তাঁর রাণীদের আকুতি ও অনুনয়ের যে বর্ণনা নাটপালাতে পাই, তা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী হয়েছে। প্রথমে রাণীরা গুরুকে ভর্ৎসনা করল, গুরু ভর্ৎসনায় উত্তেজিত হয়ে তাদের শাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন রাজা নিজে তত্ত্বকথা বলে তাঁর সন্ন্যাস-গ্রহণের যৌক্তিকতা রাণীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। রাণীরা তখন উপায়ান্তর না দেখে গুরুকে কাতরভাবে মিনতি করে বলল,

"গুরু হে মোরা ধরমের ভারি
রাজা মোর দেহ বাহুড়ায়ি।
নেত পাট দিব কন্থা
মণি মুকুতা দিব গান্থা।
গুরু হে ষোড়শ-বরিষ মোর হিয়া
পঁচিশ-বরিষ মোর পিয়া।
তে বিধি কএল মিলাই
হৃদয়ন দেহ মোর সায়ি।"

কিন্তু এত মিনতিতেও যখন কোন ফল হল না, তখন রাণীরা রাজাকে ঘরে থাকার সুখসুবিধার কথা বলে তাঁর মতি পরিবর্তনের চেষ্টা করল,

"প্রভাতে বিহান হৈলে ঘৃত অন্ন জোগাইব
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিব পানী
সুয়িবাকে শয্যা দিব এ খাটপালঙ্কে রে
যোগী হৈয়া কোন্ সুখ জানি।"

রাজাকে তারা বলল, "তুমি ঘরে থাক, আমরা তোমার হয়ে ভিক্ষা মেগে বেড়াব।"

রাজা তাদের কথায় কর্ণপাত না করে গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। রাণীরা আবার তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল, সে চেষ্টাও নিষ্ফল হল। রাজা সংসার ত্যাগের পূর্বাহ্নের করণীয় কাজ সমস্তই সম্পন্ন করলেন। তারপর নাপিত ডেকে মাথা মুড়োলেন। তাঁর মাথা মুড়োনোর সময়

"পায় ধরি কাঁদে উদনা সুন্দরী
না মুড়াহ মাথা গোঁসাই না ধরহ কড়ি।"

জালন্ধরি রাজাকে নিয়ে গেলে রাণীরা তাঁকে 'চণ্ডাল' বলে গাল দিয়েছে।

নাটপালার পরে পাঁচালীগুলির কথা আসছে। পাঁচালীগুলির মধ্যে দুর্লভ মল্লিক বিরচিত "গোবিন্দচন্দ্রের গীত" সর্বাগ্রে আলোচ্য।

দুর্লভ মল্লিকের অনুসৃত কাহিনীর বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এই। প্রথমতঃ এর মধ্যে হাড়িপার সঙ্গে ময়নামতীর প্রথম পরিচয় বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে রাজা মাণিক-চন্দ্রের মৃত্যু এবং তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ময়নামতীর ব্যর্থ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে গল্পটি পাই, সেটি অন্যান্য রচনার তুলনায় একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের। এর মূলে মনসামঙ্গলের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। তৃতীয়তঃ অন্যান্য পাঁচালীতে এবং উত্তর বঙ্গের ছড়ায় বলা হয়েছে, গোপীচাঁদের অদৃষ্টের লিখন ছিল যে, যোগী না হলে তাঁর উনিশ বছর বয়সে মৃত্যু ঘটবে; এই দুর্দৈব এড়াবার জন্যে ময়নামতী তাঁকে যোগসাধনা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্লভ মল্লিকের রচনায় সেরকম কোন কথা পাই না; এতে দেখানো হয়েছে ময়নামতী নিজে যোগী এবং যোগের মাহাত্ম্য তিনি জানেন বলে ছেলেকে সন্ন্যাসী করতে চান। চতুর্থতঃ গোরক্ষ-বিজয়ে এবং গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা পর্যায়ের অন্যান্য রচনায় বলা হয়েছে, দেবী গৌরীর রূপে মুগ্ধ হওয়াতে

হাড়িপা এবং অন্যান্য সিদ্ধার উপর দেবীর অভিশাপ পতিত হয়েছিল, যার ফলে তাঁরা হীনদশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্লভ মল্লিক ময়নামতীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন হাড়িপার পতন হয়েছিল গুরুর শাপে; গৌরীর ছলনা সম্বন্ধে কোন কথা দুর্লভ মল্লিকের রচনায় নেই। পঞ্চমতঃ অন্য সব রচনায় দেখা যায় গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হয়ে ঝুলির ভিতর অর্থ নিয়ে গেছলেন বলে গুরু হাড়িপা তাঁকে শিক্ষা দেবার জন্যে হীরা নটীর দাস করে দিয়েছিলেন, 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'এ দেখি হাড়িপা কোন কারণ ব্যতীতই গোবিন্দচন্দ্রকে হীরার কাছে বাঁধা রাখছেন। ষষ্ঠতঃ অন্য রচনাগুলিতে দেখা যায় শুক-সারী যখন রাণীদের চিঠি নিয়ে বেশ্যার ঘরে বন্দী গোপীচাঁদের কাছে এল তখন গোপীচাঁদ রাণীদের কাছে মিথ্যা কথা লিখে মাকে আসল কথা জানিয়ে চিঠি দিলেন, কিন্তু এতে দেখি গোবিন্দচন্দ্র রাণীদের কাছেই সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে চিঠি দিচ্ছেন। সপ্তমতঃ এতে বলা হয়েছে কানুপা হাড়িপার সমাধিভঙ্গের সময় তাঁর সামনে সোনার পুতুল রেখে গোবিন্দচন্দ্রকে হাড়িপার ক্রোধশান্তি থেকে বাঁচিয়েছিলেন; এই বিষয়টি নাটপালা, ছড়া বা ভবানীদাসের রচনায় পাওয়া যায় না। সুকুর মহম্মদের রচনায় পাওয়া যায়, তবে তার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। অষ্টমতঃ, 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'এ কাহিনী নিশ্চিতরূপে বিয়োগান্ত। রাজার সংসারে ফেরার সমস্ত সম্ভাবনাই এর মধ্যে নির্মূল করা হয়েছে।

এই স্বাতন্ত্র্যই 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'কে আকর্ষণীয় করেছে। কাহিনীর সুষমাও এতে অনেক বেড়ে গিয়েছে। অন্যান্য পাঁচালীতে এবং উত্তর বঙ্গের ছড়ায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণ আমাদের মনে কারুণ্যের উদ্রেক করে, কিন্তু এর পিছনে তাঁর ভবিতব্যের ইতিহাস থাকায় এই কারুণ্য লঘু ও ফিকে হয়ে যায়। গোপীচাঁদের স্বাভাবিক পরমায়ু মাত্র উনিশ বছর, যোগী হওয়াই তাঁর পক্ষে দীর্ঘজীবন লাভের একমাত্র উপায়, এই বিষয়টি আমাদের কাছে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণকে সহনীয় করে, মনে হয় এ সন্ন্যাসগ্রহণ দুটি সংকটের মধ্যে মৃদুতর (lesser of the two evils)-কে বেছে নেওয়া। 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' এই অদৃষ্টের লিখনের বিন্দুমাত্র আভাস না থাকার ফলে এর মধ্যে করুণরসের গাঢ়তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নবপরিণীত তরুণ রাজা মধুমাখা সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এই করুণ দৃশ্য আমাদের মনকে বেদনায় অভিভূত করে। রাণী ময়নামতী জোর করে গোপীচাঁদের মতি পরিবর্তন করানোতে আমাদের মনে একটা অস্ফুট আক্ষেপ জেগে ওঠে, যোগী হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ অমরত্ব ও অলৌকিক মাহাত্ম্য লাভের আশ্বাস আমাদের হৃদয়ে কোনই রেখাপাত করতে পারে না। বেশ্যার ঘরে বিনা কারণে বন্দী গোবিন্দচন্দ্রের দুঃখ আমাদের মনে নিবিড়তর ছায়াপাত করে এবং কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতি সমস্ত করুণরসকে ঘনীভূত করে তোলে।

গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের মধ্যে যে বেদনার ভাব রয়েছে তা দুর্লভ মল্লিকের কবিমনকে স্পর্শ করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর রচনায় দেখি, যমদূতেরও রাণীদের কাছ থেকে গোবিন্দচন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করতে মায়া হয়েছে,

"রাজা রাণী দেখি দুত কান্দিয়া ফাফর।
কেমনে ভাঙ্গিব জোড় দেখি নাগে ডর॥

রাজা রাণি নিবিড় খোপের কবুতর।
কি জানি কি হবে বল্যা কাপে কলেবর ॥
মোহেতে মুহিত হৃত জায় পলাইয়া।"

দুর্লভ মল্লিকের কাব্যে গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং করুণরসমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠেছে। তার মন সংসারের মায়ায় বাঁধা, তরুণী রাণীদের প্রেম তার হৃদয়কে অভিভূত করে রেখেছে। এ অবস্থায় মা যখন সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বললেন, তখন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, মাকে সে বলল,

"করিবে আমারে জোগি যদি ছিল মনে।
উদুনা পুদুনা তবে বিভা দিলে কেনে ॥
উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইলাম দান।
হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেতুয়া গোলাম ॥
অন্য লোকের মায়ে বলে আসির্ব্বাদ করি।
চণ্ডাল জননি বলে হও দিসান্তরি ॥
সোলো দন্তের রাজা আমি বঙ্গ অধিকারি।
কেমনে হইতে বল নাছের ভিখারী ॥"

গোবিন্দচন্দ্র একবার হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, আবার পরিত্যাগ করেছে, আবার গ্রহণ করেছে, আবার পরিত্যাগ করেছে। স্বেচ্ছায় সাগ্রহে সে কোন সময়ই হাড়িপার শিষ্যত্ব নেয়নি। প্রথমবার নিষ্ঠুর জননীর শাসনে, প্রাণ যাবার ভয়ে সে রাজী হয়েছিল। মার প্রতি তার ক্ষোভ কোনো সময়ই যায়নি। হীরা বেশ্যার ঘরে বন্দী অবস্থায় রাণীদের পত্র পেয়ে সে বলেছিল, "এত দুঃখ দিল মোরে ময়নামত্রি মাই।" যে মা তাকে এত কষ্ট দিয়েছেন, তাকে সে চিঠি পাঠায়নি, প্রেমময়ী স্ত্রীদেরই চিঠি দিয়েছে। এই সমস্ত মিলে তার চরিত্র স্বাভাবিকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য বিষয়েও গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে মানবোচিত বৈশিষ্ট্য ফুটেছে। যেমন, ময়নামতীর পরীক্ষা নেবার সময়ে গোবিন্দচন্দ্রের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সে বলেছে,

"তোমারে পোড়াব মাতা অপযস লোকে।
কুকর্ম্ম করিয়া আমি মজিব নরকে ॥"

ময়নামতীর ধর্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং দুর্জয় ব্যক্তিত্ব দুর্লভ মল্লিক নিপুণ ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ছেলেকে যোগী করবার জন্যে ময়নামতী যমকে দিয়ে সাময়িকভাবে গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণহরণ করাতেও দ্বিধাবোধ করেননি। যমদূতেরও গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি করুণা হয়েছে, কিন্তু ময়নামতীর মন টলেনি। যমদূত তাঁর আদেশপালন না করায় তিনি তাকে ধরেছেন। তখন

"জমদুত বলে মাতা নিবেদন করি।
গোবিন্দচন্দ্র দেখ্যা মোহে আপনা পাসুরি ॥"

যমদূতের দয়াকে ব্যঙ্গ করে ময়নামতী যা বললেন, তাতে তাঁর হৃদয়হীনতা প্রকাশ পেলেও আর একটি ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হয়েছে,

"ময়নামন্ত্রি বলে বেটা কত যান মায়া।
কভু নাহি জমের স্বরিরে আছে দয়া ॥
তোর জম মোর পতি লইলে কেমনে।
আমারে দেখিয়া তবে দয়া নইল কেনে ॥
প্রথম যৌবনেতে জুবতি কর রাড়ি।
দুগ্ধের ছাওয়ালে রাখি মায়ে আন কাড়ি ॥"

এই উক্তিটি পড়ে মনে হয়, অকালবৈধব্য ময়নামতীকে নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণা করে তুলেছে।

অন্যান্য রচনাতে হাড়িপা অশরীরী ছায়ার মতো। দুর্লভ মল্লিকের হাতে পড়ে হাড়িপা প্রাণস্পন্দন লাভ করেছেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির। তাঁর চরিত্র গুরুরই মত। প্রথম অনুরোধেই তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে দীক্ষা দিতে রাজী হন নি, তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা না করে শিষ্য করতে তিনি চান নি। তিনি একটু অন্যমনস্ক স্বভাবের, গোবিন্দচন্দ্রকে হীরা নটীর কাছে বাঁধা দিয়ে তাকে উদ্ধার করার কথা আর তাঁর মনে নেই। সম্ভবতঃ এই অন্যমনস্কতার জন্যই গোবিন্দচন্দ্র যখন তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করল, তখন যোগবিভূতির সাহায্যে সমাধি থেকে বেরিয়ে আসার কথা তাঁর মনে পড়েনি। হাড়িপার চরিত্রে মানবোচিত দয়াদাক্ষিণ্যেরও পরিচয় পাই। গোবিন্দচন্দ্রের সংসার ত্যাগের সময় রাণীদের কাতর ক্রন্দনে তাঁর মন বিগলিত হয়েছে, দয়ার্দ্র হয়ে তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে সংসারে ফিরে যেতে বলেছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের রাণী উদুনা ও পুদুনার চরিত্র দুর্লভ মল্লিক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে এঁকেছেন। অন্যান্য কবির মতো তিনিও এই পতিবিচ্ছেদবিধুরা অভাগিনীদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বর্ষণ করেছেন। উদুনা-পুদুনার পতিভক্তি এত গভীর যে স্বামীকে তারা বলেছে,

"তোমারে লইতে জম আসিবে জখন।
তোমার বদলে মোরা জাব একজন ॥"

গোবিন্দচন্দ্র যখন তাদের খেতুকে পতিরূপে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন, তখন

"রাণী বলে হায় হায় কহ একি কথা।
তোমার মনে নহে বুঝি মোরা পতিব্রতা ॥
নারী দোচারিণীর পুরুষ সিদ্ধ নয়।
স্বামীর অর্দ্ধ অঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥"

গোবিন্দচন্দ্র যোগবলে তাদের পাথরে পরিণত করা পর্যন্ত তারা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি।

উদুনার চরিত্রে পতিপ্রেম ভিন্ন নারীসুলভ অন্য বৃত্তিরও স্ফুরণ দেখা যায়। শিশুযোগিবেশী কানুফাকে দেখে উদুনার মনে বাৎসল্যের সঞ্চার হয়েছে। তাকে সে অবিলম্বে মুক্তি দিয়েছে।

কাহিনী ও চরিত্রের দিক দিয়ে যেমন, অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও তেমনি কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দুর্লভ মল্লিকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। তাঁর পাঁচালীর মধ্যে অনেক জায়গাতেই প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় মেলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই অংশটি উদ্ধৃত করতে পারি,

"ঘর হইল বাহির বাহির হইল বন।
আপনার বৈরি হইল আপন জৌবন ॥"

দু এক জায়গায় প্রবচন ব্যবহার করে দুর্লভ মল্লিক সুকৌশলে সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অনেকখানি ভাব ব্যঞ্জিত করেছেন; যেমন

"ছয় মাসের পথ হয় শ্রবণ নয়ান।"

অলঙ্কার সৃষ্টিতেও কবি অনেক জায়গায় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। রানী উদুনার একটি উক্তির মধ্যে নিদর্শনা অলঙ্কারের সুন্দর উদাহরণ মেলে,

"রানি বলে সূর্য্য বিনে দিবস মলিন।
জল বিহনে সোভা নাহি পায়ে মিন ॥
বিনি সাড়ে নাহি সোভে গোঠ মধ্যে ধেনু।
সংসার আন্ধার হয় না থাকিলে ভানু ॥
মৎস্যরাঙা মৎস্য ধর্যা জলে বস্যা খায়।
পায়রি পায়রা খোপে মধুরস গায় ॥
ভ্রমরা ভ্রমরি সুখে করে মধুপান।
পুরুষ জুবতি দুহে একই পরাণ ॥"

গোবিন্দচন্দ্রের একটি উক্তির মধ্যে দিয়ে নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে কাব্যের আবহাওয়াও সৃষ্টি হয়েছে। উক্তিটি অত্যন্ত দীর্ঘ। আমরা তার একাংশ উদ্ধৃত করছি,

"বৃক্ষের এক পত্র বরিষে এক ধারা।
এক বালি নদীতে আকাযে এক তারা ॥
আপনি জলস্থল আপনি আকায।
আপনি জল সূর্য জগত প্রকায ॥
দিবানিশি অরুণ বরুণ কোথা আর।
প্রলয় সংসার দেখ তনু-আপনার ॥
মরণ সদাই সত্য জিবনে কি আযা।
পরান পুতলির হয় হাড়ে চক্ষে বাসা ॥"

'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'-এ কাহিনীটি যে ভাবে অনুস্যূত হয়েছে, তার মধ্যে নাটকীয় উপাদানের প্রাচুর্য রয়েছে। কাহিনীটির রূপায়ণেও কবি কতকটা নাটকীয় রীতি অনুসরণ করেছেন। 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত'-এর অধিকাংশই বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপ, কবির নিজের বর্ণনা খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

দুর্লভ মল্লিক রাঢ়ের লোক। তাঁর রচনাতেও রাঢ়ী উপভাষার প্রভাবের নিদর্শন দেখা যায়। যেমন,

"মোর পতি অবিলম্বে ঝাট দেহ আনি।"

কোথাও কোথাও দু একটি হিন্দী শব্দের সাক্ষাত পাই যেমন, "সুনিয়া কহেন গঙ্গা যুন ময়না বাই।"

দুর্লভ মল্লিক খাঁটি নাথপন্থী ছিলেন না। তিনি কাব্যের প্রথমেই ধর্মঠাকুরের বন্দনা করেছেন। 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতে' একজায়গায় একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে ব্রহ্মহত্যা সবচেয়ে বড় পাপ এবং ব্রাহ্মণসেবা সবচেয়ে বড় পুণ্য। নৈষ্ঠিক নাথপন্থীর মধ্যে এতখানি দ্বিজভক্তি আশা করা যায় না।

অতঃপর ভবানীদাসের রচনাটির আলোচনা করা যেতে পারে। ভবানীদাস তাঁর ভণিতায় নিজের রচনাকে "অপূর্ব্ব কথন" নামে অভিহিত করেছেন। আধুনিক গবেষকরা এই 'কথনে'র অপূর্বত্ব স্বীকার করতে অনিচ্ছুক বলেই হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্, তাকে 'ময়নামতীর গান,' 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' প্রভৃতি নাম দিয়ে প্রকাশিত করেছেন।

ভবানীদাসের রচনায় কাহিনীর কতকগুলি পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন, এতে বলা হয়েছে গোপীচাঁদ জনৈক উড়িয়া রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ভবানীদাস অদুনা ও পদুনা ছাড়া রতনমালা ও কাঞ্চাসোণা নামে গোপীচাঁদের আরও দুজন মহিষীর নাম করেছেন।

ভবানীদাসের ভাষা অত্যন্ত গ্রাম্য। রচনার মধ্যে দু এক জায়গা ভিন্ন আর কোথাও কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈশিষ্ট্যসূচক অংশগুলির মধ্যে গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের সময় তাঁর রাণীদের মিনতি সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে যথেষ্ট করুণরস স্ফূর্ত হয়েছে,

"কান্দএ অদুনা নারী কান্দএ পদুনা।
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চাসোনা ॥
...
চারি নারী কান্দে রাজার গলাএ ধরিয়া।
মৈনামতি বোলে তুমি জাবে যোগী হৈয়া ॥
জে দেশে জাইবা প্রিয়া সে দেশে জাইব।
ধরিয়া যোগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব ॥
...
এক সন্ধ্যা রান্ধি ভাত দুই সন্ধ্যা খিলাএমু।
হাটিতে নারিলে রাজা কোলে করি লইমু ॥"

এরপর, রাণী অদুনা যেখানে রাজার সঙ্গে তাঁর বাল্যকালের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে রস গাঢ়তা লাভ করেছে,

"তুমি সাত আমি পাচ এমত কালের বিয়া।
হীরা মন মাণিক্য মুক্তা লক্ষ দান দিয়া ॥"
...
সকল ছাড়িয়া আইল ভগ্নী এ আমার।
ছোট কালের বন্ধু মোরা জানিয় তোমার ॥"

রাণীর আকুতির এই অংশটির সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর সাদৃশ্য অনুভব করা যায়,

জোড় মন্দির ঘরে নিয়া রূপ রঙ্গ চাএলা।
এহেন দয়ার বন্ধু কি দোসে ছাড়িলা ॥

হেন প্রিয়া ছাড়ি কেনে বিদেশে চলিলা ॥
তোমার আমার নষ্ট কৈল জেই জন।
নষ্ট করুক তার প্রভু নিরঞ্জন ॥"

রাণীর আর একটি উক্তির মধ্যেও কবিত্বের স্পর্শ আছে। উক্তিটি এই,

"রঙ্গমালা পুষ্প ফলে ভাঙ্গি পড়ে ডাল।
নারী হইয়া যৌবন রাখিব কথকাল ॥
কতকাল রাখিবে যৌবন আঞ্চলে বান্ধিয়া।
বাহের হইল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া ॥
নেতে বান্ধিলে যৌবন নেতে হৈব ক্ষয়।
প্রথম যৌবন গেলে কেহ কার নয় ॥"

হীরার ঘরে বন্দী গোপীচাঁদ যখন শুক-সারী মারফত মাকে তাঁর অসহ্য দুর্ভোগের কথা জানালেন, তখন ময়নামতী সেই বার্তা পেয়ে যে বিলাপ করতে লাগলেন, তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে,

"গোপাল রে।
নীলমণি গেল বনে কত উঠে মাএর মনে
গোপাল রে বেলাত অধিক হইয়া যায়।
আসিব আসিব করি মাএ রৈলাম পন্থ হেরি
কোন বনে বাছুরি চরাএ ॥
খেড়ুয়াল রাখওাল সনে বিবাদ না করিয় বনে
তোমি আমার অসময়ের ভরশা ॥
কান্দে সতি মৈনামতি পুত্র শোক পাইয়া অতি
আহে পুত্র গেলা কোন্ দেশ।
অভাগী মাএর মনে দিবা রাত্রি পোড়ে বনে
আমা ছাড়ি গেলা কোন্ দেশ ॥"

এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে ভবানীদাসের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। নাথসাহিত্যের অন্য কোন রচনায় এত বেশী বৈষ্ণব প্রভাবের নিদর্শন মেলে না। ভবানীদাসের রচনায় এক জায়গায় চৈতন্যদেবের নামও পাওয়া যায়। গোপীচাঁদ তার মাকে বলছে,

"কেশব ভারতী গুরু কোথা হতে আইল।
কিবা মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল ॥"

করুণরস ভিন্ন অন্য রসের নিদর্শনও ভবানীদাসের রচনায় মেলে। এখানে কৌতুকরসপূর্ণ একটি অংশের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ময়নামতী যখন তাঁর পরীক্ষার সময় মৃত্যুর ভাণ করে পড়ে ছিলেন, বধূয়া তাঁকে কূপে ফেলে দিতে গেল। এত ঐশী বিভূতির অধিকারী হওয়া সত্বেও ময়নামতী

"কুণ্ডের নিকটে গিয়া আড়চৌক্ষে দেখে।
এহাতে পড়িলে জমে কোন রূপে রাখে॥
বান্ধিয়া মারিলে আমি কি করে জমেরে।
ব্রহ্মজ্ঞানে কি করিব কুণ্ডের ভিতরে॥"

এই অংশটি পড়ে আমাদের হাসির নির্ঝর অর্গলমুক্ত হয়, সেই সঙ্গে মনে হয়, নাথসিদ্ধাদের অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কবির দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব ছিল।

ভবানীদাসের পাঁচালীতে এক জায়গায় অদুনা বলেছে, "সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর।" এর থেকে বোঝা যায়, কায়স্থ জাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে সেকালের সমাজে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল। আর জ্ঞানীর চরম বলে গণ্য করা হত টেঁপা মাছকে। কারণ গোপীচাঁদ ময়নামতীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বলেছে, "টেঁপা মৎস্যের জ্ঞান তোমার ধড়ের ভিতর।"

ভবানীদাসের ভাষা গ্রাম্য হলেও দু এক জায়গায় তার মধ্যে চিত্তাকর্ষক বাক্‌ভঙ্গীর নিদর্শন মেলে। যেমন ময়নামতীর একটি উক্তি—"বৈস বৈস গুপিচান্দ বাটার পান খাও।" এটি একটি চমৎকার শ্লেষাত্মক উক্তি—"এস এস বাছা পথে এস"র অনুরূপ। ভবানীদাসের ভাষায় মুসলমানী প্রভাব যথেষ্ট আছে। মুসলমান গায়েন ও লিপিকরের হস্তক্ষেপই তার জন্যে দায়ী বলে মনে হয়।

ভবানীদাসের রচনার সমস্ত পুঁথিই আদি ও অন্তে খণ্ডিত। যেটুকু অংশ আমাদের হস্তগত হয়েছে, তার আরম্ভ অত্যন্ত অসংলগ্ন। হস্তিনী, শঙ্খিনী, পদ্মিনী ও চিত্রানী এই চার জাতীয়া নারীর বর্ণনা পরপর দু'বার করার সার্থকতা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি পদ্মিনীর বদলে চিত্রানীকে শ্রেষ্ঠ জাতীয়া নারী বলাতে রচয়িতার শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব প্রকটিত হয়েছে।

সুকুর মহম্মদের রচনার প্রকৃত নাম কি তা জানা যায় না। রচনার মধ্যে কবি নানাভাবে ভণিতা দিয়েছেন, যেমন

(১) "সুকুর মামুদে ভণে অপূর্ব কাহিনী।"
(২) "সুকুর মামুদ কহে হাড়িফার মায়া ছন্দ।"
(৩) "সুকুর মামুদে কয় রাণীর করুণা।"
(৪) "সুকুর মামুদে কয় রাজার সন্ন্যাস।"

নানা কারণে সুকুরের গ্রন্থ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' নামেই সাধারণে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই বইয়ের আসল নাম "যোগান্ত পুঁথি" বা "যোগীর পুঁথি"। রচনার প্রথম অংশে কবি বলেছেন, "লিখিলাম যোগান্ত পুঁথি পয়ারে রচিয়া।" বটতলা থেকে প্রকাশিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত সংস্করণের শেষেও লেখা রয়েছে "ইতি যোগীর পুঁথি সমাপ্ত।"

সুকুরের অনুসৃত কাহিনীতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন অদুনা ও পদুনা হরিচন্দ্র রাজার মেয়ে, এবং গোপীচাঁদের আরও দুজন স্ত্রী ছিলেন—নেহালচন্দ্র রাজার মেয়ে ফন্দনা এবং মহীচন্দ্র (বা মহেশচন্দ্র) রাজার মেয়ে চন্দনা। দ্বিতীয়ত অন্য সমস্ত রচনার মতো এতে গোপীচাঁদের জন্মের আগে বা তাঁর অতি শৈশবে তার পিতা মাণিকচাঁদের মৃত্যু দেখানো হয়নি,

এখানে দেখি গোপীচাঁদের বিবাহ দিয়ে তিনি পরলোকগমন করেছেন। তৃতীয়তঃ এতে গোপীচাঁদের নিজের মা ময়নামতীকে পরীক্ষা করার কোন কথা নেই, তার বদলে রাণীদের হাড়িপাকে বিষপ্রয়োগ এবং হাড়িপার বিষ পরিপাকের একটি কাহিনী রয়েছে। চতুর্থতঃ, যে দেবীর অভিশাপে হাড়িপার পতন হয়েছিল, তিনি যে গোরক্ষনাথকেও শাপ দিয়েছিলেন, এই কথা সমগ্র নাথসাহিত্যের মধ্যে একমাত্র এখানেই পাচ্ছি। পঞ্চমতঃ এতে বলা হয়েছে কাহ্নপা হাড়িপার সামনে গোপীচাঁদের বদলে স্বুবর্ণ-পুত্তলিকা রাখাতে হাড়িপা তাঁকে মৃত্যুশাপ দিলেন। ষষ্ঠতঃ হীরা বেশ্যার নামটি স্বুকুরের হাতে পরিবর্তিত হয়ে 'স্বুলোচনা বেশ্যা'তে দাঁড়িয়েছে।

স্বুকুরের অঙ্কিত প্রত্যেকটি চরিত্রই বেশ স্বাভাবিক হয়েছে। তাঁর রচনায় রাজা মাণিকচন্দ্রের অংশ অন্যান্য রচনার মত গৌণ নয়। রচনার প্রথম অংশে তিনি বেশ প্রাধান্য লাভ করেছেন। মাণিকচন্দ্র পুত্রগতপ্রাণ পিতা এবং স্ত্রীর ভয়ে ভীত ব্যক্তিত্বহীন স্বামী। প্রত্যেক পিতার মতো তাঁরও অন্তরের আকাঙ্খা—ছেলেকে সংসারী করা—তাকে সংসারধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া। কিন্তু তাঁর আকাঙ্খা সিদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধক স্বয়ং রাণী—ছেলের মা।

"রাজা বলে সংসারে আমার দোসর নাই।
সবে এক পুত্র মোকে দিয়াছেন গোঁসাই ॥
আমি অভাবে রাজা হবে ময়নামন্ত্রি রাই।
পুত্রেক করিবে আমার কতেক দুর্গতিই ॥
যুগী করিয়া কি পাঠাবে দেশান্তরে।
পুত্রেক না বসাইবে রাজপাটের উপরে ॥"

এইজন্যে তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই গোপীচাঁদের বিয়ে দিয়ে যেতে চান। গোপীচাঁদ নিতান্ত অল্পবয়স্ক হলেও তিনি তাই তার বিয়ের আয়োজন করলেন—স্ত্রীকে কিছু না জানিয়ে। ময়নামতী যখন ধ্যানে সমাধিস্থ, তখন গোপীচাঁদের বিয়ে হল। বাজনদারেরা বাজনা বাজাতে গেল, কিন্তু রাণীর ভয়ে মাণিকচাঁদ তাদের বাজাতে নিষেধ করলেন। স্ত্রীর ভয়ে তিনি তটস্থ। শক্তিমতী স্ত্রীকে অনেক স্বামীই এমনি ভয় করেন। যোগী না হলে গোপীচাঁদের আঠার বছর বয়সে মৃত্যু ঘটবে—এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে মাণিকচাঁদ সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতেন না।

এই রচনার ময়নামতী একটু অদ্ভুত ধরণের চরিত্র। যদিও রচনার শুরুতেই কবি "স্বামীপরায়ণ তিনি অতিশয় সতী" বলে ময়নামতীর পরিচয় দিয়েছেন, তবু সারা রচনার মধ্যে তাঁর পতিভক্তির চেয়ে পতিদ্রোহিতার নিদর্শনই বেশী মেলে। হিন্দু স্ত্রী হয়ে তিনি স্বামীর মৃত্যু কামনা করতে দ্বিধা বোধ করেন না। স্বুকুর লিখেছেন,

"ভাবিতে লাগিল মুনি (ময়নামতী) আপনার মনে।
বৃথায় করিলাম বাদ যম রাজার সনে ॥
যমের সঙ্গে বাদ করিয়া স্বামী রাখিলাম।
স্বামীকে রাখিয়া আমি পুত্র হারাইলাম ॥

যদি মাণিকচন্দ্র রাজা যাইত মরিয়া।
তবে পুত্র গোপীচন্দ্র না করিত বিয়া॥
যদি কোন দিন রাজা মাণিকচন্দ্র মরে।
যুগী করিব পুত্র পাঠাব দেশান্তরে॥"

'যমের সঙ্গে বাদ করিয়া স্বামী রাখিলাম' কথাটির পিছনে একটু ইতিহাস আছে। ইতিহাসটুকু ময়নামতী নিজেই গোপীচাঁদের কাছে বলেছেন। মাণিকচাঁদ যখন ময়নামতীকে বিয়ে করেন, তখন ময়নামতী বিবাহ-বাসরে স্বামীর পরমায়ু গণনা করেন, যদিও তখন তিনি মাত্র সাত বছরের বালিকা। গণনা করে তিনি দেখেন, স্বামীর স্বাভাবিক পরমায়ু মাত্র ষোল বছর। তখন যোগবলে তিনি স্বামীকে একশ বছর জীবিত রাখেন। কিন্তু এই ইতিহাস শোনার পরও আমরা ময়নামতীর বিরুদ্ধে পতিদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে পারি না। কারণ ময়নামতী স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য মাত্র ততক্ষণই চেষ্টা করেছেন, যতক্ষণ তিনি তাঁর স্বার্থসিদ্ধির প্রতিবন্ধক হননি। প্রতিবন্ধক হবামাত্র তিনি প্রকাশ্যভাবে পতির মৃত্যুকামনা করেছেন। এমন কি, স্বামী যখন সত্যি সত্যি পরলোকগমন করলেন তখন তিনি আনন্দিত হলেন,

"যোড় হাতে কহে খেতু মুনির হুজুর।
মুছিয়া ফেলাও তোমার সিতের সিন্দুর॥
মৃকুলে মরিল তোমার স্বামী মাণিকচন্দ্র।
শুনিয়া মুনির তখন হইল আনন্দ।"

এই বিসদৃশ আচরণের জন্য আমাদের ময়নামতী চরিত্রকে অত্যন্ত সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হয়। কবি এখানে দেখাতে চান, ময়নামতী প্রকৃত ধর্মপ্রাণা এবং পুত্রপ্রাণা নারী—স্বধর্মনিষ্ঠা এবং পুত্রের কল্যাণচিন্তাই তার কাছে সবচেয়ে বড়, স্বামী যদি ধর্মের শত্রু হয় এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে তাহলে স্বামীকেও সে হাসিমুখে বিসর্জন দিতে পারে। অন্যান্য রচনায় ময়নামতীর নাথসিদ্ধাসত্তাটি পূর্ণভাবে রূপায়িত করা হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার পতিভক্তিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সুকুরের রচনায় ময়নামতী-চরিত্রের শেষোক্ত দিক একেবারে দেখানো হয়নি, বরং তার বিপরীতই দেখানো হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, অন্য সব রচনাগুলি হিন্দু কবির লেখনীনিঃসৃত। তাঁরা সহজাত সংস্কারের বশে ময়নামতীর ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পতিভক্তিও দেখিয়েছেন। কিন্তু মুসলমান কবির মনে অনুরূপ কোন সংস্কার না থাকায় তিনি ময়নামতীকে পুরোপুরি পতিভক্তিহীনা ধর্মপ্রাণা করে এঁকেছেন। এই দিক দিয়ে সুকুরের অঙ্কিত ময়নামতী কতকটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের যোধপুরী বেগমের মত হয়েছে।

সুকুরের হাতে গোপীচাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হয়েছে। একদিকে সুখ ও মৃত্যু, অপরদিকে দীর্ঘজীবন ও দুঃখকষ্ট—এই উভয়সংকটের মাঝখানে পড়ে তার চিত্তের দোলায়িত ভাব বেশ ফুটে উঠেছে। তাঁর মা যখন তাকে সমস্ত সুখভোগ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে বললেন, তখন গোপীচাঁদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল,

"রাজা বলে শুন মা ময়নামত্রি রাই।
নিশ্চয় জানিলাম তোমার পুত্রের দয়া নাই॥
অন্যের মায়ে বলে বাছা দুগ্ধে অন্ন খাও।
তু মাও সদাই বল যোগী হয়া যাও॥
যোগী হয়ে যাব মা কি ধন পাব নিধি।
এ সুখ সম্পদ কালে মা বাম হৈল বিধি॥
মা হয়ে সদাই বল হইতে দেশান্তরী।
পিতা মোরে দিল বিয়া এ চারি সুন্দরী॥"

গোপীচাঁদের অসহায় অবস্থা এই উক্তির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত করুণভাবে ফুটে উঠেছে।

তবে গোপীচাঁদ যে অত্যন্ত দুর্বলপ্রকৃতির, কবি তাও দেখিয়েছেন। পদুনার কান্না শুনেই সে তাকে সম্পত্তির ছ' আনা অংশ লিখে দিল, অন্যান্য রাণীদের অংশের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

অন্যান্য রচনাতে গোপীচাঁদের রাণীদের প্রত্যেকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রভাবে পরিস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সুকুরের হাতে পড়ে পদুনার চরিত্র সমস্ত রাণীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে বিকশিত হয়েছে। সে চির-দুর্ভাগিনী, সর্বজন-উপেক্ষিতা। তার করুণ আকুতিই তার চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে,

"শোন মোর দুঃখের কথা প্রসব কালে মৈল মাতা
মাসীমায়ে করিল পালন॥
...
বিভা না হইল মোর না হইল স্বতন্তর
অদুনার হইনু আমি চেড়ী॥
কি মোর জীবনের আশ না হইল গৃহবাস
তাহে নাথ হইবে সন্ন্যাসী।
মোর না হইল বংশ না পাইব রাজ্যের অংশ
সকলে বলিবে রাজার দাসী॥
...
তনু পাথরের প্রায় সেও ফাটি নাহি যায়
অন্তরে অন্তরে লাগে ব্যথা।
যেন চকমকী পাথর তাতে অগ্নি নিরন্তর
ডুবাইলে নাহি নিবে জলে॥"

শেষ দু ছত্রের উপমাটি মৌলিকতায় ও মনোহারিত্বে উপভোগ্য।

খেতুর চরিত্রেরও পূর্ণতর বিকাশ আমরা সুকুরের রচনায় দেখতে পাই। খেতু ঘোরতর সুবিধাবাদী। একবার দেখি সে ময়নামতীর আনুগত্যের ভান করছে, যখন

"মুনি বলে খেতু বাছা আমার কথা লেও।
মহলে যাইবে গোপীচন্দ্র তার সঙ্গে যাও ॥
রাণীর মায়াতে রাজা ভুলিবে যখন।
উচিত কহিয়া বাছা বুঝাবে তখন ॥
চারি নারীর মায়া বাছা পার ছাড়াইবার।
রাজ্যপাট যত দেখ সকলি তোমার ॥
মুনির আদেশ খেতু শুনিয়া শ্রবণে।
ঝারি হাতে যায় খেতু গোপীচন্দ্রের সনে ॥"

কিন্তু অন্দরমহলে প্রবেশ করে খেতু ময়নামতীর আদেশ পালন করল না, রাণীদের হিতৈষী সেজে তাদের বলল,

"চারি রাণী কর কিবা পালঙ্কে বসিয়া।
দেখ গিয়া যায় রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ॥
খেতু বলেন তোমরা খেলা কর দুর।
যুগী হয়ে যায় তোমার শিথের সিন্দুর ॥

সেইরকম আবার যখন হাড়িপাকে বধ করবার জন্যে রাণীরা তাকে একশ টাকার বিষ আনতে বলেছে, সে সাগ্রহে তাদের আদেশ পালন করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই হাড়িপাকে নিমন্ত্রণ করতে আদিষ্ট হয়ে সে হাড়িপার কাছে গিয়ে ভালমানুষ সেজে দাঁড়িয়েছে,

"খেতু বলেন গোঁসাই কি কহিব আমি।
যে কার্য্যে পাঠাইল রাণী সব জান তুমি ॥"

গোপীচাঁদের পরিত্যক্ত রাজসিংহাসন লাভ করে খেতু তার সুবিধাবাদিতার সুন্দর পুরস্কার পেয়েছে।

সুকুর হাড়িপাকে দুর্বাসার মত ক্রোধপরায়ণ করে এঁকেছেন। নিজের শিষ্য কানুপা, যিনি তাঁকে জীবন্ত সমাধি থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁকেও তিনি মৃত্যুশাপ দেন। অবশ্য তিনিই আবার খুশী হলে সকলকে চারযুগ অমরত্বের বর দিয়ে বসেন। হাড়িপার কপট মৃত্যুর পরিকল্পনা কৌতুকপূর্ণ হলেও সুকুরের হাতে তার রূপায়ণ আশানুরূপ হয়নি। হাড়িপার সিদ্ধির নেশা অন্যান্য রচনায় মাত্র উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু নেশা করার বর্ণনা কেবল সুকুরই দিয়েছেন। এই বর্ণনা বেশ কৌতুককর হয়েছে।

গোরক্ষনাথই নাথসম্প্রদায়ের প্রধান গুরু। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য তাঁরই উত্তুঙ্গ মহিমার জয়গান। 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'তেও গোরক্ষনাথকে ময়নামতীর গুরুপদে অভিষিক্ত করে প্রকারান্তরে সমস্ত সিদ্ধার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। 'গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা'র কবিরা ময়নামতীর মুখ দিয়ে গোরক্ষনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কিন্তু সুকুর মহম্মদ যতিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথকে একটু খাটো করে ফেলেছেন। গোরক্ষবিজয়ে বলা হয়েছে চারজন সিদ্ধা দেবী গৌরীর ছলনায় ভুলে অভিশাপগ্রস্ত হলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথ অটল অবিচল রইলেন, ফলে দেবীর শাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। কিন্তু সুকুর বলেছেন গোরক্ষনাথও দেবীর ছলনায় ভুলেছিলেন এবং দেবী তাঁকে গরু চরাবার শাপ দিয়েছিলেন। সুকুরের রচনায় এই

পরিবর্তন কেন হয়েছে ? আমাদের মনে হয়, সংযমগুণে হাড়িপা গোরক্ষনাথের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবেন, হাড়িপা-ভক্ত কবি স্বকুর সেটা সহ্য করতে পারেননি। তাই গোরক্ষনাথকেও তিনি শাপগ্রস্ত করে ছেড়েছেন।

চরিত্রচিত্রণে স্বকুর যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বর্ণনার ক্ষেত্রেও তেমনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিশেষভাবে নারীর রূপ বর্ণনায় তাঁর কবিত্ব সমধিক স্ফূর্ত হয়েছে। এখানে বিদ্যাধরীর রূপ-বর্ণনার কিয়দংশ কবির কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হল,

"হিয়া যেন পদ্ম কলি তাহাতে রত্ন কাচলী
নিশ্বাসের আগে পঞ্চশর ॥
কটিয়া পরে কিঙ্কিণী ইন্দ্রের সব নাচনী
যৌবন যেন অমৃত কদলী।
চম্পা যেন পদ অঙ্গুলি হীরার কনক পাসলী
যোগান্ত ভোগান্ত সব গলে।
কেওয়া ও গোলাপ বাসে ফকীর যোগীর বেশে
কবি স্বকুর মামুদে ভুলে ॥

স্বকুরের রচনায় মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা দেখা যায়, যেমন নারীর রূপ বর্ণনা, ভোজ্য-দ্রব্যের বর্ণনা এবং নায়িকার বারমাস্যা বর্ণনা। গোপীচাঁদের রাণী অদুনা স্বামীকে সন্ন্যাসগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে তাঁর কাছে বারমাস্যা বর্ণনা করেছেন। বারমাস্যার আরম্ভ হয়েছে কার্তিক মাসে এবং শেষ হয়েছে আশ্বিন মাসে। এটি অবিমিশ্রভাবে সুখের বারমাস্যা নয়, দুঃখের বারমাস্যাও নয়। স্বামীর অঙ্কসোহাগিণী এবং পতিবিরহিনী দু শ্রেণীর নারীর কথাই এতে বলা হয়েছে। কবির কবিত্ব এই বারমাস্যা বর্ণনার মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বারমাস্যার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,

"বৈশাখ মাসেতে স্বামী ডহ ডহ ঘরণী।
নারীর যৌবন জলে বিরহ অগনি ॥
ধন সম্পৎ নারীর মনে নাহি লয়।
শৃঙ্গার বিনে নারীর বাধিছে হৃদয় ॥"

গোপীচাঁদ যেখানে যৌবনের অসারতা বর্জন করছেন তার বর্ণনার মধ্যেও কবিত্বের স্পর্শ আছে,

"রাজা বলে শুন রে অভাগী নারীজন।
নিশির স্বপন জান নারীর যৌবন ॥
আষাঢ় শ্রাবণে গঙ্গা উথলে সাগর।
চৈত্র মাসেতে গঙ্গা দেয় বালুচর ॥
ধন যৌবন জত দেখ জোয়ারের পানি।
আসিবার কালে দেখি যাইতে নাহি জানি ॥
...

নারীর যৌবন মহাকৃকালের আকার।
উপরে স্থচিক্কণ দেখি ভিতরে আন্ধার ॥"

রাজার প্রতি অদুনার একটি উক্তিতে কবি একটি সরল গ্রাম্য উপমা ব্যবহার করে স্থকৌশলে অনেকখানি ভাব ব্যঞ্জিত করেছেন,

"শুনিয়া অদুনা বলে মনে পায়ে ব্যথা।
নিশ্চয় যাইবে রাজা গলে দিয়া কাঁথা ॥
অখণ্ড সরল গুয়া বিড়া বান্ধা পান।
এ সুখ সম্পদ তোমাক বিধি হইল বাম ॥"

নারীবিদ্বেষ স্থকুরের রচনাতে একটু বেশী পরিমাণেই পাওয়া যায়। তিনি নারীর মুখেই উৎকট নারীনিন্দা দিয়েছেন। ময়নামতী একমাত্র তিনি স্বয়ং, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নিদ্রা ও বসু ভিন্ন আর সব নারীকেই নিতান্ত অধম এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট অনর্থের মূল বলে বর্ণনা করেছেন।

স্থকুর সত্যিকারের বিনয়ী কবি। রচনার প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন,

"ছোট বড় পণ্ডিত আছয়ে যত জন।
সবে গুরু হয় আমি শিষ্য অভাজন ॥

স্থকুর কাব্যের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর বন্দনা করে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বন্দনার প্রথমাংশ এখানে উদ্ধৃত হল,

"চৌদ্দ সহস্র ভুবন নিজ নামে হবে পার।
শুকুর মহম্মদে কহে ব্রহ্মনাম সার ॥
এহিত নামের গুণ সাবধান হৈয়া শুন
পূর্ব্বে জপিল রঘুনাথ।
সেহি নিজ নামের বলে পাথর ভাসিল জলে
সমরে রাক্ষস করিল নিপাত ॥"

এই বন্দনার শেষে কবি শ্রদ্ধাভরে চৈতন্যদেবের নাম করেছেন,

"ব্যাস আদি সুধীর মুনি জপে নিজ নাম ধুনি
নামের প্রভাবে হৈল স্বর্গবাসী।
নদিয়া নাম নগরে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে
নিজ নামে চৈতন্য সন্ন্যাসী ॥"

কিন্তু স্থকুর মুহম্মদের মনে মুসলমান হয়েও হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু উপাখ্যান বর্ণনা করবার জন্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ছিল। তাই তিনি গ্রন্থের মধ্যে এক জায়গায় বলেছেন,

"স্থকুর মামুদে ভণে শুনে হিন্দুর পুরাণে
যবনের নহে হিন্দুবাণী।
কিছু যে ভাল কয় সে কথা অন্যথা নয়
হাদিছে জানিয় মুসলমানী ॥"

অতঃপর উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়াটির সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। এই ছড়ার প্রধান প্রচারকেন্দ্র রংপুর জেলা। সেইখান থেকেই প্রায় ষাট বছর আগে গ্রীয়ারসন সাহেব জনৈক গায়েনের কণ্ঠে শুনে এটিকে সংগ্রহ করেন, এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। গ্রীয়ারসন সাহেব এই ছড়াকে অত্যন্ত প্রাচীন যুগের রচনা—এমনকি মুসলমানদের বাংলা জয়েরও আগেকার রচনা বলে মনে করেছিলেন। তিনি ছড়াটিকে রংপুরের জনসাধারণের মহাকাব্য আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। এর পরে যখন মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করলেন, তখন তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের রচনা বলে এই ছড়াকে গ্রহণ করলেন। তাঁর মতে, ছড়াটি সর্বপ্রথম রচিত হয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং পরবর্তী কালের সংশোধন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে এসে তা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁরা এই ছড়াকে একান্ত আধুনিক এবং সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যবর্জিত রচনা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষক মহলে আলোচ্য ছড়াটির প্রাচীনত্ব এবং উৎকর্ষ সম্বন্ধে এমন এক তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, উগ্রতায় ও প্রচণ্ডতায় বৈশাখী ঝড়ও যার কাছে হার মানে।

সে বিক্ষোভ আজ প্রশমিত। এই ছড়াটির সত্যিকার মূল্য কতটুকু, সে সম্বন্ধে আজ স্থিরভাবে বিচার করবার সময় এসেছে। এর রচনাকাল যে মোটেই প্রাচীন নয়, সে কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সার গ্রীয়ারসন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষী যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়ে এর প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেগুলির ভিত্তি মোটেই দৃঢ় নয়। সার গ্রীয়ারসনের যুক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "No character is more popular than Ismail Ghazi in this district (রংপুর) and the popular songs teem with allusions to him ; and yet the epic poem (আলোচ্য ছড়া) above-mentioned contains no mentions to him or of any Musalman whatever. I therfore conclude that this epic must have been originally written, or rather composed, for it has been unwritten till lately, before Ismail Ghazi's time." গ্রীয়ারসনের যুক্তির ক্রটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ছড়াটির মধ্যে ইসমাইল গাজীর উল্লেখ নেই বলে তা যেমন ইসমাইল গাজীর আগে রচিত বলে প্রমাণিত হয় না, তেমনি তাঁর উল্লেখ থাকলেও এটি তাঁর পরে রচিত বলে প্রমাণিত হত না, কারণ, এই জাতীয় অলিখিত ছড়ায় পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ছড়াটির প্রথম আবির্ভাবকাল যাই হোক না কেন, তাকে যে আকারে আমরা পাচ্ছি, তার মধ্যে আদিম স্তরের ভাষা বা কাহিনী যে অবিকৃতভাবে মেলে না, একথা স্বীকার করতেই হবে। এর ভাষা আদৌ প্রাচীন নয়। উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষায় রচিত বলে এক শ্রেণীর সমালোচকের মনে এই ভাষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মেছিল। লিখিত রচনারই যখন গায়েন ও লিপিকরদের হাতে পড়ে নানারকম পরিবর্তন ঘটে, তখন লোকমুখে প্রচলিত অলিখিত ছড়ার ভাষাতে কিছুমাত্র প্রাচীনতা থাকারও আশা করা যায় না। যে কারণে ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে, সেই কারণে

কাহিনীরও রূপান্তর ঘটেছে। যাদের মধ্যে ছড়ার প্রচার ছিল, সেই জনসমষ্টির রুচির ক্রমাগত পরিবর্তন এবং নিত্য নতুন কিংবদন্তীর উদ্ভব ও সংযোজনের ফলেই প্রথমে কাহিনীর যে রূপ ছিল তার সঙ্গে বর্তমান রূপের প্রভূত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব একসময়ে ছড়াটিকে প্রাচীন রচনা হিসাবে গ্রহণ করে তার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হত, তার কোন সার্থকতা নেই। ছড়াটির প্রকৃত মূল্য অন্য বিষয়ে। ছড়াটি রংপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষায় লেখা বলে এই ভাষা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করবেন তাঁদের কাছে এটি এক মূল্যবান উপকরণ বলে গণ্য হবে।

আরও এক দিকে এই ছড়াটির বিশিষ্ট মূল্য আছে। ছড়াটি বিশুদ্ধ লোকসাহিত্যের নিদর্শন। লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "ইহা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে।...লোক-সাহিত্যের মূলতঃ কোন একজন রচয়িতা থাকিলেও তাহার যেমন কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় না, তেমনই তাহার সেই মৌলিক রচনারও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না ; সেই রচনা সমষ্টির হাতে পড়িয়া যে নূতন সংস্কার লাভ করে, তাহার সঙ্গেই সকলের পরিচয় স্থাপিত হয়।...জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্যিক ও মননশীল সৃষ্টি মুখ্যতঃ মৌখিক ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া যায়, তাহাই লোক-সাহিত্য।"[১] আলোচ্য ছড়ার মধ্যে যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গের (বিশেষভাবে রংপুর অঞ্চলের) গ্রাম্য সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি এই ছড়াটি। কোন একজন লোক মূলে নিশ্চয়ই এর রচয়িতা, কিন্তু বর্তমানে তাঁর সমস্ত পরিচয়ই হারিয়ে গেছে, তাঁর আদি রচনাটিও আর বিশুদ্ধ নেই, দিনের পর দিন তার সঙ্গে আর পাঁচজনের রচনা যুক্ত হয়ে তার খোল-নলচে বদলে ফেলে নতুন চেহারা করে দিয়েছে। এই ছড়াটি সম্পূর্ণভাবে মৌখিক ধারা অনুসরণ করেই অগ্রসর হয়ে এসেছে, আজ অবধি কোন লিখিত পুঁথিই এর পাওয়া যায়নি। নাথ-সাহিত্যের অন্য যে সমস্ত রচনাকে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য লোক-সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত করতে চান, সেগুলি সর্বাংশে লোকসাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে হয় না, কিন্তু এই ছড়াটি খাঁটি লোকসাহিত্য।

উত্তরবঙ্গে এই ছড়াটি কত জনপ্রিয় ছিল, সেসম্বন্ধে গ্রীয়ারসন ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। নিরক্ষর যোগী সম্প্রদায় এই ছড়াটি গান করে বেড়াত। রংপুর অঞ্চলের একজন নিরক্ষর যোগী গায়কের মুখে শুনে গ্রীয়ারসন এই ছড়ার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ সংগ্রহ করেন এবং পরে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এর একটি বিস্তারিত পাঠ সংগ্রহ করেন। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এসম্বন্ধে বলেছেন, "রংপুর জেলায় গোপীচন্দ্রের প্রাচীন গান কোথাও পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। যোগী বা জুগী জাতীয় লোক মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময় গোপীযন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উহা দ্বারা শ্রোতার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার চেষ্টা করে।" প্রত্যেক জায়গাতেই গায়কেরা নিজেদের খেয়ালখুশীমত ছড়াটিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে বলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে প্রচলিত পাঠ অনেকাংশে বিভিন্নতা লাভ করেছে। আগেই বলেছি, এ সমস্তই লোকসাহিত্যের অপরিহার্য ধর্ম।

১ বাংলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ১-১০

আলোচ্য ছড়াটি বাংলায় লোকসাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রচনা। বাংলায় ছড়ার আকারে গ্রথিত কাহিনীর নিদর্শন খুব কমই মেলে। যে কয়েকটি মেলে, এই ছড়া তাদের অন্যতম এবং আয়তনের দিক দিয়ে সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ। এত দীর্ঘ ছড়া-আখ্যায়িকা যে কোন দেশেই বিরল! এই দিক দিয়ে আলোচ্য ছড়ার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

কাহিনীর দিক দিয়ে আলোচ্য ছড়ার সঙ্গে গোপীচাঁদ-আখ্যায়িকা পর্যায়ের অন্যান্য রচনার একাধিক বিষয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ছড়াটি অলিখিত, বাকী রচনাগুলি লিখিত। অন্য রচনাগুলির আয়তন নাতিদীর্ঘ, ছড়াটির আয়তন অত্যন্ত দীর্ঘ। কাহিনীর দিক দিয়েও অন্যান্য রচনাগুলির তুলনায় ছড়ায় স্বাতন্ত্র্য আছে। অন্য রচনাগুলিতে গোপীচাঁদ কর্তৃক হাড়িপাকে মাটির নীচে বন্দী করে রাখা এবং কানুপা কর্তৃক হাড়িপাকে উদ্ধার করার কথা রয়েছে, ছড়াতে তা নেই। অন্যান্য রচনায় গোপীচাঁদের সন্ন্যাসাশ্রম থেকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রত্যাবর্তন দেখানো হয়নি, ছড়াতে তা দেখানো হয়েছে।

ছড়ার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমে চরিত্রচিত্রণের কথা বলতে হয়। অমার্জিত গ্রাম্য ভাষার এই রচনাতে প্রায় সব চরিত্রই সজীব ও স্বাভাবিক হয়েছে, এটি অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। সাধারণ লোকদের মধ্যে এই ছড়ার প্রচার ছিল, তারা চরিত্রগুলিকে নিজেদের ছাঁচে ঢেলে নিয়েছে। এর প্রত্যেকটি চরিত্রই আমাদের কাছে নিতান্ত পরিচিত ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট মনে হয়।

রাণী ময়নামতীর চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ছড়ার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি একাধারে সাধ্বী স্ত্রী, স্নেহময়ী জননী, কর্তব্যপরায়ণা যোগিনী এবং প্রখর ব্যক্তিত্ববতী রমণী। স্বামীর প্রতি ময়নামতীর নিষ্ঠা ও মমতা আমাদের অভিভূত করে। স্বামী অন্যান্য তরুণী স্ত্রীদের মোহে নিমগ্ন হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, তবুও তাঁর পতিভক্তি টলেনি। স্বামীর অন্তিম মুহূর্তে তিনিই তাঁর প্রাণরক্ষার জন্যে এগিয়ে এলেন। দাম্ভিক স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করে জীবন রক্ষা করতে চাইলেন না। তখন ময়নামতী সম্ভব অসম্ভব নানা উপায়ে যমেদের চক্রান্ত ব্যর্থ করলেন। অবশেষে যখন দৈবশক্তির চক্রান্তে সত্যিই তাঁর স্বামীর প্রাণবিয়োগ ঘটল, তখন প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্যেও ময়নামতী অশেষ চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রয়াস সার্থক না হলেও তাঁর চরিত্রের লৌহকঠিন দৃঢ়তা তার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। স্ত্রী হিসেবে যেমন, জননী হিসেবেও তেমনি ময়নামতী এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন। নাথধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে এবং ছেলেকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি গোপীচাঁদকে যোগী করে দূর প্রবাসে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য গোপীচাঁদকে সম্মত করাতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল, গোপীচাঁদ একবার তাঁকে নিদারুণভাবে অপমান করায় ময়নামতী তার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এ মনোভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি, গোপীচাঁদের বিদায়ের দৃশ্যটিতেই আবার তাঁর মাতৃস্নেহের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা যায়। অর্থাভাবে পথে গোপীচাঁদ কষ্ট পাবেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর ঝোলায় বার কাহন কড়ি ভরে দিয়ে গুরুকে বলতে নিষেধ করলেন, পাছে গুরু জানতে পারলে গোপীচাঁদকে শাস্তি দেন। ছেলেকে তিনি সময়োপযোগী অনেক সদুপদেশও দিলেন। এর পর যখন হীরা নটীর ঘরে বন্দী গোপীচাঁদ শুকের মারফত নিজের দুঃখ-দুর্দশার মর্মান্তিক বর্ণনা দিয়ে চিঠি পাঠালেন, তখন হাড়িপার উপর তিনি ক্রোধাবিষ্ট হয়ে উঠলেন। এমনিতে হাড়িপার উপর তাঁর

অসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু তিনি তাঁর ছেলেকে অসহ্য দুঃখ দিয়েছেন দেখে তাঁর উপর ক্রোধে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, এমনকি তাকে চপেটাঘাতও করলেন। আলোচ্য ছড়াতে দেখানো হয়েছে যে ময়নামতীর কাছে ধর্মের চাইতে সন্তান বড়। ময়নামতীর দুর্জয় ব্যক্তিত্বও এই ঘটনাতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে গোদা যম, বুড়ো শিব প্রভৃতি নাজেহাল হয়েছেন।

গোপীচাঁদ যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দেশে ফিরে এলেন, তখন ময়নামতীর আনন্দের সীমা রইল না। ধর্ম ও সন্তান উভয়ের প্রতি আকর্ষণ তাঁর মনে যে দ্বৈধের সৃষ্টি করেছিল, এতদিনে তার অবসান হল।

"আয় প্রাণের বাছা বলে মএনা ডাকাবার লাগিল।
ডাক মধ্যে ধম্মিরাজা দরশন দিল॥
ছেইলাক কোলে নিয়া ময়না লৈক্থ চুম্ব খাইল।
বাবা ভাল গেয়ান শিখা আইলু বিদেশ সহরে।
সুখে এলা রাজ্য কর পাটের উপরে॥"

ছড়াতে গোপীচাঁদের চরিত্রও স্বাভাবিকতা ও কারুণ্যে আকর্ষণীয় হয়েছে। তার মানবতা, সংসারপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, সংযম, কর্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ময়নামতী যখন সন্ন্যাসগ্রহণের জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি করছিলেন, তখন সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ময়নামতীকে রূঢ় কথা বলেছে, মা হাড়িপার মাহাত্ম্য সাড়ম্বরে কীর্তন করাতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে, এমনকি ময়নামতীর সঙ্গে হাড়িপার অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে একবার সন্দেহ প্রকাশ করেছে। গোপীচাঁদের ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের মাত্রা উপলব্ধি করে তার এই অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারি।

স্ত্রীদের প্রতি গোপীচাঁদের গভীর প্রেম তার একটি কথার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,

"রদুনা পদুনা রানির ঘরকে দেখি বট বৃক্ষের ছায়া।
ছাড়ি জাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় নাগে দয়া॥"

যোগী হয়ে গুরু হাড়িপার সঙ্গে গোপীচাঁদ দুর্গম পথ ধরে দুঃসহ ক্লেশের মধ্য দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে গিয়েছে। গুরু পরীক্ষাচ্ছলে তাকে অসংখ্যবার অসহ্য কষ্ট দিয়েছেন, কিন্তু দৃঢ়ব্রত তরুণ রাজা সমস্ত মুখ বুজে সয়েছে।

ছড়ার শেষ দিকে অবশ্য অনৈসর্গিক উপাদান এবং আদর্শবাদের চাপে পড়ে গোপীচাঁদ-চরিত্র একটু অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে হীরা নটীর প্রলোভনের সময় গোপীচাঁদ যে অতুলনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছিল তার মাহাত্ম্য খর্ব হয়েছে আগে থেকে হাড়িপা "কাম ক্রোধ রতি মাএআ সকলি টুটাইল" বলাতে।

গোপীচাঁদের রাণী অদুনা ও পদুনার চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ছড়াতে অক্ষুণ্ণ আছে। অধিকন্তু এর মধ্যে তাদের চতুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা নানা রকম যুক্তি জুগিয়ে দিয়ে গোপীচাঁদকে ময়নামতীর সঙ্গে তর্ক চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, ময়নামতীকে পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যেও নানা বিচিত্র উপায়ে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল, তখন তারা কাকুতি মিনতি করে গোপীচাঁদকে

সন্ন্যাসে যেতে নিষেধ করল। রাজা সে নিষেধ না শোনায় তারা তাঁর সঙ্গে যেতে চাইল, পরিচর্যা করবার জন্যে। তাতেও রাজা সম্মত হলেন না। তিনি পথের নানা বিপদের কথা বললেন। রাণীরা আদর্শ সতীর মতই উত্তর দিল,

"থাক না কেন বনের বাঘ তাক না করি ডর।
নিষ্কলঙ্কে মরন হউক সোআমীর পদের তল॥"

সীতার মতই তাদের পতিভক্তি, তাই সীতার মতই তাদের এই উক্তি। এরপর যখন স্বামী খেতুকে পতিপদে বরণ করতে বললেন, রাণীরা শিউরে উঠে বলল, "তাও কি হয়?"

স্বামী চলে গেলেও তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি তিলমাত্র বিচলিত হয়নি। শুক সারী পাঠিয়ে তারা স্বামীর সন্ধান করেছে। অকৃতজ্ঞ গোপীচাঁদ যখন সারীর মারফত লিখে পাঠালেন, "আর আমি তোমাদের কাছে ফিরে যাব না, তোমরা নিশ্চয় খেতুকে পতিপদে বরণ করেছ"—তখন রাণীরা ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে বলল,

"দিদি এমনি জদি তুই বইনে জাইতো মরিয়া।
তবু খেতুক ভাত খাব না পাটতে বসিয়া॥
এই পখি জোড়া নিব সঙ্গে করিয়া।
কোঠে আছে মহারাজ্জ দেখিব আসিয়া॥
জে স্থাশেতে খাইবে রাজা রাজত্ব করিয়া।
ঐ রানির থাইব দিদি বান্দি রুপ হৈয়া॥"

এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা হিন্দু স্ত্রীর চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

গোপীচাঁদের উদ্ধারের জন্য রাণীদের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী। তারা শুকসারী না পাঠালে ময়নামতী গোপীচাঁদের সংবাদ পেতেন না, এবং তিনি না জানলে হাড়িপা সম্ভবতঃ গোপীচাঁদকে উদ্ধার করতেন না।

রাণীরা ভিক্ষুকবেশধারী গোপীচাঁদের মুখে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে আত্মবিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছে। শেষ অবধি স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে এই দুই দুর্ভাগিনী নিজেদের ধৈর্য ও সহনশক্তির কথঞ্চিৎ পুরস্কার লাভ করেছে।

ছড়ার মধ্যে রাজা মাণিকচাঁদের চরিত্রটি গোড়ার দিকে ঈষৎ প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ হয়েছে। তিনি সদাশয় প্রজাপালক রাজা, তাঁর রাজ্যে প্রজাদের সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু তাঁর রাজোচিত দৃঢ়তার অভাব ছিল, অত্যাচারী "দক্ষিন দেশি বাঙ্গাল" কে রাজপদে নিয়োগ থেকেই তা বোঝা যায়। দেওয়ানের প্রজাপীড়নের প্রতিকার করতেও তিনি অক্ষম হয়েছেন। প্রজারা তাঁকেই সমস্ত দুর্গতির জন্যে দায়ী করে তাঁর প্রাণনাশের আয়োজন করেছে।

কিন্তু এই দুর্বলপ্রকৃতির রাজার মধ্যে যে দৃপ্ত পৌরুষ ছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেল যখন তিনি ময়নামতীর কাছ থেকে জ্ঞান শিক্ষা করে অমর হবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রাণ যায় যাক্, তবু তিনি স্ত্রীর শিষ্য হতে পারবেন না,

"রাজা বলে শুন মএনা মএনা মস্তি বাই।
এমনি যদি আমার জাহান জায় যোগ ছাড়িয়া।
তবু মাইবার গিয়ান না নিমু শিখিয়া॥
আইজ যদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া।
কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিস্ত বেটা বলিয়া॥"

রাজা মাণিকচন্দ্র প্রাণ দিলেন, কিন্তু পতি-অভিমান শেষ পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন না।

আলোচ্য ছড়াতে কয়েক জায়গাতে খেতুর মধ্যেও মানবিকতার স্ফুরণ দেখা যায়। পরীক্ষা নেবার জন্যে ময়নামতীকে ফুটন্ত তেলে ফেলবার ভার তারই উপর পড়েছিল; যখন ময়নামতী মৃত্যুর ভান করলেন, তখন খেতু বিলাপ করেছে,

"খেতু বলে জয় বিধি কম্মের বুঝি ফল।
আমার নাকান পাপি নাই দরবারের উপর॥
মা জননি পালন করছে ঘৃত রয় দিয়া।
আপন হাতে মারিনু মাক তৈলত ফ্যালেয়া॥
আমার নাকান পাপি নাই রাজ্য ভরিয়া।
আমাক ছুঁইয়া জল খাবে না জেয়াতা ভাইয়া॥"

ময়নামতীর প্রতি খেতুর মমতা আন্তরিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোপীচাঁদের প্রতিও তার টান আছে। যদিও গোপীচাঁদ রাজ্য ছেড়ে চলে গেলে তার রাজ্যপ্রাপ্তি ও রাণীপ্রাপ্তিরূপ আশু লাভ অনিবার্য, তবুও গোপীচাঁদের বিদায়ের সময় সে কেঁদেছে।

"রাজার ভাই খেতুয়া পচ্ছাৎ কান্দিতে লাগিল॥
সিতা মলে সিতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে।
গুণের ভাই লক্ষন ছাড়ি গ্যালে আমি ভাই কইব কারে॥"

খেতুর দুমুখো চরিত্রের আভাসও ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

ছড়ার আরও একটি ছোট্ট চরিত্র এক মুহূর্তের জন্য আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়—সেই গণৎকার পণ্ডিতটি, যে গরীব হলেও উৎকোচ নিতে ইতস্তত করেছে, শেষে স্ত্রীর উপরোধে মত পরিবর্তন করেছে।

ছড়ার বর্ণনাগুলির মধ্যে অনেক জায়গাতে বেশ সজীবতা দেখা যায়। ছড়াটিতে উদ্ভট অনৈসর্গিক বর্ণনাই বেশী। কিন্তু এগুলিও অনেক সময় বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

এইজাতীয় বর্ণনার দৃষ্টান্ত দিতে গেলে প্রথমে মনে আসে সেই জায়গাটি, যেখানে যমের দল মাণিকচন্দ্র রাজার প্রাণ হরণ করতে এসে বারবার ময়নামতীর কাছে পরাস্ত হয়ে পালাচ্ছে। এই বর্ণনার একটি অংশ উদ্ধৃত করলাম,

"মহামন্ত্র গিয়ান নইল হৃদএ জপিয়া।
চণ্ডি কালি রূপ হৈল কায়া বদলিয়া॥

তৈল পাটের থাড়া নিল হস্তে করিয়া।
মার মার করি জমক নিগায় পিট্টিয়া॥"

নানা রূপ ধরে, নানা কৌশল করে, অশেষ ধৈর্য ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়ে ময়নামতী যমদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করলেন। এই বর্ণনা পড়বার সময় আমাদের মন উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, যেমন হয় রূপকথার রাজপুত্রের রাক্ষসজয়ের বিবরণ পড়বার সময়।

আবার ময়নামতী যখন মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্যে যমের বাড়ী যাচ্ছেন সেই বর্ণনাটি অলৌকিকতা সত্ত্বেও চিত্তাকর্ষক হয়েছে,

"সোনার ঝাড়ি ভাঙ্গি ময়না কপালে ভাঙ্গিল॥
শিশের সিন্দুর হাতের শাখা মৈলান দেখিল।
কপালত চড়িয়া ময়না কান্দন জুড়িল॥
একটা রামের (আমের) পল্লব হস্তে করিয়া।
সোয়ামি সোয়ামি বলিয়া চলিল কান্দিয়া॥
… …
জ্ঞাত (জ্ঞাতি) সকল রাজাক থাকলো আগুরিয়া।
ভাহিণী মএনা জাএছে তবে যমপুরি নাগিয়া॥
কতেক দুর জাএয়া মএনা কতেক পন্থ পাইল।
বৈতরনির ঘাটে জাএয়া রূপস্থিত হৈল॥
মহামন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ি মএনা হৃদএ জপিয়া।
সোনার ভোমরা নৈল কায়া বদলিয়া॥"

ময়নামতীর যমের বাড়ীতে পৌছোনোর পর তাঁর হাতে প্রধান যম বা গোদা যমের লাঞ্ছনার আর একটি কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা পাই। এই বর্ণনার সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন গ্যালিক উপাখ্যানের কোন কোন বর্ণনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "গ্যালিক উপাখ্যানের গুইনবাচের পলায়নের চেষ্টা ও ময়নামতীর হস্ত হইতে গোদা যমের উদ্ধারপ্রয়াস একরূপ।…এই সাদৃশ্য এত স্পষ্ট—যে মনে হয় যেন পৃথিবীর দুই প্রান্ত হইতে একই ভাবের গল্পরচকদ্বয় ডাকাডাকি করিয়া কথা শুনাইতেছেন।"

রাজা গোপীচাঁদের সন্ধানে তাঁর রাণী কর্তৃক প্রেরিত শুকসারীদের দেখা বিভিন্ন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া দেশের বর্ণনা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে, বিশেষভাবে মেচপাড়ার দেশের বর্ণনাটি,

"মেচপাড়ার আজ্যের কথা কহন না জায়॥
এক বেটি মেচনি আছে বাম চৌক তার ট্যার।
আশি হাত কাপড়া হইলে কমরের এক ব্যাড়॥
তার সোআমির নাম হেমাই পাত্তর।
মোন দশেক ধান শুগায় পিঠের উপর॥

তার ছোট ভাই আছে বাম ঠ্যাংগ্না গোদ।
হস্তি ঘোড়ায় চলি যায় গোদের না পায় বোদ ॥
তার ছোট বইন আছে নাই তারো কোক।
নও হাড়ি পানতা খায় দশ হাড়ি ভপত ॥
আশি মন্দে পাড়িয়া কিলায় নাই চোকোত পানি ॥"

হাসিকে মানুষের জীবনীশক্তি বলা হয়। সাহিত্যেও হাস্যরসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, নির্মল অনাবিল হাস্যরস সাহিত্যকে উপভোগ্য ও প্রাণবন্ত করে তোলে। নাথসাহিত্যে উপভোগ্য হাস্যরসের দৃষ্টান্ত অপর্যাপ্ত পরিমাণে মেলে। গোরক্ষবিজয়ের ক্ষেত্রে তার নিদর্শন আমরা আগেই দেখে এসেছি। এই গ্রাম্য ছড়ার ভিতরেও এমন সব অংশের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়, কৌতুক যাদের মধ্যে কানায় কানায় টলমল করছে। এখন আমরা এদেরই উদাহরণ দেব।

প্রথমতঃ যমরাজের বাজারে হাজির হয়ে ময়নামতী ভীত ও লুক্কায়িত গোদা যমকে টেনে বার করে তার যে দুর্দশা ও লাঞ্ছনা করেছেন, তাতে কৌতুকের চূড়ান্ত হয়েছে।

তারপর, ময়নামতীর কপট মৃত্যুর দৃশ্যটি অফুরন্ত কৌতুকরসের উপাদান জুগিয়েছে। তিনি যখন ফুটন্ত তেলের কড়ায় পড়ে মৃত্যুর ভান করছিলেন, তখন খেতুর মুখে তাঁর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে অদুনা পদুনা মহা স্ফূর্তি করতে লাগল,

"জখন রানিগুলা বুড়িক না দেখিল।
হাতে তালি দিয়া রানির ঘর নাচন জুড়িল ॥"

এমনসময় ময়নামতী গুটি গুটি এসে দেখা দিলেন। বধূদের স্ফূর্তি শূন্যে মিলিয়ে গেল।

ময়নামতীর পরবর্তী পরীক্ষার দৃশ্যটিও কিছু কম কৌতুকাবহ নয়। তুষের নৌকোয় চড়ে নদী পার হওয়ার আগে ময়নামতী নৌকাখানি পূজা করে নিতে চাইলেন। কিন্তু কেউই এই সৃষ্টিছাড়া নৌকার পূজা করতে সাহস পেলেন না—গোরক্ষনাথ, হাড়ি সিদ্ধা, ধীরনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর—কেউ না। যদিও কেন তাঁদের এই ভয়, তা বোঝা যায় না। কেউই এগিয়ে আসছেন না দেখে ময়নামতী অধৈর্য হয়ে গর্জন করে উঠলেন। তাঁর গর্জন শুনে দেবতা সিদ্ধা যে যেখানে ছিলেন দৌড় মারলেন, কিন্তু বেচারা শিব বার্ধক্যের জন্যে পালাতে পারলেন না, তাঁকে রণরঙ্গিণীর কবলে পড়তে হল। ময়নামতী বুড়ো শিবকে ধরে ফেললেন,

"কচুবাড়ি দিয়া বুড়া শিব জায় পলাইয়া।
হোলা ব্যাঙের মতন মএনা নিগায় ন্যাদিয়া ॥"

বাধ্য হয়ে শিবকে এই অদ্ভুত নৌকার পূজা করতে হল। তিনি উল্টোপাল্টা মন্ত্র পড়ে গায়ের ঝাল কতকটা মেটালেন। এই বিবরণটি আদ্যোপান্তই কৌতুকপূর্ণ।

রাজা গোপীচাঁদের রাণীদের কাছে বিদায় নেবার দৃশ্যটিতে কারুণ্যের মাঝখানে হাসির প্রলেপ মনকে পুলকিত করে। রাজা রাণীদের অন্তঃসব ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করতে না পেরে শেষটা বললেন,

"আমার সঙ্গে জাবুয়ানি মূড়াও জাএয়া মাথা।
আমি নিছি তোর কপ্‌নি তোক নিতে হবে ক্যাঁথা॥"

সে বড় ভীষণ কাঁথা।

"সেই জে মোর গুরুর ক্যাঁথা আগলদিগল।
খার পানি নাহি পড়ে নকুড়ি বছর॥
সাত দরিয়ার জল হৈলে গুরুর ক্যাঁথা ভিজায়।
চৈত্র বৈসাখের ঔদে ঐ ক্যাঁথা শুকায়॥
ছয় মাস পন্থ রানি সরার গোন্দো পায়॥"

এমন যে কাঁথা, যাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর ও উকুনের বাসা, পাগলা হাতীও যাকে নড়াতে পারে না, সেই কাঁথা বওয়ার প্রস্তাবের উত্তরে রাণীরা কিনা বলল,

"হয় না ক্যানে সরার কাঁথা ফুল চন্দনের বাস।
ঘরের সোআমি সন্ন্যাস হৈয়া জায় নারির কিবা আশ॥"

...

এতে জদি গুরুর ক্যাঁথা বড় ভয় করে।
ব্রম্মায় পুড়িয়া ক্যাঁথা গঙ্গাএ ভাসাইয়া দিব।
দুই বইনের সারি চিরি ক্যাঁথা বানাইয়া নিব॥
সোনার গুনায় রুপার গুনায় করিব সিয়ানি॥
হাজার টাকা দিব আনি দর্জির ঘরের বানি।
চারু পাকে চাইর মানিক মুঞি দ্যাওঁ নাগাইয়া।
আন্ধার রাতি গলার ক্যাঁথা ওঠে জ্যান জলিয়া॥
হাট জাব পন্থ জাব হবে আন্ধার রাতি।
কোন কাঙ্গালের মহল্লে পাব তৈল্ল ঘিয়ের বাতি॥
ঐজে রভাগির ক্যাঁথা মুখের আগত থুইয়া।
তিন ঝনায় রন্ন খাব ঐ আলোত বসিয়া॥"

কাঁথার বর্ণনায় যে কৌতুকের সঞ্চার হয়েছে, রাণীদের উত্তরে সেই কৌতুক যেন প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়েছে। কাঁথার আলোয় বসে ভাত খাওয়া—কল্পনার এতখানি দৌড় আধুনিক যুগের বিচিত্রবুদ্ধি ব্যঙ্গশিল্পীদেরও মাথায় আসা সম্ভব বলে মনে হয় না।

হীরা নটীর ঘরে ক্রীতদাসরূপে বন্দী গোপীচাঁদ যখন তাঁর দুঃখদুর্দশা বর্ণনা করে শুকের মারফত মাকে চিঠি পাঠালেন, তখন হাড়িপার উপর ময়নামতীর ক্রোধের চিত্র অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। আমরা আগেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

অবশ্য হাস্যরসের কথা আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করলাম বলে এই ছড়ার মধ্যে অন্য রসের কোন অভাব আছে বলে যেন কেউ না ভাবেন। যে জাতীয় কবিত্বের স্পর্শে কোন রচনা হৃদয়গ্রাহী ও সজীব হয়ে ওঠে, আলোচ্য ছড়ার মধ্যে তারও পরিচয় আছে।

যেসমস্ত বর্ণনার মধ্যে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। এক, যে সমস্ত বর্ণনা চিত্রসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ এবং দুই, যাদের সার্থকতা আবেগধর্মিতা, অন্তর্গূঢ় মর্মস্পর্শিতার জন্য। চিত্রাত্মক বর্ণনার মধ্যে আমরা সন্ন্যাসখণ্ডে যমেদের বর্ণনাটি স্মরণ করতে পারি,

"চ্যাংরা চ্যাংরা জম সাজিল মাথাএ সোনার টুপি।
জুআন জুআন যম সাজিল গালাএ রসের কাটি।
বুড়া বুড়া যম সাজিল হাতে সোনার নাটি॥
সৌক জম সাজিয়া গ্যাল আবাল জমের বাড়ি।
আবাল জম খাড়া হইল মাটিত পৈল্ল দাড়ি॥"

নারীর রূপসজ্জা বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যের একটি চিরাচরিত প্রথা। এই গ্রাম্য ছড়াটিতেও হীরা নটীর রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ অমার্জিত গ্রাম্য ভাষাতেও রূপসজ্জা বর্ণনার মাদকতা ব্যঞ্জিত হয়েছে,

"কাকেয়া কাকেয়া নটি চুলের ভাঙ্গে জালি।
সিতার গোড়ে পিন্দিলে মুক্তা সারি সারি॥
কাকেয়া কাকেয়া নটি চুল করিল গোটা।
মাজ কপালে তুলিয়া পেন্দে তিলকের নওড়া ফোডা॥
...
তার পচ্ছাত পিন্দে খোপা গুঞ্জরি ভোমরা।
সন্ধা হইলে ভোমরা নাগায় কলহার।
এক খান খোপাএ কৈল্লে তিন খান দুআর॥
...
হেট কানে পেন্দে ঢেরি উপর কানে চাকি॥
গালা মধ্যে তুলে দিলে শতেশ্বরি হার।
দুই বাহাএ তুলিয়া নিলে নয়শ রূপার তার॥"

বর্ণনাটি অত্যন্ত দীর্ঘ। স্থানে স্থানে এর মধ্যে চিত্রধর্মিতার অতিরিক্ত গুণও স্ফূর্ত হয়েছে। নটীর বারবার খোঁপা বাঁধা ও খুলে ফেলা এবং বারবার শাড়ি পরিবর্তন করা বর্ণনা করা হয়েছে—এতে তার মনের অস্থিরতা প্রতিফলিত হয়েছে। এই বর্ণনার সর্বশেষ ছত্রটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাপূর্ণ—

"ঘর হতে ব্যারায় নটি চিতিয়া বাঘিনি॥"

নটীর চিত্রবিচিত্র রূপসজ্জা এবং ক্রূর নিষ্ঠুর মন উভয়কেই এই উপমাটির মধ্য দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে প্রকাশ করা হয়েছে।

আবেগধর্মী বর্ণনাগুলির মধ্যে রাণীদের কাছে গোপীচাঁদের বিদায়গ্রহণের দৃশ্যটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এখানে ধীরে ধীরে স্তরপরাম্পরার মধ্য দিয়ে আবেগ তীব্রতা লাভ করেছে, কারুণ্যরস ঘনীভূত হয়েছে। শুধু রাণীরা কেন, রাজশুদ্ধ সকলেরই বিলাপ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। গোপীচাঁদের

বিরহের ব্যথায় রাজ্যের প্রজা, কর্মচারী, সেনাবাহিনী, পশু, পাখী, সকলেই কেঁদেছে। তাদের কান্নার বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয়, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় কন্বের তপোবন এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রার সময় গোকুল কি এর চাইতেও বেশী কেঁদেছিল ?

শুক-সারীর কাছে গোপীচাঁদের ক্রীতদাসজীবনের দুঃখদুর্দশা বর্ণনায় অংশটিও অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ও করুণ,

"জাদুরে—বার ভার জলের মধ্যে জদি এক ভার কম পায়।
সাতটা মন্দ নাগি দিয়া সাতবার কিলায় ॥
জাদুরে—বার ভার গঙ্গাজল জোগাব নিজিয়া।
আট ভাড়ুআয় ধরে আমাকে চিত্র (চিৎ) করিয়া ॥
হিরা নটি গাও ধোয় আমার বুক্‌খেতে চড়িয়া।
জ্যাখেক জাদু পাঞ্জারের খাটি মোর ফ্যালাছে ভাজিয়া ॥"

ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে আলোচ্য ছড়ায় অসাধারণ কোন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তবুও এর মধ্যে কোথাও কোথাও শ্রুতিমধুর পংক্তিমিথুনের সাক্ষাৎ মেলে। যেমন,

"নাঙ্গল বেছায় জোঙ্গাল বেছায় আবো বেছায় ফাল।
খাজনার তাপত বেছায় দুধের ছোআল ॥"

অথবা

"আত্রি করে ঝিকিমিকি কোকিলা কাড়ে রাও।
শেত কাকা বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও ॥"

শেষোক্ত পংক্তিমিথুনটি ছড়ার মধ্যে বারবার ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে।

এর দু'এক জায়গায় সার্থক অলঙ্কার সৃষ্টিরও নিদর্শন মেলে। এখানে একটি সুষ্ঠু উপমা অলঙ্কারের উদাহরণ দিচ্ছি,

"ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিসই পায়।
টেড়িয়া করি পাগড়ি বাঁধে ছেঞার দিকে চায় ॥
বাঁশের পাতার জাকান স্যারফিরিয়া ব্যাড়ায় ॥"

এটি খেতুর বিষয়প্রাপ্তিতে জনৈক নাপিত প্রজার উক্তি। অনুরূপভাবে খেতু সম্বন্ধে গোপীচাঁদের একটি উক্তিতে দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের একটি সুন্দর উদাহরণ পাচ্ছি,

"গোলাম না কইস গোলাম না কইস হয় মোর ছোট ভাই।
একে দুদে পালন কৈছে ময়নামতি মাই ॥
..
আমি হচ্ছি রাজার ছেইলা ভাই ক্যানে অসুৎ ॥
এক খোখের বাশ রানি নছিবোতে ল্যাখা।
কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝ্যাটা ॥"

সুনির্বাচিত অলঙ্কার প্রয়োগের ফলে বর্ণনাটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

আগেই বলেছি, এই ছড়াটির ভাষা রংপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষা। এই আঞ্চলিক ভাষা বর্ণনাগুলিকে একটি বিশিষ্ট সৌরভ দান করেছে এবং এর জন্যে ছড়াটি উত্তর বাংলার পল্লীজীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি হতে পেরেছে।

সবশেষে অসম্পূর্ণ পাঁচালীটি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এর যেটুকু বিবরণ ডাঃ সুকুমার সেন দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় এর কাহিনী দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' এরই মত। তবে নায়ক গোপীচন্দ্র এখানে আরও সজীব এবং মানবিকতামণ্ডিত। দুর্লভ মল্লিক দেখিয়েছেন গোবিন্দচন্দ্র রাণীদের যোগবলে পাষাণে পরিণত করেছিলেন; তিনি সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বছরে একবার করে ঘরে ফিরে আসতেন, কিন্তু স্ত্রীদের প্রতি তাঁর মমতা ফিরে এসেছিল কিনা তার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ পাঁচালীটীতে দেখতে পাই রাণীরা ময়নামতীর শাপে পাষাণ হয়েছিল এবং গোপীচন্দ্র ঘরে ফিরে এসে তাদের পাষাণমূর্তি দেখে মমতায় বিগলিত হয়ে আবার তাদের মানুষ করে দিয়েছেন।

এই অসম্পূর্ণ পাঁচালীতে আর একটি নতুন কথা পাওয়া যায়। রাণীরা পাষাণ থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যখন গোপীচন্দ্রকে সংসারে থাকবার জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, তখন গোপীচন্দ্র তাদের পার্বতীর কাছে রেখে এলেন।

আলোচ্য পাঁচালীটির নিম্নোদ্ধৃত অংশে তত্ত্ববর্ণনার মধ্যে কবির দক্ষতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে,

"আর এক বাক্য বলি শুন গোবিন্দাই।
বৃক্ষ হইতে দেখ বাপু ফলের বড়াই॥
অতি উচ্চতর গাছ নাম নারিকল।
পাতালে থাকিয়া দেখ গগনে উঠে জল॥
নারিকেল হইয়া সে জ্ঞানের জানে কল।
তেকারণে শূন্যাকারে ডাবে ভরে জল॥
হয় নয় পুত্র ভাবিয়া দেখ মনে।
নারিকল ভিতরে জল যোগায় কোন জনে॥
অচ্ছেদ অভেদ ফল নির্ম্মল ধরে নীর।
শূন্যেতে ভরিল বারি গহিন গম্ভীর॥"

মোটামুটি ভাবে 'গোপীচাঁদ আখ্যায়িকা' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রচনাগুলিরই পরিচয় দেওয়া হল। এদের মধ্যে যে কাহিনী রূপায়িত হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। একটি বিরাট সমাজের অনুভূতি ও উপলব্ধি, আদর্শ ও কল্পনা মিলে এই সুষমাপূর্ণ কাহিনী গড়ে উঠেছে—এর মধ্যে রং ও আলোর, মায়া ও মাধুরীর অকৃপণ প্রাচুর্য। ঘটনাসংস্থান, চরিত্রচিত্রণ ও শিল্পায়ন সব দিকেই এই কাহিনীর অফুরন্ত সম্ভাবনা ছিল। সেই নানামুখী সম্ভাবনা কোন লেখকের হাতেই সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু বিভিন্ন রচনার মধ্যে তার যে ভাঙ্গাচোরা অংশগুলি ছড়িয়ে পড়ে আছে, তাদের একত্র করলে একটি অসমাপ্ত মহৎ সৃষ্টির স্বরূপ অনুমান করা যায়।

আমাদের বিচারের জালে নাথসাহিত্যের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে, সেগুলির অধিকাংশই তার নিজস্ব। নিজের ভালমন্দ দোষগুণ নিয়ে এই সাহিত্য একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, নাথদের মৌলিক দর্শন, অভিনব চিন্তাধারার প্রভাবে সে এই অনন্যতা লাভ করেছে। বাংলার প্রাচীন ধর্মসাহিত্যের মূল প্রবাহেরই এক শাখা হওয়া সত্ত্বেও নিজের বৈশিষ্ট্যের বালুবন্ধে আবদ্ধ হয়ে নাথসাহিত্য একটি হ্রদের মত চিরদিন ধরে বিরাজ করেছে। তার যা কিছু আকর্ষণ, তা এইখানেই। এই সাহিত্যে প্রাণ আছে, লাবণ্য আছে, সুরভি আছে, স্বাদ আছে, সেই সঙ্গে আছে একটি স্বাতন্ত্র্য। এর মধ্যে যে পরিমাণ কাব্যের বীজাণু রয়েছে সমালোচনার অনুবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তুললে এর কুলীন সাহিত্যের সমাজে পাংক্তেয় হবার দাবী অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃঃ ১৫৬—৯ম থেকে ১৮শ ছত্র বাদ যাবে।

পৃঃ ১৫৭—৫ম-৯ম ছত্রে "বাংলার নাথসাহিত্যের উদাহরণস্বরূপ……অন্য কোথাও দেখা যায় না" —এই অংশটি বাদ যাবে। তার জায়গায় পঠনীয়,

"বাংলার নাথসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত আখ্যায়িকা দুটির মধ্যে 'গোরক্ষবিজয়ে'র কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবতঃ বাংলার বাইরে হয়েছিল। কারণ এদেশে ষোড়শ শতাব্দীর আগে এই কাহিনীর প্রচলনের কোন প্রমাণ পাইনা। কিন্তু মিথিলাতে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেখা বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক পাওয়া গেছে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন মহোদয় সম্প্রতি এই নাটকের একটি খণ্ডিত পুঁথির প্রতিলিপি দেখেছেন। তিনি আমায় বলেছেন যে, খণ্ডিত পুঁথিটিতে গোরক্ষনাথের দুই সঙ্গী নিয়ে কদলীরাজ্যে আগমন থেকে সুরু করে মীননাথের উদ্ধার পর্যন্ত অংশটুকু মোটামুটি অবিকৃতভাবেই পাওয়া গেছে; নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, তবে তার অন্তর্গত গানগুলি লেখা মৈথিলীতে; এর মধ্যে বিদ্যাপতির 'সপ্রতিষ্ঠ সদুপাধ্যায়' উপাধিটি উল্লিখিত আছে বলে এর অকৃত্রিমতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। এই নাটকটি আবিষ্কারের পর আর 'গোরক্ষবিজয়'-কাহিনীর উদ্ভব বাংলাদেশে হয়েছিল বলে মনে করা চলে না। তবে গোপীচাঁদের কাহিনীটি যে বাংলাদেশেই উদ্ভূত হয়েছিল, এরকম সিদ্ধান্ত করা যায়।"

পৃঃ ১৫৭—৯ম ছত্রে "গোপীচাঁদের পাঁচালীর কাহিনী"র জায়গায় "এই কাহিনী" পঠনীয়।

পৃঃ ১৬১—৮ম-৯ম ছত্রে "এদের মধ্যে……সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন," এই বাক্যটির পাদটীকারূপে পঠনীয়,

"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৬০, পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য। ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা' নামক এই প্রবন্ধটি থেকে আমি বর্তমান আলোচনার আরও উপকরণ সংগ্রহ করেছি।"

পৃঃ ১৬৪—১৮শ-২০শ ছত্রে "প্রাচীন বাঙালী কবিরা……সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল"—এর পর পঠনীয়,

"আর 'রস' শব্দকে যদি নয় অর্থে নেওয়া যায়, তা হলে সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল হয় ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৬৫-৬৬ শকাব্দ।"

পৃঃ ১৬৪—২১শ-২২শ ছত্রে "সুতরাং গোরক্ষবিজয়ের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই নিশ্চিত"—এই বাক্যটি বাদ যাবে। এর জায়গায় পঠনীয়, "সুতরাং 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাদে রচিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।"

পৃঃ ১৬৫—দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ("এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে……আহ্মি, তুহ্মি প্রভৃতি।") পর এই অংশটি যুক্ত হবে।

'গোরক্ষবিজয়'কে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলার বিরুদ্ধে একটি যুক্তি উত্থাপিত হতে পারে। সেটি এই যে, 'গোরক্ষবিজয়ে'র লেখক ফয়জুল্লা 'সত্যপীরের পাঁচালী'ও লিখেছিলেন, অথচ ষোড়শ শতাব্দীতে

রচিত অন্য কোন 'সত্যপীরের পাঁচালী'র নিদর্শন পাওয়া যায় না, এমনকি ষোড়শ শতাব্দীতে সত্যপীরের পূজার প্রচলন ছিল বলেও স্বতন্ত্র কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই কারণে "মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন" পাঠকে কেউ কেউ ভ্রান্ত বলে মনে করেন। যতদিন পর্যন্ত এই কালনির্দেশক চরণটি আরও পুঁথিতে না পাওয়া যাচ্ছে এবং অন্যান্য প্রাচীন 'সত্যপীরের পাঁচালী' আবিষ্কৃত না হচ্ছে, ততদিন এ সম্বন্ধে বিতর্কের শেষ হবে বলে মনে হয় না। আপাততঃ আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে সত্যপীরের পূজার প্রচলন ছিল কিনা, সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করব। পররর্তীকালে রচিত সত্যপীরের পাঁচালীগুলির উক্তি থেকে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীতে সত্যপীরের পূজা প্রচলিত ছিল। কারণ শঙ্কর-আচার্য এবং কবি কর্ণ রচিত 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে জনৈক "আলা বাদ্‌শাহ" কর্তৃক সত্যপীরের পূজার একটি অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনী পাওয়া যায় এবং আরিফ রচিত 'লালমোনের কেচ্ছা'য় এই কটি চরণ মেলে,

"বন্দনা করিতে আমা হবে অনেক্ষণ
লালমোনের কথা কিছু সোন দিয়া (পাঠ-দিলা) মন ॥
সত্যপীর ছিল ছলে লালমোন স্নন্দরী।
হোছেন শাহা বাদশা নিয়া হয় দেশান্তরি ॥
...
পূরিল মনের সাধ পোহাইল রজনী।
সও লক্ষ টাকা দিল সত্যপীরের সির্নি ॥

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১০, পৃঃ ১৪৭)

একথা মনে করা যেতে পারে, শঙ্কর আচার্য ও কবি কর্ণের পাঁচালীতে উল্লিখিত "আলা বাদ্‌শাহ" এবং লালমোনের কেচ্ছায় উল্লিখিত "হোছেন শাহা বাদশা" অভিন্ন লোক, এবং ইনি আসলে বাংলার স্নলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ)। হয়ত হোসেন শাহ্ কোন সময় সত্যপীরের সির্নি দিয়েছিলেন, সেই কাহিনীই পরবর্তী সাহিত্যে পল্লবিত ও নানা অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আকারে স্থান পেয়েছে।

ডাঃ এনামুল হক্ সংগৃহীত রচনাংশটুকুতে রয়েছে,

"খোঁটাদুরের পীর ইস্‌মাইল গাজী।
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজী ॥"

ষোড়শ শতাব্দীর কবির পক্ষে খোঁটাদুরের পীর ইস্‌মাইল গাজীর কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করা সম্ভব, কারণ খোঁটাদুরের ইস্‌মাইল গাজী ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে শহীদ হন (সা. প. প., ১৩ ৬০, পৃঃ ১১৬ দ্রষ্টব্য)।

ফয়জুল্লা তাঁর 'সত্যপীরের পাঁচালী'র উপক্রমে বলেছেন

"খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ"।

এবং "দৈবকী রোহিণী বন্দো শচী ঠাকুরাণী।
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি ॥"

খানাকুলের গোপীনাথ-বিগ্রহ অতি প্রাচীন। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পরিকর অভিরাম দাস খানাকুলের অধিবাসী ছিলেন; তিনি এই বিগ্রহের সেবক ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে (চৈতন্যচরিতের উপাদান, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার, পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৮-১৯ দ্রষ্টব্য)। অতএব ষোড়শ শতাব্দীর রচনায় খানাকুলের গোপীনাথ ঠাকুরের উল্লেখ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

সেই রকম ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাদে লেখা বইতে শচী দেবী ও চৈতন্যদেবের উল্লেখ থাকাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন রকম বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শেখ ফয়জুল্লার আবির্ভাবকাল তথা 'গোরক্ষবিজয়ে'র রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়।

পৃঃ ১৬৫—১১শ-১২শ ছত্রে "শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল দেখিয়েছেন আজ অবধি কোন বাংলা পুঁথিতে 'গোরক্ষ' পাওয়া যায়নি"—এই বাক্যাংশটি এইভাবে পরিবর্তিত হবে,

"শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল দেখিয়েছেন আজ অবধি এই বইয়ের কোন পুঁথিতে 'গোরক্ষ' নাম পাওয়া যায়নি।"

পৃঃ ১৬৫—১৪শ ছত্রে "কারণ" এবং "হঠযোগপ্রদীপিকা"র মাঝখানে "বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক" পঠনীয়।

পৃঃ ১৬৫—১৬শ ছত্রে "উত্তর ভারতের অনেক স্থানের নামের সঙ্গে 'গোরক্ষ' নাম যুক্ত দেখা যায়"—এর পর পঠনীয়,

"বাংলার নাথসাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত কোন কোন রচনায় 'গোরক্ষনাথ' নাম পাওয়া গেছে, যেমন সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত নাটপালা 'গোপীচন্দ্র নাটক' এবং সুকুর মহম্মদের 'যোগান্ত পুঁথি'। রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত গোপীচাঁদের ছড়াটিতে 'গোরকনাথ' ও 'গোরেকনাথ' নাম মিলছে এবং বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'গোর্খবিজয়ে'র পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট 'যোগীর গানে'র পুঁথিতেও 'গোরক্ষনাথ' নামই রয়েছে।"

পৃঃ ১৯০—১৯শ ছত্রে "মৃত্যুযোগের" শব্দটি বাদ যাবে।
